ভাষাসংগ্রামী মাহবুব উল আলম চৌধুরী

মামুন সিদ্দিকী



মাহবুব উল আলম চৌধুরী বাংলাদেশের বিদ্বৎসমাজে বহুল পরিচিত ব্যক্তিত্ব। চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে প্রগতিশীল রাজনীতি ও সংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়ে তিনি বাঙালি জাতিসত্তা ও জাতীয়তাবাদের ভিত নির্মাণে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর বামপন্থী রাজনৈতিক ভাবাদর্শের মতো সংস্কৃতিচর্চাও ছিল একই ধারায় প্রবহমান। তাঁর সম্পাদিত 'সীমান্ত' জীবনবাদী ও সমাজলগ্ন সাহিত্যধারা বিকাশে বিশেষ অবদান রেখেছিল। একুশের প্রথম কবিতা 'কাঁদতে আসিনি, ফাঁসীর দাবী নিয়ে এসেছি' রচনা করে তিনি রাতারাতি অর্জন করেন সাহিত্যিক খ্যাতি। পঞ্চাশের দশকে পূর্ববাংলায় যে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের জোয়ার আসে সেখানেও তিনি পালন করেন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা। জীবনের অন্তিম পর্যায়ে সাহিত্যসাধনা ও সাংস্কৃতিক কর্মপ্রয়াসে যুক্ততার মাধ্যমে উজ্জীবিত করেছেন উত্তরপ্রজন্মকে। বস্তুত সমাজবাদী, অসাম্প্রদায়িক ও উদারনৈতিক ভাবাদর্শের আলোকে আজীবন তিনি একটি সুন্দর বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখে গেছেন। বর্তমান গ্রন্থে ব্যক্তিজীবনের নানাদিকের পাশাপাশি ওঠে এসেছে তাঁর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগ্রাম, সাহিত্যজগৎ, জীবনদর্শন– সর্বোপরি সামগ্রিক পরিচয়; ওঠে এসেছে তৎসংশ্লিষ্ট বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতির ভূবন। সমকালের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কসূত্র, এর আলোকে সমাজনির্মাণের প্রয়াস থেকে উপলব্ধি করা যাবে ব্যক্তিসত্তাকে ছাপিয়ে তিনি কিভাবে হয়ে ওঠেছিলেন সামষ্টিক, বৃহতের মধ্যে খুঁজে নিয়েছিলেন মানবমুক্তি; কত চড়াই-উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে বাঙালি সংস্কৃতি অর্জন করে নিজস্বধারা, ঘুচে যায় আত্মপরিচয়ের সঙ্কট– এ গ্রন্থ এসবের বিস্তৃত পরিচয়বহ।

মামুন সিদ্দিকীর জন্ম ৩ অক্টোবর, ১৯৭৮, মাতুলালয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আখাউড়া উপজেলার ঘোলখার গ্রামে। পিতৃভূমি কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার দিঘিরপাড়-প্রজাপতি গ্রামে। বাবা খায়রুল ইসলাম লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী, মা সুরাইয়া বেগম।

প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ: 'দস্তখত দিয়েছি' (১৯৯৯) ও 'গৌরী' (২০০৬)। গবেষণাগ্রন্থ: 'মুক্তিযুদ্ধে সংবাদপত্র: আমোদ' (২০০০), 'কুমিল্লায় ভাষা আন্দোলন' (২০০৪)। প্রবন্ধগ্রন্থ: 'রবীন্দ্রনাথ : 'গল্পসল্প' (২০১১)। সম্পাদিত গ্রন্থ: 'মোহাম্মদ ফজলে রাব্বী স্মারকগ্রন্থ' (১৯৯৯), 'মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস স্মারকগ্রন্থ' (২০০২), 'নওশাদ কবীর স্মারকগ্রন্থ' (২০০৭), 'মুক্তিযুদ্ধের উপেক্ষিত বীর যোদ্ধারা' (২০০৮), 'হালী মোস্তফা রচনা-সংগ্রহ' (২০০৮), 'সেলিনা বানু সংগ্রামী নারী' (২০০৯), 'রজতনাথ নন্দী: জীবনী ও সাংবাদিকতা' (২০১০), 'কুমিল্লার সমাজ ও সংস্কৃতি' (২০১১)। কাব্যগ্রন্থ: 'তোমার সমস্ত সৌন্দর্য এখন আমার কাছে' (২০১১)।

কর্মসূত্রে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গবেষণা কর্মকর্তা।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগে 'ব্যারিস্টার আবদুল রসুল: জীবন ও রাজনীতি' বিষয়ে এম. ফিল. গবেষণারত।

ভাষাসংগ্রামী

মাহবুব উল আলম চৌধুরী

১৯২৭–২০০৭

মামুন সিদ্দিকী

বাংলা একাডেমী ঢাকা

জীবনী গ্রন্থমালা

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪১৯/জুন ২০১২

বা/এ ৪৯৯৭
[অর্থবছর ২০১১-২০১২ গসফো গবেষণা ৮]

মুদ্রণ সংখ্যা : ১২৫০

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধানে
গবেষণা উপবিভাগ

প্রকাশক
অপরেশ কুমার ব্যানার্জী
পরিচালক
গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ
বাংলা একাডেমী ঢাকা

মুদ্রক
সমীর কুমার সরকার
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস ঢাকা

প্রচ্ছদ
সমরজিৎ রায় চৌধুরী

মূল্য
একশত বিশ টাকা মাত্র

BHASHASANGRAMI MAHBUB UL ALAMCHAWDHURY by Mamun Siddiqui. Published by Aparesh Kumar Banerjee, Director, Research, Compilation & Folklore Department, Bangla Academy Dhaka-1000, Bangladesh. First Published : June 2012. Price 120.00 Taka only.

ISBN 984-07-5015-1

উৎসর্গ

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক
মফিদুল হক
শ্রদ্ধাস্পদেষু

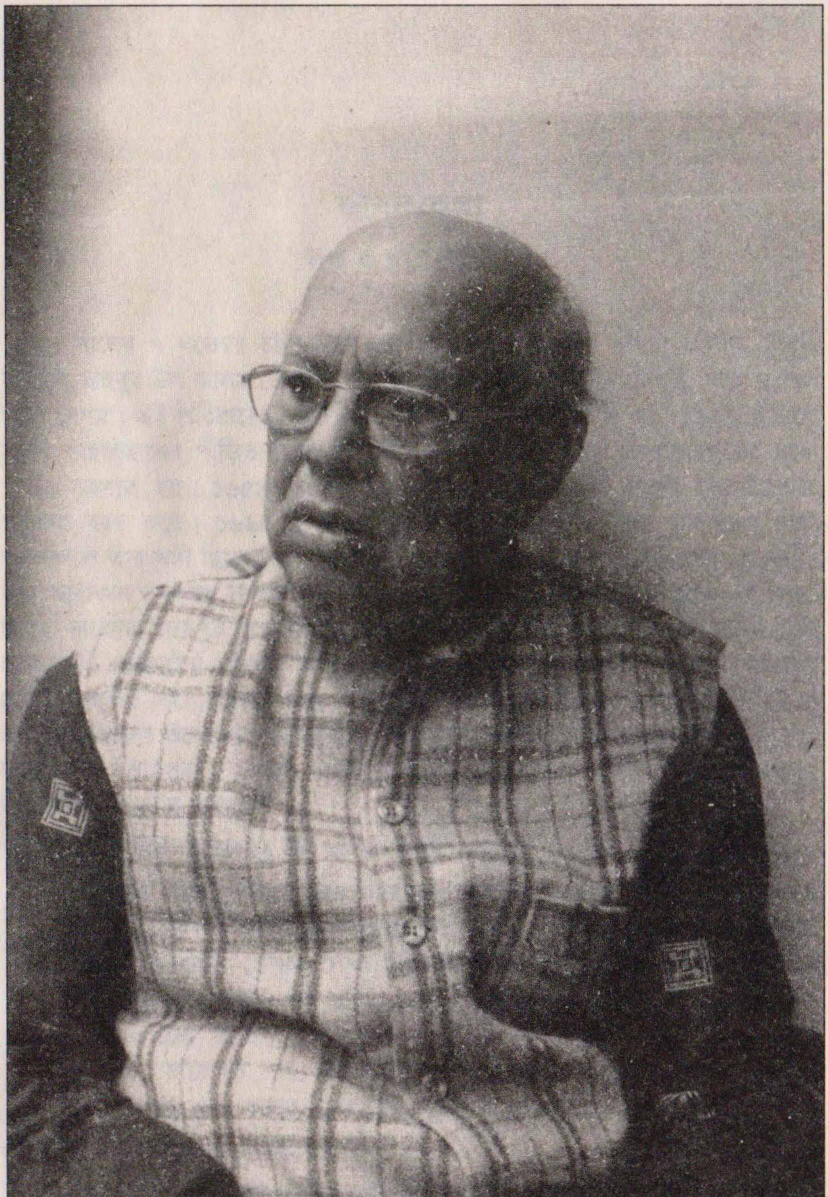
প্রসঙ্গ-কথা

বাংলা একাডেমীর গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগের পরিচালক হিসেবে আমি যখন দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলাম তখন পরিচালকদের এক সভায় 'ভাষা-আন্দোলনের শহীদেরা' নামে একটি বই প্রকাশের প্রস্তাব করি। ফলে ওই বছরের মেলাতেই 'ভাষা-আন্দোলনের শহীদেরা' শীর্ষক বইটি প্রকাশিত হয়। তখন থেকেই প্রত্যেক ভাষাশহীদের জীবন-কথা প্রাসঙ্গিক পটভূমি সহকারে অপেক্ষাকৃত বিস্তারিতভাবে লিখে স্বয়ংসম্পূর্ণ বই আকারে প্রকাশের বিষয়টি আমার মাথায় থেকে যায়। ২০০৯ সালে একাডেমীতে মহাপরিচালক হিসেবে যোগ দিয়েই আমি সে-কাজে হাত দিই। সিদ্ধান্ত হয় ২০১০ সালের অমর একুশের গ্রন্থমেলায় এ সিরিজের বই প্রকাশ করা হবে। পাশাপাশি যে-সব ভাষাসংগ্রামী ভাষা-আন্দোলনে সক্রিয় থেকে আন্দোলনকে চূড়ান্ত পরিণতির লক্ষ্যে নিয়ে মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় অবদান রেখেছেন, তাঁদের জীবনীগ্রন্থ প্রকাশেরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। কাজটিকে আমরা একটি জাতীয় কর্তব্য সম্পাদন হিসেবেই বিবেচনা করেছি। বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠার ৫৪ বছর পরে হলেও 'ভাষাশহীদ জীবনীগ্রন্থ' সিরিজের পাশাপাশি ভাষাসংগ্রামী জীবনীগ্রন্থের এ সিরিজ প্রকাশ করতে পেরে আমরা তাই এক আনন্দময় স্বস্তি বোধ করছি।

ভাষাসংগ্রামী সিরিজের বর্তমান বইটি ভাষাসংগ্রামী মাহবুব উল আলম চৌধুরীর জীবন-কথা নিয়ে লেখা। এটি লিখেছেন মামুন সিদ্দিকী। এই বই লেখার জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাই। গ্রন্থের প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত সকল সহকর্মীকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

শামসুজ্জামান খান
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

সূচিপত্র



মাহবুব উল আলম চৌধুরী

জন্ম: ১৯২৭ | মৃত্যু: ২০০৭

জীবন-কথা

জন্ম ও বংশ-পরিচয়

১৯২৭ সালের ৭ নভেম্বর চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলার গহিরা আসাদ চৌধুরী বাড়িতে মাহবুব উল আলম চৌধুরীর জন্ম। পিতা আহমদুর রহমান চৌধুরী, মাতা রওশন আরা বেগম। এই পরিবারের পূর্ব পুরুষ বহিরাগত। তার ইতিহাস এই—১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট শাহজাহানের পীড়িতাবস্থায় সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে তাঁর চারপুত্রের মধ্যে যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে খজওয়াহ যুদ্ধে শাহসুজার বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৬ মে আরাকানের উদ্দেশ্যে শাহসুজার ঢাকা ত্যাগকালে তাঁর সঙ্গী ছিলেন স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, পরিজন, বহু অনুচর-সহচর ও সৈন্য-সেনা। তাঁর আরাকান গমনপথ সম্পর্কে দুটি জনশ্রুতির অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য হচ্ছে– শাহসুজা ত্রিপুরা রাজ্যের উদয়পুর হয়ে চট্টগ্রাম সীমান্তে উপস্থিত হন। সেখান থেকে ফটিকছড়ির হাটহাজারি থানাদ্বয়ের পশ্চিম দিকস্থ পাহাড়ের পূর্ব পাদদেশ ঘেঁষে সুলতানি আমলের প্রাচীন রাজপথ দিয়ে অগ্রসর হয়ে ফটিকছড়ি থানার সন্নিহিত স্থানে যাত্রাবিরতি করেন এবং আরাকানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।[১] শাহসুজার নামের স্মারকরূপে স্থানটি সুজানগর নামে খ্যাত। শাহসুজার একজন সাহসী সেনাপতি ছিলেন বরাদম লস্কর। তিনিই মাহবুব উল আলম চৌধুরীর পূর্বপুরুষ।

পরিবারের যে ইতিবৃত্ত মাহবুব উল আলম চৌধুরী শুনেছেন, তা এই,

> শাহসুজা যখন পালিয়ে আরাকানের দিকে ধাবিত হন, তখন বরাদম লস্কর চট্টগ্রামে অবস্থান নেন। এক সময় হাটহাজারীর খন্দকিয়া গ্রাম হয়ে বহু সৈন্য-সামন্ত ও বিভিন্ন পেশার লোক নিয়ে তিনি রাউজান থানার সুলতানপুর গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। ওই গ্রামে বাঘ পুকুরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে তার পাকা কবর এখনো আছে।... এই বংশের একটি শাখা সুলতানপুরে, একটি শাখা গহিরায়, আরেকটি শাখা ফটিকছড়ির দৌলতপুরে অবস্থিত।... ভদ্রতা, নম্রতা আতিথেয়তা এবং আচার-ব্যবহারের জন্য আমাদের বাড়ির বেশ সুনাম ছিল।[২]

এ প্রসঙ্গে নির্দিষ্ট করে আরও লিখেছেন,

> চট্টগ্রামের বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ আবদুল হক চৌধুরী আমাদের পূর্ব পুরুষ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতেন। আমাদের পূর্ব পুরুষের সম্পত্তি বিবরণ সম্পর্কিত ফারসিতে লেখা মহারানী ভিক্টোরিয়ার ছবিসম্বলিত বহু দলিল-দস্তাবেজ আমি তাকে দিয়েছিলাম। কিন্তু আবদুল হক চৌধুরীর অকাল মৃত্যুর কারণে প্রচুর তথ্য থাকা সত্ত্বেও তিনি এ বিষয়ে কিছু লিখে যেতে পারেননি। দেখা হলেই বলতেন,

> আপনারা চট্টগ্রামে অতি প্রাচীন সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক। আপনাদের শারীরিক গঠন, গোলাপী ফর্সা রঙ এবং নাক দেখে এটা কি বুঝতে পারেন না?[৩]

বরাদম লস্করের উত্তর পুরুষ আসাদ চৌধুরীর প্রপৌত্র এহ্‌সান আলী চৌধুরী। এহ্‌সান আলী চৌধুরীর ছয়পুত্র। বয়োক্রমে তাঁরা হলেন– সৈয়দুর রহমান চৌধুরী, আবদুল বারী চৌধুরী, আমিনুর রহমান চৌধুরী, ইসমাইল চৌধুরী, নূর আহমদ চৌধুরী এবং আহমদুর রহমান চৌধুরী। আহমদুর রহমান চৌধুরীর ঔরসজাত মাহবুব উল আলম চৌধুরী। আসাদ চৌধুরী কর্মজীবনে ছিলেন ব্যবহারজীবী। তিনি খুব প্রভাবশালী ছিলেন। তাঁর নামেই এ বংশের খ্যাতি।

এহ্‌সান আলী চৌধুরীর পুত্রেরা সবাই রেঙ্গুনে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ছিলেন। নূর আহমদ চৌধুরী ছিলেন বার্মায় ইরাবতী ফ্লোটিলা কোম্পানীর জাহাজের ক্যাপ্টেন। তারা অবস্থাসম্পন্ন ছিলেন।[৪]

বরাদম লস্কর-বংশের একটি শাখা ফটিকছড়ির দৌলতপুর গ্রামে। এ বংশের মুহম্মদ আলী চৌধুরী বিয়ে করেছিলেন ফটিকছড়ির দৌলতপুর গ্রামে। অল্প বয়সে মৃত্যু হলে তাঁর বিধবা স্ত্রী শিশুপুত্র নূর আলী চৌধুরীকে নিয়ে দৌলতপুর চলে যান। এভাবে দৌলতপুরে এ বংশের আরেকটি শাখা বিস্তৃত হয়। বয়োপ্রাপ্ত হওয়ার পর নূর আলী ভাগ্যান্বেষণে বার্মায় যান এবং ব্যবসায় প্রতিপত্তি লাভ করেন। তাঁর পুত্র আবদুল বারী চৌধুরী ছিলেন তদানীন্তন বার্মা ও অবিভক্ত বাংলার নামজাদা ব্যক্তি, আইন পরিষদের সদস্য ও বার্মার ভারতীয় অভিবাসীদের নেতা। ব্যক্তিজীবনে ছিলেন মহানুভব, দানশীল ও পরোপকারী। উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর এই গুণাবলীর অধিকারী হয়েছিলেন তাঁর জামাতা শিল্পপতি এ কে খান।[৫]

আহমদুর রহমান চৌধুরী এন্ট্রান্স পরীক্ষায় সামান্যের জন্য অকৃতকার্য হয়ে গহিরা সন্নিহিত চিকদাইয়ের ভৈরব সওদাগর স্কুলে শিক্ষকতা করছিলেন এবং প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন পুনরায় পরীক্ষার। এ সময় আত্মীয়তার সূত্রে আবদুল বারী চৌধুরী তাঁকে বার্মায় নিয়ে যান এবং নিজের এস্টেটের ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব প্রদান করেন। এই দায়িত্ব তিনি আমৃত্যু নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন।[৬] উল্লেখ্য, এহ্‌সান আলী চৌধুরী ও আবদুল বারী চৌধুরীর প্রপিতামহেরা ছিলেন সহোদর।

এক্ষণে মাহবুব উল আলম চৌধুরীর মাতৃকূলের পরিচয় ব্যক্ত করা প্রয়োজন। মাতৃকূল সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

> আমার নানা দৌলত কাজীর উত্তরসূরি জহিরুদ্দীন কাজীর বংশধর। এই পরিবারের একটি শাখা ছগীরউদ্দীন কাজী। তাদের জমি-জমা, জমিদারি ও জোতদারি ছিল। তাদের নামে একটি হাটও আছে। পরবর্তীতে তারা কালাচাঁদ চৌধুরীর বংশধর হিসেবে পরিচিত। তাদের গোলাম গোষ্ঠী ছিল।[৭]

মাহবুব উল আলম চৌধুরীর নানা আবদুল লতিফ ছিলেন বিদ্যোৎসাহী। বিশ শতকের সে সময় যখন বাঙালি মুসলিম সমাজে শিক্ষার আলো ছড়ায়নি, তিনি তখন শিক্ষার আলোবর্তিকা হাতে এগিয়ে এসেছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

> নানা তাদের বাড়ির কাচারি ঘরে শিক্ষককেন্দ্রিক পাঠশালা স্থাপন করেন এবং নিজে শিক্ষকতা শুরু করেন।... তিনি একাই ইংরেজি, বাংলা এবং অংক শেখাতেন। আরবি, ফারসি এবং সংস্কৃত ভাষায়ও তাঁর দক্ষতা ছিল।... ছোটবেলায় দেখেছি তিনি ছাত্রদের জন্য বাঁশের ফলা দিয়ে কলম তৈরি করে রাখতেন। তখন কালির কোনো ট্যাবলেট ছিল না। তিনি সীমের পাতায় কাজল মেখে এক ধরণের কালি তৈরি করতেন। এই কালি ও কলম সহযোগে প্রথমে কলাপাতায় এবং পরে কাগজে হস্তলিপি শেখানো হতো। আমি তাঁর কাছে বাঁশের কলমে হস্তলিপি শিখেছি।[৮]

শিক্ষাবিস্তারের কাজ সহজ ও মসৃন ছিল না। তাঁর এই প্রচেষ্টা গ্রামের রক্ষণশীল সমাজের বাধার সম্মুখীন হয়। মক্তব-মাদ্রাসার মৌলভী এবং অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা তাঁর এই কার্যে বাধ সাধতে শুরু করলেন। শত্রুতাবশত প্রায় সাতবার স্কুলঘরটি পুড়িয়ে দেয়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে তিনি গ্রামের ছোট লোকদের শিক্ষিত করার মধ্যদিয়ে জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রজাদের অবাধ্য করে তুলছেন।[৯] কিন্তু তারপরও এ প্রচেষ্টা তিনি অব্যাহত রাখেন।

নানার ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্য ও খ্যাতি সম্পর্কে মাহবুব উল আলম চৌধুরী লিখেছেন,

> তিনি সর্বদা পায়জামা ও ফতুয়া পরে থাকতেন। কোথাও যাওয়ার সময় সাদা আসকান পায়জামা ও টুপি পরে বেরুতেন। চট্টগ্রামের বহু কৃতী এবং বিত্তবান সন্তান আমার নানার ছাত্র ছিলেন। তাঁর পাঠশালায় পড়ার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে ছাত্ররা আসতো।[১০]

আবদুল লতিফের তিন পুত্র, দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠ কন্যা আম্বিয়া খাতুনের বিয়ে হয় সুলতানপুর জান-এ-আলী চৌধুরীর বাড়িতে। তাঁর স্বামী ছিলেন একজন পোস্ট মাস্টার। কনিষ্ঠ কন্যা রওশন আরা বেগমের আত্মজ মাহবুব উল আলম চৌধুরী। ছেলেরা বয়োক্রমে আহমদ কবীর চৌধুরী, আহমদ সাগীর চৌধুরী এবং লুৎফে আহমদ চৌধুরী। জ্যেষ্ঠজন ছিলেন রাজনীতিমনস্ক। বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। তিনি গহিরায় তরুণদের নিয়ে সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে গ্রামসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। প্রথমে মুষ্টিভিক্ষা এবং চাঁদা তোলার মাধ্যমে একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। আহমদ কবীর চৌধুরী ও আহমদ সাগীর চৌধুরী এবং গ্রামের তরুণদের উৎসাহ-উদ্দীপনায় গহিরায় ১৯৩০ সালে আবদুল জব্বার ইয়াংম্যান সোসাইটি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁদের কীর্তি সম্পর্কে মাহবুব উল আলম চৌধুরী লিখেছেন,

> মামাদের প্রচেষ্টায় স্কুলটি হয়ে ওঠে গহিরার সমস্ত সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্রবিন্দু।... মহাজনেরা এবং ঋণগ্রহীতার সঙ্গে যে কবলা হতো তা স্কুল কেন্দ্রে এনে পরীক্ষা করে দেখা হতো। মামলা-মোকদ্দমা যাতে কোর্টে না যায়, তার জন্য তারা সালিশ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন। বনেদি পরিবারের লোকেরা যাতে তাদের অধীন গোলাম এবং রায়তদের ওপর অত্যাচার করতে না পারে তার জন্য ইয়াংম্যান সোসাইটির কর্মীরা সব সময় সজাগ থাকতেন।...

> মামারা গ্রামে জুয়া খেলা, গরুর লড়াই এবং খেমটা নাচ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। চালু করেছিলেন বলীখেলা– যাতে গ্রামের লোকেরা আনন্দ পায়।[১১]

মাহবুব উল আলম চৌধুরীর মাতামহীর পিতৃকূল পূর্ব পুরুষ বাগদাদ থেকে আগত। তারাও ছিলেন সম্ভ্রান্ত বংশীয়। তাঁর মাতামহীর বাবা আবদুল বারী চৌধুরী ছিলেন লক্ষণ মজুদমারের সমসাময়িক একজন বিখ্যাত কবি। অনেক দিন তাঁর পাণ্ডুলিপি মাতামহীর কাছে সুরক্ষিত ছিল। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ আবদুল বারী সম্পর্কে জানতেন। এই পাণ্ডুলিপির খুঁজে তিনি মাহবুব উল আলম চৌধুরীর নানার বাড়ি এসছিলেন। শিক্ষাবিস্তারের অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য তাঁর নানা বাড়ি শত্রুরা সাতবার পুড়িয়ে দেয়। তখন বাক্সে রাখা পাণ্ডুলিপি বাক্স সমেত পুড়ে যায়।[১২]

মাহবুব উল আলম চৌধুরীর মাতামহী ছিলেন, বিদ্যানুরাগী ও পরোপকারী। আত্মজীবনীতে মাতামহীর ব্যক্তিত্বের পরিচয় তুলে ধরেছেন এভাবে,

> কারো দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে পারতেন না। নানী দরিদ্র ছাত্রদের অকাতরে সাহায্য করতেন। বাইরের কাচারি ঘরে সারি করা চৌকিতে নানার ছাত্ররা থাকতো। নানী বিন্দুমাত্র বিরক্ত না হয়ে এদের তিনবেলা রান্না করে খাওয়াতেন। অসুখ-বিসুখে নিজের সন্তানের মতো দেখাশোনা করতেন। কবিরাজ ডেকে দাওয়াই খাওয়াতেন।[১৩]

মাহবুব উল আলম চৌধুরীর তিন মাতুলই তাঁর জীবনের নানা পর্যায়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। জ্যেষ্ঠজনের পরিচয় ইতোমধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। মধ্যমজন আহমদ সাগীর চৌধুরী তাঁর জীবনে সবচেয়ে বেশি প্রভাবকের ভূমিকা পালন করেন। তিনি ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক। ব্যক্তিজীবনে ছিলেন পরোপকারী, অসাম্প্রদায়িক ও মুক্তমন সম্পন্ন। তাঁর শ্বশুর শেখ রফিউদ্দিন আহমদ সিদ্দিকী ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা মুসলীম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। দীর্ঘদিন তিনি অবিভক্ত ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য ছিলেন। তাঁর জীবনাদর্শের পরিচয় এ গ্রন্থের পরবর্তী অধ্যায়ে পাওয়া যাবে। মাহবুব উল আলম চৌধুরী মেজো মামার পরিচয় তুলে ধরে লিখেছেন,

> একান্ত ছোটবেলায় মা হারিয়ে তাঁর স্নেহের ছায়ায় বড় হয়েছি। তাঁর প্রশ্রয়ে বড় হয়েছি।... আমার সৌভাগ্য আমার মামা-মামী দু'জনই আমাকে নিজ সন্তানের মতো মানুষ করেছেন। মামা নিজে মুসলিম লীগ করতেন। কোনোদিন আমাকে সাম্প্রদায়িকতার দীক্ষা দেননি। অসাম্প্রদায়িক ছাত্র সংগঠনে আমার যোগদানকে রক্তচক্ষু দেখিয়ে বাধাদান করেননি।

আহমদ সাগীর চৌধুরী কলেজজীবনে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের নেতা অনন্ত সিংহ, গনেশ ঘোষ এবং পূর্ণেন্দু দস্তিদারের সহপাঠী ছিলেন। হবীবুল্লাহ বাহার এবং লোকনাথ বলও তাঁর সহপাঠী। ১৯২৮ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় সারা ভারত যুব সম্মেলনে। মাস্টারদা সূর্যসেন, অনন্ত সিংহ এবং হবিবুল্লাহ বাহারের সঙ্গে চট্টগ্রামের যুব প্রতিনিধি হিসেবে আহমদ সাগীর চৌধুরী ওই সম্মেলনে যোগদান করেন। এদের প্রভাবেই তাঁর

মনে দেশপ্রীতির সঞ্চার হয় এবং অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হন।[১৪] আহমদ সাগীর চৌধুরী ১৯৩৫ সালে ইম্পেরিয়াল প্রিন্টিং হাউজ নামে একটি আধুনিক ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। সেখান থেকে বের করেন চট্টগ্রামের মুসলমানদের প্রথম দৈনিক পত্রিকা 'আজান'।[১৫]

কনিষ্ঠজন লুৎফে আহমদ চৌধুরী ছিলেন চল্লিশের দশকের প্রথম দিকে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য ও বক্তৃতা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। পরিষদের উদ্যোগে ইম্পেরিয়াল ছাপাখানার অফিসে প্রতিমাসে সাহিত্য বৈঠক বসতো। সেখানে কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ পাঠ করা হতো। গুণীজনের সংস্পর্শে আসার প্রবণতা তাঁর ছিল।

আহমদুর রহমান চৌধুরীর সঙ্গে রওশন আরার বিয়ে হয় অল্প বয়সে। মা সম্পর্কে মাহবুব উল আলম চৌধুরী শুনেছেন, 'খেলার সময় হলে আমাকে জেঠাইমার কোলে ছুঁড়ে দিয়ে খেলতে চলে যেতেন।' মাহবুব উল আলম চৌধুরী চার বছর বয়সে মাতৃহারা হন। স্মরণ করেন,

> মাকে যেদিন শোক মিছিল করে কবর দিতে নিয়ে যায়, তখন আমি আমার নানার কোলে। পাশে অশ্রুধারায় সিক্ত আমার বাবা। সবার আদরে খানিকটা পুলক অনুভব করেছি। বুঝতে পারিনি একটু পরে কী হতে যাচ্ছে। আর কোনোদিন যে তাঁর মুখ দেখব না এটা বুঝলাম যখন মাটিতে ঢেকে দিল তাঁর মৃতদেহ। আমি কান্নায় ভেঙে পড়লাম।[১৬]

মাতৃবিয়োগের পর তিনি কখনো চাচী, তাঁর ভাষায় জেঠাইমা, কখনো নানীর কোলে বড় হয়েছেন। ছোটবেলায় নানা-নানী এবং অপুত্রক চাচা-চাচী তাঁকে লালন-পালন করেন। কিন্তু মায়ের অভাববোধ তাঁর কখনো যায়নি। তিনি লিখেছেন,

> আমি কখনো আকাশে, কখনো ঝাউয়ের শাখার ক্রন্দনে মাকে খুঁজে বেড়াতাম। ওই সময় আমি একা থাকতে পছন্দ করতাম। আর আকাশের মেঘের আকৃতির মধ্যে আমার মায়ের মুখ দেখতে চেষ্টা করতাম।[১৭]

এই কষ্ট এই বেদনা আমৃত্যু ছিল। শেষজীবনেও এই বেদনা অনুভব করেছেন,

> তখন বুঝিনি যে মা কত বড় ধরিত্রী। এখন বুঝতে পারি মা হারানোর বেদনা। তাই যার কাছে আমি ছেলেবেলায় এবং এখনো একটু আদর-ভালবাসা স্নেহ পাই, তারা সবাই হয়ে ওঠে আমার মা।[১৮]

'আমার কিশোরী মা' কবিতায় এর পরিচয় পাওয়া যায়।[১৯] মায়ের অভাব সত্ত্বেও তাঁর শৈশব-কৈশোর ভালই কাটছিল। নানা-নানীর আদরে তিনি বেড়ে ওঠছিলেন। লিখেছেন,

> গ্রীষ্মের দুপুরে নানী আমাকে বুকে নিয়ে ঘুম পাড়াতেন। আমি ঘুমের ভান করে চোখ বুজে থাকতাম। তারপর নানী ঘুমিয়ে পড়লে আমি আস্তে আস্তে উঠে দৌড়ে ওই পাড়ার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলতে যেতাম। ধরা পড়লে নানীর বকুনি খেতে হতো।[২০]

মাহবুব উল আলম চৌধুরীর পিতা আহমদুর রহমান চৌধুরী কর্মসূত্রে ছিলেন বার্মায়। ফলে পিতার সান্নিধ্য তিনি বিশেষ পাননি। কিন্তু যতটুকু পেয়েছেন তা মনের মধ্যে গেঁথে ছিল অম্লানরূপে। পিতৃবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লিখেছেন,

> বাবাকে কোনোদিন রাগান্বিত হতে দেখিনি। খুব ধৈর্যশীল এবং সংযমী ছিলেন। কোনোদিন কারো নিন্দা করতেন না। কারো প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতেন না। তিনি ছিলেন অজাতশত্রু। তিনি নিরহঙ্কারী ও শিক্ষানুরাগী ছিলেন।... তার বুকের এমন স্নেহ পেয়েছি, যা আমার কাছে তুলনীয় নয়। তার মুখে পাহাড়ী সান্যালের মতো স্নিগ্ধ হাসি, বিনয়ী স্বভাব পরোপকারী চরিত্র, দৃষ্টান্তমূলক হিতোপদেশ আমাকে খুবই আকৃষ্ট করতো।[২১]

আহমদুর রহমান চৌধুরী বার্মায় বেশ প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল পুত্রকে রেঙ্গুনে নিয়ে পড়াশুনা করাবেন। কিন্তু নানা-নানীর জন্য সম্ভব হয়নি। একবার নিয়ে ছয় মাস রেখেছিলেন। কান্নাকাটি করে অসুস্থ হয়ে পড়ায় শেষে বাড়িতে নিয়ে আসেন। শেষ পর্যন্ত তাঁকে দেখাশোনার জন্য এবং দেশে স্থায়ীভাবে বাসের উদ্দেশ্যে তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। জীবিকা নির্বাহকল্পে কালাচাঁদ চৌধুরীর হাটে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। কিন্তু দ্বিতীয় স্ত্রী এক পর্যায়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন এবং কিছুদিন পর পিত্রালয়ে চলে যান। তিনি ছিলেন 'সোহরাব বধ' কাব্যের লেখক হামিদুল্লাহর ভ্রাতুষ্পুত্রী। এ ঘটনা উল্লেখ করে মাহবুব উল আলম চৌধুরী লিখেছেন,

> বাবা অনন্যোপায় হয়ে সব ছেড়ে দিয়ে বার্মায় চলে যান। বহু চেষ্টা করেও আমাকে তার সঙ্গে নিতে পারেননি। তখন বুঝিনি মাতা-পিতার কোনো বিকল্প হয় না। যে কিছুদিন বার্মায় এবং দেশে আমি বাবার বুকে ছিলাম তখন যে প্রশান্তি এবং নিরাপত্তা আমাকে ঘিরে থাকতো, তা আমার স্মৃতিতে এখনো অক্ষয় হয়ে আছে।[২২]

১৯৪১ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথমার্ধে আহমদুর রহমান চৌধুরী রেঙ্গুনে মারা যান। ওখানেই তাঁর সমাধি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বার্মা আক্রান্ত হলে তাঁর আত্মীয়-পরিজন সবাই নিজ গ্রামে চলে আসে। তাঁর পিতৃব্য নূর আহমদ চৌধুরীও ফিরে আসেন নিঃস্ব হয়ে। বাল্যবয়সে কেউ বার্মা থেকে ফেরা মানে তার জন্য কিছু না কিছু উপহার নিয়ে আসা। সে-সময়ের স্মৃতিচারণ করে পিতৃব্য প্রসঙ্গে লিখেছেন,

> পথে সবকিছু হারিয়ে তিনি একটি ছোট বাক্স নিয়ে চট্টগ্রামে ফিরেছিলেন। আনন্দে বাক্সটি খুলে দেখি তাতে আমার জন্য কোনো নতুন কাপড়-চোপড় নেই।... বাক্স খুলে জেঠা আমাকে বললেন, এসব তোমার বাবার পুরোনো কাপড়-চোপড়। এগুলো স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে যাতে তোমার কাছে সারাজীবন থাকে তার জন্য আমি কষ্ট করে এই বাক্স বয়ে নিয়ে এসেছি। এই বলে তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিলেন, মনে পড়ে। আমি এসব কাপড়-চোপড়ে বাবার শরীরের গন্ধ পেয়েছিলাম।[২৩]

শিক্ষাজীবন

মাতৃবিয়োগ ও পিতার কর্মস্থল দূরত্ব হেতু সবাই মাহবুব উল আলম চৌধুরীকে বিশেষ স্নেহে বড় করে তুলছিলেন। অতিরিক্ত যত্ন তাঁর বাল্যজীবনে কিছুটা বিপত্তিও তৈরি করে। কঠোর শাসনে বিদ্রোহী হয়ে গৃহত্যাগও করেছিলেন। তারা চাইতেন এই মাতৃহারা কিশোর যেন উপযুক্ত বিদ্যাশিক্ষা লাভ করে। গহিরা গ্রামে প্রত্যেকটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে চার বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের হাতেখড়ির ব্যবস্থা রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল। এর রীতি এমন– একজন মৌলভী ডেকে জায়নামাজ বিছিয়ে একটি পরিষ্কার বালিশের ওপর রাখা হয় আমপাড়া। মৌলভী সাহেব তাকে কিছু দোয়া-দরূদ পাঠ করিয়ে জ্ঞানের জগতে প্রবেশ করান।[২৪] মাহবুব উল আলম চৌধুরীর হাতেখড়িও এর ব্যতিক্রম ছিল না। তাঁর বাবা বিদেশ গমনের পূর্বে হাতেখড়ির ব্যবস্থা করেছিলেন। হাতেখড়ি উপলক্ষে আমন্ত্রিত ছিলেন বিশিষ্ট একজন আলেম এবং একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।

তাঁর বর্ণনা নিম্নরূপ,

> অনুষ্ঠান উপলক্ষে গালিচা সদৃশ একটি ফরাস পাতা হলো। ফরাসে আমাকে পশ্চিমমুখ করে বসিয়ে আমার মুখোমুখি বসেছিলেন আমার নানা, মৌলভী সাহেব এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। একটা কারুকার্যময় বালিশের ওপর রাখা হয়েছিল একটি আমপাড়া, রামসুন্দর বসাকের বাল্যশিক্ষা আর একটি হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থ। প্রথমে মৌলভী সাহেব আমাকে পড়ালেন, রাব্বি যিদনি ইলমান– অর্থাৎ হে আল্লাহ আমাকে জ্ঞান দান করো। তারপর আমার নানা পড়ালেন– হে প্রভু আমাকে মানুষ করো। আর ব্রাহ্মণ মহাশয় পড়ালেন– তমোসমা জোতির্গময়- হে প্রভু আমাকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যাও।[২৫]

তাঁর বাল্যকাল কেটেছে টানাপোড়েনের মধ্যে। কর্মসূত্রে বাবার বার্মায় অবস্থান, এক পর্যায়ে নানা-নানীর মৃত্যু, কনিষ্ঠ দুই মামার চট্টগ্রামে অবস্থান, ফলে তিনি ছিলেন জ্যেষ্ঠ মামার তত্ত্বাবধানে। জ্যেষ্ঠ মামা ও তাঁর জেঠাইমার মধ্যে তাঁকে নিয়ে কিছুটা দ্বন্দ্ব হতো। ফলে তাঁর লেখাপড়ার ধারাবাহিকতা কিছুটা ব্যাহত হয়।

হাতেখড়ির পর তাঁকে ভর্তি করা হলো শিশু শ্রেণীতে, গহিরা স্কুলে। লিখেছেন,

> ধারাপাত, অঙ্ক, শুভঙ্কর, হস্তলিপি, রামসুন্দর বসাকের বাল্যশিক্ষা, ইংরেজি ফার্স্ট বুক আমি নানার কাছে শিখেছিলাম এবং এসব বিষয়ে কিছু পারদর্শীও হয়ে উঠেছিলাম। তাই শিশু শ্রেণীতে আমাকে ভর্তি করায় আমি খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। আমাকে অনতিকালের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রমোশন দেয়া হলো।[২৬]

মামার বাড়িতে তাঁর ভাল লাগতো না। কঠোর শাসন ও বখে যাওয়ার আশঙ্কাজনিত অতিরিক্ত খবরদারি থেকে বরং নিজ বাড়ির স্বাধীন-মুক্ত পরিবেশ তাঁকে বেশি টানতো। লিখেছেন,

> আমাদের বাড়িতে আমি ছিলাম মুক্তবিহঙ্গের মতো স্বাধীন এবং বাড়ির সব ছেলেমেয়েদের সর্দার। তাদের নিয়ে আমি চতুরায় (বাইরের ঘর) স্কুলে অভিনীত সিরাজ-উদ-দৌলা নাটকের অনুকরণে নানা ধরণের অভিনয়, আবৃত্তি, গান

> ইত্যাদির আয়োজন করতাম। আর বড়মাকে এসব ছেলেমেয়েদের জন্য নাস্তা ইত্যাদি তৈরি করে দিতে হতো। এজন্য তিনি আমাকে কোনো কিছু না বলতেন না। যা চাইতাম তা-ই দিতেন। তার কোল ছিল আমার নিরাপদ আশ্রয়।[২৭] ..তারা মনে করতেন আমার জেঠাইমার অতিরিক্ত আদর যত্নে আমি নষ্ট হয়ে যাবো। বারবার আমাকে জেঠাইমার কাছ থেকে জোর করে নিয়ে নানার বাড়িতে রাখতে চাইতেন।[২৮]

এ পর্যায়ে তিনি খুব একাকীত্ব বোধ করতেন।[২৯] নানী তাঁকে ধর্মের কাহিনী শুনাতেন। এসব শুনে তাঁর মধ্যে মূল্যবোধ তৈরি হয়,

> নানী বলতেন, সব ধর্মের একই বাণী। অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করা, সৎ পথে চলা। কারো অনিষ্ট না করা। নানী আমাকে উদ্দেশ্য করে আরো বলেছিলেন, জীবনে কোনোদিন অন্যায়ের কাছে মাথা নত করো না। সারাজীবন যাতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে পার, সৎভাবে জীবনযাপন করতে পার তার জন্য আমি তোমাকে প্রতিদিন জায়নামাজে বসে দোয়া করি। নানীর সেদিনের আশীর্বাদ আমি সারাজীবন কার্যকর করার চেষ্টা করেছি।[৩০]

১৯৩৩ সালে চট্টগ্রামে রাউজান থানা সদরে অনুষ্ঠিত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে নজরুল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে আরো যোগ দিয়েছিলেন হবীবুল্লাহ বাহার, 'দি মুসলমান' পত্রিকার সম্পাদক মুজিবুর রহমান এবং মোহাম্মদ মোদাব্বের। আব্বাসউদ্দীন আহমদ এবং নজরুল গানে গানে সম্মেলনকে মাতিয়ে তুলেছিলেন। স্থানীয়ভাবে এ সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সম্পৃক্ত ছিলেন মৌলভী নুরুল আফছার চৌধুরী, নূরুল হুদা চৌধুরী, আবুল কাশেম এবং আহমদ কবীর চৌধুরী। কথাশিল্পী মাহবুব-উল আলম ও ড. মুহম্মদ এনামুল হকও উপস্থিত ছিলেন। এ ঘটনা উল্লেখ করে মাহবুব উল আলম চৌধুরী লিখেছেন,

> মামার অনুরোধে নজরুল আমার নানার বাড়িতে মধ্যাহ্ন ভোজে এসেছিলেন। মনে আছে, তিনি বাড়িতে ঢুকতেই আমি তাঁর গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিয়েছিলাম। এও মনে আছে, মামাদের পীড়াপীড়িতে আমি কোনো একটি কবিতা আবৃত্তি করে কবিকে শুনিয়েছিলাম। তিনি এবং হবীবুল্লাহ বাহার আদর করে আমাকে বুকে টেনে নিয়েছিলেন।[৩১]

গহিরা স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনার পর লুৎফে আহমদ চৌধুরী ১৯৩৫ সালের অন্তিম দিকে তাকে চট্টগ্রাম শহরে নিয়ে এসে মুসলিম হাই স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন, তৃতীয় শ্রেণীতে। এখানে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন এম আবদুস সামাদ। শিক্ষক হিসেবে তিনি ছিলেন সুখ্যাতির অধিকারী। কেতাদুরস্ত সাহেব, স্যুট, টাই এবং মাথায় শোলার টুপি পরে ঘোড়ার গাড়িতে করে স্কুলে আসতেন। সাংবাদিক আতাউস সামাদ তাঁর পুত্র।[৩২] মাহবুব উল আলম চৌধুরী তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেন। তাঁর ব্যক্তিক-বৈশিষ্ট্য তাঁর জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। লিখেছেন, 'স্যারের ছায়ায় জীবনে আমি প্রথম রোদের সন্ধান পাই।'[৩৩] স্কুলজীবনের স্মৃতিচারণে লিখেছেন,

> তিনি স্কুল হওয়ার আগে ছাত্রদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে সেখানে কবি নজরুল ইসলামের দেশপ্রেমমূলক 'চল্ চল্ চল্' গানটি পরিবেশন করাতেন। তিনি আমাদের সম্মানিত শিক্ষক রবিউল হোসেনকে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করেছিলেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে বিশেষ করে স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠানে ইংরেজি ও বাংলায় আবৃত্তি, একক ও সমবেত সঙ্গীতের আয়োজন করতেন।[৩৪]

এখানে দু'বছর পড়াশুনার পর ১৯৩৮ সালে তাঁকে আবার গহিরা হাই স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি করানো হয়। এখানে প্রধান শিক্ষক হিসেবে পান গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে। প্রধান শিক্ষক ও স্কুলের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে লিখেছেন,

> তিনি স্কুলের শিক্ষা পদ্ধতি ও পাঠ্যক্রম বহু পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। বার্ষিক সভায় নাটক এবং নৃত্যগীতের আয়োজন করেছিলেন। স্কুল শুরু হওয়ার আগে সবাইকে লাইনে দাঁড় করিয়ে 'হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর, হও উন্নত শির' গান করাতেন। তিনি স্কুলের ছাত্রদের ব্রতচারী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন এবং কচুরিপানা পরিষ্কার করার জন্য ছাত্রদের কাজে লাগিয়েছিলেন। তিনি বিতর্ক সভাও চালু করেছিলেন।[৩৫]

এ সময় হরলাল বাবু নামের একজন শিক্ষক ছিলেন, তিনি ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। তাঁর সান্নিধ্য মাহবুব উল আলম চৌধুরীর মধ্যে নেতৃত্বগুণের উন্মেষ ঘটে।[৩৬]

ছেলেবেলায় একাকীত্বের কারণে অন্ত্যজশ্রেণীর এক যুবকের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। তার সম্পর্কে লিখেছেন,

> নানার বাড়ির ত্রিসীমানার বাইরে আমার যাওয়া বারণ ছিল, শাস্তিযোগ্য ছিল। তা অমান্য করে আমি মাঝে মাঝে তার সঙ্গে যাত্রাগান শোনার জন্য দূর গ্রামে চলে যেতাম। নৌকা বাইচ ও ফুটবল খেলা দেখতে যেতাম। যাযাবর বেদেদের সঙ্গে গ্রাম গ্রামান্তরে চলে যেতাম। মফজল দুপুরে বাঁশি বাজিয়ে আমাকে ডাকতো। কাঁচা আম ছুরি দিয়ে কেটে আদর করে খাওয়াতো।[৩৭]

এ বংশেরই কালামিয়া বদ্দা লটারিতে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে একটি কলের গান কিনে। পুরোনো শিল্পীদের অনেক বাংলা রেকর্ড নিয়ে এসেছিলেন। এই কলের গান আগলে রাখতেন তার সুন্দরী স্ত্রী, যাকে তিনি লাল ভাবী ডাকতেন, লিখেছেন,

> এই গানের টানে আমি প্রায়ই লাল ভাবীর কাছে চলে যেতাম। হয়তো সে সময়ই গানের জন্য আমার একটি সমঝদারি কান তৈরি হয়েছিল। তিনি সমাদরে গানগুলো বাজিয়ে আমাকে শোনাতেন।... আমাদের পাড়ায় জানাজানি হয়ে গেল, তখন সকলে বলতে লাগলো ছোটলোকদের ওখানে খেয়ে এবং তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে আমি বংশের মান-ইজ্জত ডুবিয়েছি।

তখনও তাঁর মধ্যে শ্রেণীবোধ জাগ্রত হয়নি। মানুষকে তিনি মানুষ হিসেবেই গণ্য করতেন। মানুষের মধ্যে এই বিভাজনকে মেনে নিতে পারেননি। পরবর্তী জীবনে এসব ঘটনা তাঁকে জনগণের পাশে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করে।[৩৮]

তাঁর কনিষ্ঠ মামা ছিলেন সংস্কৃতিমনস্ক। তিনি এলাকায় চারদিন ব্যাপী দু'টি নাটক মঞ্চস্থ করেন। একটি সিরাজ-উদ-দৌলা, অন্যটি শাহজাহান। স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন,

> সিরাজ-উদ-দৌলা যে অভিনয়াংশে সংলাপে বলেছিলেন, বাংলা শুধু হিন্দুর নয়, বাংলা শুধু মুসলমানের নয়, মিলিত হিন্দু-মুসলমানের মাতৃভূমি এই বাংলা। আমি অন্যায় যা করেছি আপনাদের কাছে করেছি। আঘাত যা পেয়েছি তাও আপনাদের কাছ থেকেই পেয়েছি। কাজেই এই দুর্দিনে আপনারা আমাকে ছেড়ে যাবেন না। মিলিত চেষ্টায় ব্রিটিশ বেনিয়াদের পরাজিত করে বাংলাকে আমরা স্বাধীন রাখাবোই। চেয়ে দ্যাখো ভাইসব বাংলার আকাশ আজ ঘনঘটা মেঘাচ্ছন্ন..। কে তাকে আশা দেবে, কে তাকে ভরসা দেবে ইত্যাদি। এই সংলাপ শুনে আমার চোখে জল এসেছিল। আমি দেশসেবাকে ব্রত হিসেবে ভবিষ্যতে গ্রহণ করবো বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম।[৩৯]

এই ঘটনায় প্রভাবিত হয়ে নিজেও নাটক করার জন্য অনুপ্রাণিত হন।[৪০] ১৯৪২ সালের দিকে তাঁর গহিরা-জীবনের ইতি ঘটে। তাঁকে নিয়ে আসা হয় চট্টগ্রামে, ভর্তি করানো হয় কলেজিয়েট স্কুলে, নবম শ্রেণীতে। এখানে প্রধান শিক্ষক হিসেবে পান বিজয় ভট্টাচার্যকে, যিনি বিখ্যাত গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য ও পূর্ব্বাশা' পত্রিকার সম্পাদক অজয় ভট্টাচার্যের সহোদর। পেয়ে যান বন্ধু সুচরিত চৌধুরীকে।[৪১]

নবম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম হয়ে দশম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। এ সময় তিনি যার সংসারে ছিলেন, আহমদ সাগীর চৌধুরীর জীবনে বড় ধরনের আর্থিক সঙ্কট দেখা দেয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও তজ্জনিত পঞ্চাশের মন্বন্তরে তাঁর হাতে গড়া ব্যাঙ্ক ও ইন্সুরেন্স কোম্পানী দেউলিয়া হয়ে যায়। অন্যান্য ব্যবসাও বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। ফলে তীব্র আর্থিক সঙ্কটে মাহবুব উল আলম চৌধুরীর শিক্ষাজীবনে ছেদ পড়ে। তাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও পঞ্চাশের মন্বন্তর তাঁর জীবনে বিশেষ রেখাপাত করে। তাঁর কয়েকটি বক্তব্যে তা স্পষ্ট,

১. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ওই সময়টা ছিল সকল মানুষের জন্য এক মারাত্মক দুঃস্বপ্ন। ১৯৪১ সালে তার সূচনা এবং ১৯৪৫ সালে এর সমাপ্তি। এ সময় যুদ্ধের আগুনে এবং দুর্ভিক্ষের অভিঘাতে সাধারণ মানুষ তো বটেই, সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্তরাও নিঃস্ব হতে থাকে। যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের অভিঘাতে কেঁপে ওঠে জনজীবনের ভিত্তিমূল। চেনা জীবনের আশ্রয় থেকে মানুষ নিক্ষিপ্ত হয় এক অচেনা জগতের পরিবেশে।[৪২]

২. অত্যন্ত উগ্র মারণাস্ত্রের প্রয়োগে হাজার হাজার জনপদ, শিল্পালয়, বিদ্যালয় প্রভৃতি মানব সভ্যতার অমূল্য সম্পদ সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হতে দেখেছি। দেখেছি কচি দুধের শিশুটিকেও বোমার আঘাতে রক্তাক্ত ঢলে পড়তে। যুদ্ধের বলি হতে দেখেছি শান্তিপ্রিয় মানুষ। ধ্বংস হয়েছে হাজার হাজার সুখী পরিবার। লাখ লাখ মানুষকে হত্যালীলায় মাতিয়ে তুলে মানবতাকে নির্মম পাশবিকতার জঘন্য স্তরে নামিয়ে নিতে বাধ্য করেছে এই যুদ্ধ।[৪৩]

৩. গ্রাম থেকে ধীরে ধীরে অনাহারক্লিষ্ট লোকজন শহরের দিকে আসতে শুরু করে। নিরন্নের জোয়ার গ্রাম ছাপিয়ে এসে পড়ল শহরের চারিদিকে।

> ডাস্টবিনের চারিদিকে ক্ষুধাতুর মানুষ আর কুকুর খুঁজছে খাদ্য। বুড়ো, ছেলে, নারী-পুরুষ সকলেই শ্মশানের প্রেতের মতো খাদ্য খুঁজছে। দলে দলে ছুটছে পথের ওপর দিয়ে লঙ্গরখানার উদ্দেশ্যে, অসংখ্য তারা। হাতে ভাঙা থালা, মাটির পাত্র, টিনের কৌটা। ঘুরছে দলে দলে নারী। তার শুকিয়ে যাওয়া স্তনে শিশুর জন্য দুধ নেই। ফুটপাতে আর জায়গা নেই। লঙ্গরখানার এদের স্বর্গ, ফ্যান (ভাতের মাড়) এদের অমৃত। এরা বাঁচতে চায়। নারীরা এতটুকু ফ্যানের জন্য উন্মুক্ত ফুটপাতে সতীত্ব বিসর্জন দিচ্ছে। স্ত্রী নয়, পুত্র নয়, পিতা নয়– কেউ আর আপনার নয়। ইয়া নফ্সি, ইয়া নফ্সি।[৪৪]

৪. ওই সময় আমি গ্রামে কয়েকদিন ছিলাম। সেখানে দেখেছি প্রতিদিন শত শত মানুষের মৃতদেহ। অসংখ্য মানুষের কবর। কবর খোঁড়ার লোক নেই। কাফনের কাপড় কেনার পয়সা নেই। কলাপাতা জড়িয়ে মানুষকে গণ-কবরে দাফন করা হচ্ছে। মানুষের মৃতদেহের গন্ধ পেয়ে আকাশে উড়ছে শকুন।[৪৫]

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে তাঁদের সংসারে স্বচ্ছলতা আসে। এর পটভূমি পরে বর্ণিত হবে। এ পর্যায়ে ১৯৪৭ সালে মেজো মামার উৎসাহে গহিরা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে গণিত, ইতিহাস ও আরবিতে লেটার সহ বৃত্তি সহকারে প্রথম বিভাগে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন। একই বছর ভর্তি হন চট্টগ্রাম কলেজে। সেখানে সহপাঠী হিসেবে পান মোশফেকা রহমান (পরবর্তীকালে শামসুন্নাহার মাহমুদের জ্যেষ্ঠপুত্র মুক্তিযুদ্ধে শহীদ মামুন মাহমুদের স্ত্রী) ও মাহফুজুল হককে (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক)। কলেজের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তিনি অংশ নিতেন। উপস্থিত ও নির্ধারিত বক্তৃতায় প্রথম হয়েছিলেন। এতে ছাত্র-শিক্ষকের কাছে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। কলেজের বার্ষিক অনুষ্ঠানে চট্টগ্রামে প্রচলিত লোকসঙ্গীতের সুরে স্বরচিত একটি গান কণ্ঠে ধারণ করেন।[৪৬]

কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন আবু হেনা। অধ্যাপকদের মধ্যে আবুল ফজল ও মোতাহের হোসেন চৌধুরী ছিলেন বিশেষভাবে খ্যাত। মোতাহের হোসেন চৌধুরী সম্পর্কে লিখেছেন,

> ছাত্রদের কাছে খুবই জনপ্রিয়। তিনি শুদ্ধ উচ্চারণে আবেগময় ভাষায় প্রমথ চৌধুরী এবং রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পড়াতেন। সৌন্দর্যবোধ, রুচি এবং মূল্যবোধ নিয়ে নন্দিত রসে ভরা বক্তব্য দিতেন। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ভাবশিষ্য। তাঁর বক্তৃতায় পরিবেশ হয়ে উঠত আনন্দময়।.. আমার ফেরারি জীবনে অনেক সময় তাঁর বাসস্থান হয়ে উঠত আমার আশ্রয়স্থল।[৪৭]

ইতোমধ্যে তাঁর রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক জীবন বিশেষ স্ফূর্তি লাভ করে। তিনি ছাত্র কংগ্রেস ও ছাত্র ফেডারেশনে সম্পৃক্ত হয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, প্রগতিশীল সাময়িকপত্র 'সীমান্ত সম্পাদনা করছেন, যুক্ত আছেন নানা সাংস্কৃতিক কর্মপ্রয়াসে। ফলে তাঁর কলেজজীবন আর দশজনের মতো ছিল না। কারণ ইতোমধ্যে জীবনের বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছেন, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে

নিজেকে আবিষ্কার করেছেন। ফলে তিনি অনেকটা পরিণত ও অপেক্ষাকৃত বেশি সচেতন ছিলেন। ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এর চূড়ান্ত পরিণতি বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারিতে। সেখানে তিনি গৌরবময় অবদান রেখেছিলেন। কিন্তু এর বীজ বপন করেছিলেন ১৯৪৯ সালে, কলেজজীবনে। এ সম্পর্কে লিখেছেন,

> ১৯৪৯ সালে পূর্ব বাংলার গভর্ণর, কলকাতা কর্পোরেশনের এক সময়ের মেয়র, স্যার আবদুর রহমান সিদ্দিকী চট্টগ্রাম কলেজ পরিদর্শনে আসেন। কলেজ মিলনায়তনে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে কটূক্তি করেন এবং আরবি অক্ষরে বাংলা লেখার পক্ষে ওকালতি করেন। আমি তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করি এবং কিছু সংখ্যক ছাত্র নিয়ে হল থেকে বেরিয়ে আসি। অধ্যক্ষ আবু হেনা আমার এবং আমার মামার শিক্ষক আমাকে ওই ব্যাপারে ক্ষমা চাওয়ার পরামর্শ দেন। আমি সবিনয়ে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করি। এভাবে আমার ছাত্রজীবনের অবসান ঘটে।[৪৮]

সংসার-জীবন

মাহবুব উল আলম চৌধুরী ১৯৫২ সালের ১০ অক্টোবর চট্টগ্রাম শহরের রুমঘাটাস্থ শুকুর আলী মুন্সেফ সড়কে মাহবুবুর রহমানের কন্যা জওশন আরার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁর তখন দেশজুড়া খ্যাতি। রাজনীতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের মধ্য দিয়ে তিনি সবার দৃষ্টি কেড়েছিলেন। অমন পাত্রকে অগ্রাহ্য করার কথাও নয়। যদিও কন্যার অভিভাবক পক্ষ পাত্রের রাজনীতিক জীবনজনিত অনিশ্চয়তায় কথা মনে রেখে কিছুটা দোদুল্যমান ছিলেন কিন্তু পাত্র হিসেবে তাঁদের মানদণ্ডে ছিলেন যোগ্য ও উপযুক্ত। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত ইতিবাচক হয়। বিয়ে হয় সুচরিত চৌধুরীর দৌত্যে। বিয়ের সময় কন্যা ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী। ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর আকদ সম্পন্ন হয়। এ পর্যায়ে কন্যাপক্ষের পরিচয় জানা দরকার।

জওশন আরা রহমানের প্রপিতামহ শুকুর আলী উনিশ শতকের প্রথম দিকে ব্রিটিশের অধীনে চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় মুন্সেফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।[৪৯] জওশন আরার বাবা মাহবুবুর রহমান ছিলেন জেলা-রেজিস্ট্রার। জ্যেষ্ঠ সহোদর হাবিবুর রহমান ছিলেন চট্টগ্রাম কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক, তিনি করাচিতে পরিকল্পনা কমিশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন। তাঁর স্ত্রী সুলতানা রাহমান প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী বুলবুল চৌধুরীর সহোদর। তারপর বোন হুসনুন্নাহার, তাঁর স্বামী প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক মোতাহের হোসেন চৌধুরী, তারপরে ভাইবোনেরা বয়োক্রমে নুরুন্নাহার, লুতফর রহমান, আবু মোহাম্মদ শাহাবুদ্দীন, সর্বকনিষ্ঠ জাহানারা ইসলাম। কনিষ্ঠজনের স্বামী ডক্টর রফিকুল ইসলাম–নজরুল-বিশেষজ্ঞ, বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমিরিটাস অধ্যাপক।

জওশন আরার মা সাদীদা খানম 'মৌলুদ শরীফ' (চট্টগ্রাম: ১৯৬৪, দ্বিতীয় প্রকাশ–ঢাকা: পালক পাবলিশার্স ২০১১) শীর্ষক পুস্তিকার রচয়িতা। কামাল উদ্দিন খান জওশন আরার মাতুল। তিনিও নিজ গুণে গুণান্বিত। কবি সুফিয়া কামাল তাঁই স্ত্রী। সুলতানা রাহমান 'বুলবুল চৌধুরী' শীর্ষক একটি অনন্য জীবনীগ্রন্থের প্রণেতা (ঢাকা: বাংলা

একাডেমী, ১৯৮৪, প্রথম প্রকাশ ১৯৬২)। অতএব বোঝা যাচ্ছে, একটি সারস্বত পরিবারেই মাহবুব উল আলম চৌধুরী দারপরিগ্রহ করেন। অধ্যাপক শামসুল হুদা হারুন কৌতুক করে জওশন আরাকে একবার বলেছিলেন, আপনার আব্বা কি সাহিত্যিক দেখে দেখে সব মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি আব্বার অশেষ আগ্রহই ছিল বোধকরি এর অন্তর্নিহিত কারণ।[৫০]

শুভ পরিণয় অনুষ্ঠিত হয় ১০ অক্টোবর ১৯৫২-তে, চট্টগ্রাম কলেজ হোস্টেলে। এর বিবরণ দিয়েছেন জওশন আরা,

> তখন যদিও বর্ষাকাল ছিল না, সেদিন সারাদিন মুষলধারে বৃষ্টি পড়েছিল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ এবং বৃষ্টির সুর যেন আমার মনের বেদনার কথা বলছিল। আমাকে মা-বাবার লালিত আশ্রয় ছেড়ে চলে যেতে হবে অন্য জগতে। সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টি থামল। মোটর শোভাযাত্রা সহকারে ব্যান্ড বাজিয়ে বরযাত্রী আসতে শুরু করলো। বহুলোকের সমাগম হয়েছিল সেদিন।[৫১]

শুভ পরিণয় উপলক্ষে দেশবিদেশের অনেক গুণীজন শুভেচ্ছা পাঠিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন উদয় শঙ্কর, অমলা শঙ্কর, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, অন্নদাশঙ্কর রায়, বুদ্ধদেব বসু, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, আবুল ফজল, সুফিয়া কামাল, আবদুল গনি হাজারী, শওকত ওসমান, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সরদার জয়েনউদ্দীন, নূরজাহান মুরশিদ, প্রমুখ। শুভেচ্ছা-সংবলিত একটি সংকলন বের করেন সুচরিত চৌধুরী এবং মাসিক 'উদয়ন পত্রিকার সম্পাদক রুহুল আমিন নিজামী। প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী বিজন চৌধুরী। জওশন আরা এসব তথ্য বিবৃত করে লিখেছেন,

> কলেজের ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে হোস্টেল বিল্ডিং মঞ্চ ইত্যাদি সাজিয়েছিলেন এবং নিজেরাই খাবার পরিবেশন করেছিলেন।... শ্বশুর বাড়ির পক্ষে মামি খুরশীদ জাহান বেগম এবং আমাদের পক্ষে আব্বার নামে প্রথাসিদ্ধ চিঠি ছাপানো হয়েছিল। এছাড়া শ্বেত কপোত আঁকা আরেকটি নিমন্ত্রপত্র মাহবুব এবং আমার যুগ্ম নামে ছাপানো হয়েছিল। এই রকম একটা অভিনব বিয়ের চিঠি দেখে সকলে অবাক হয়েছিল।[৫২]

সুফিয়া কামাল আশীর্বাদ করে মাহবুব উল আলম চৌধুরীকে চিঠি দিয়েছিলেন। লিখেছিলেন,

> মাটি বড়বেশী শক্ত, অথচ মাটিতেই ফলে ফসল, ফল, ফুল; উর্ব্বর করতে হয় শক্তিতে, ধৈর্যে, মমতায়। রঙিন আলো আছে, আছে অগ্নির উত্তাপ। তোমাদের পথে ক্লান্তি না আসে এই প্রার্থনা। দু-জনে দু'জনের কাছে আজকের মতোই সরল থাকবে, আশা করি সব সহজ হবে।

বিবাহ উপলক্ষে লেখক-শিল্পীদের প্রেরিত শুভেচ্ছাবাণীর দুটি উদ্ধৃত হলো–

> ক্ষুধা কাতর মানুষ সুধা ভিখারী,
> প্রিয়তম পুরুষ আর প্রিয়তমা নারী-
> সেই সুধার অধিকারী।

যৌবনের রাঙা- ভাঙা তীরে এসে,
দুটি জীবন আজ এক হয়ে যাক্ মিশে।
জওশন হউক মাহবুব
মাহবুব হউক বুলবুল
উভয়ের জীবন হউক এক বৃন্তে দুটি ফুল্।
– আবুল ফজল

প্রীতিভাজনেষু,
আজও নয় পলাতক প্রীতির এ-পথ,
আজও মন ভালোবাসে মনের শপথ,
আজও প্রাণ প্রাণে চায় ঢেলে দিতে কথা,
জীবনের তা-ই বুঝি আকাশ- ধ্রুবতা।
– সঞ্জয় ভট্টাচার্য

বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ জওশন আরা রহমানের কর্মময় জীবন। প্রথমে নারী-উন্নয়ন কর্মসূচি প্রধান এবং পরবর্তীতে প্রোগ্রামে- প্ল্যানিং সেকশনের প্রধান হিসেবে ইউনিসেফে কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করেন। নারী উন্নয়ন এবং শিশু অধিকার বিষয়ে তাঁর বিভিন্ন লেখা দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৬০ সালে চট্টগ্রামে শহর সমাজকল্যাণ অফিসার হিসেবে সরকারি চাকরিতে যোগ দেন। ১৯৭৯ সালে ইউনিসেফে যোগদান করেন। তিনি লেখাপড়া, প্রশিক্ষণ, কনফারেন্স উপলক্ষ্যে আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ইউরোপ, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং এশিয়ায় প্রায় ত্রিশ দেশে ভ্রমণ করেন। শিক্ষাজীবনে ১৯৫৫-১৯৫৬ সালে চট্টগ্রাম কলেজ ছাত্র সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৭ সালে কলেজের বার্ষিক ম্যাগাজিন 'অন্বেষা' সম্পাদনা করেন। ১৯৫৭ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রী সংসদের চট্টগ্রাম জেলা শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। ওয়েলিংটনে ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে সোস্যাল সায়েন্স-এ পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৬৮ সালে চাকরিরত অবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে তৎকালীন ইনস্টিটিউট অব সোস্যাল ওয়েলফেয়ার থেকে স্নাতকোত্তর পাস করেন। ১৯৯৭-২০০২ সালের পাঁচ বছর মেয়াদী National Action Plan for Children প্রণয়নে টিম-লীডার হিসেবে কাজ করেন। বাংলাদেশের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় 'নারী উন্নয়ন' এবং পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় 'শিশু উন্নয়ন' ম্যাক্রো চ্যাপ্টার সংযোজনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি বহুবিধ উন্নয়ন কর্মসূচির সঙ্গে জড়িত। 'স্মৃতিকথা: অজানা মেয়ের কথা' তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা, যেখানে তাঁর ব্যক্তিজীবনের পাশাপাশি তৎকালীন সমাজচিত্র, বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ছবি ফুটে ওঠেছে।

কবির সংসারে জওশন আরা সংগ্রাম করেই এগিয়ে গেছেন। এটা সম্ভব হয়েছিল এ কারণে যে, তারা পরস্পরকে উপলব্ধি করতে পারতেন, বুঝতেন। সংসারের ঝুট ঝামেলা সামাল দিতে পারতেন। কবিস্বভাবের কারণে গৃহকর্তা অনেক সময় বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করতে পারতেন না। এর সবই মেনে নিয়েছিলেন ঘরকন্যা। ঢাকা-কলকাতার কোনো গুণীজন চট্টগ্রাম আসা মানেই তিনি বা তাঁরা ওঠবেন মাহবুব উল আলম চৌধুরীর বাড়িতে– বন্ধুত্ব, সহমর্মি ও সহযোদ্ধার সূত্রে। মাহবুব উল আলম চৌধুরী গুণীজনের

সান্নিধ্য পছন্দ করতেন। তাঁর বাসগৃহটিও ছিল সংস্কৃতিকর্মীদের আড্ডাস্থল। সবই সামাল দিতে হতো ঘরকন্যাকে। ১৯৫৭ সালে কাগমারী সম্মেলনে চট্টগ্রাম থেকে মাহবুব উল আলম চৌধুরীর নেতৃত্বে যে বিরাট বাহিনী সম্মেলনে যোগদান করেন এরা সবাই কৃষ্টি কেন্দ্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। তখন ট্রেনে খাওয়া-দাওয়ার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এ কথা উল্লেখ করে কবিপত্নী লিখেছেন,

> যাবার একদিন আগে রিহার্সেল শেষে মাহবুব আমাকে বললো, ট্রেনে খাবারের কোন আয়োজন নেই। পঞ্চাশজনের জন্য তোমাকে খাবার তৈরি করে দিতে হবে। আমার মনে আছে সারা রাত জেগে তাদের জন্য রুটি তৈরি এবং খাবার রান্না করে দিতে হয়েছিল আমাকে।[৫৩]

মাহবুব উল আলম চৌধুরী ছিলেন কবি, রাজনীতিবিদ ও সংস্কৃতি সংগঠক। প্রগতিশীল ভূমিকার কারণে তিনি ছিলেন সরকারের চক্ষুশূল। এজন্য তাঁর জীবন নিরুদ্বিগ্ন ছিল না। পদে পদে তিনি নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। ফলে সংসারের দিকে তেমন নজর দিতে পারেননি। আর এ কাজটি করেছেন তাঁর স্ত্রী। তবু সংসারে শান্তির সুবাতাস বইতো। বিপদ ছিল, ছিল শঙ্কা ও ঝঞ্ঝা। সেসব রাজনৈতিক হলেও তা ব্যক্তিজীবনকে স্পর্শ করে যায়, স্পর্শ করে সংসারকে।

১৯৫৮ সালে দেশে সামরিক আইন জারি হলে মাহবুব উল আলম চৌধুরী আত্মগোপনে চলে যান। ফলে সংসারের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। এর আগে যুক্তফ্রন্টকে হেয় পতিপন্ন করার জন্য ৯২ক ধারায় কেন্দ্রের শাসন জারি করা হয়। ৯২ক ধারা জারির পরদিন ভোরে পুলিশ তাদের কদম মোবারকের বাসা ঘিরে ফেলে। উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে না পেয়ে দীর্ঘদিনের ডায়েরি, কয়েকটি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত করে। এ ঘটনা উল্লেখ করে জওশন আরা লিখেছেন,

> এর মধ্যে একদিন মাহবুব তার এক ভগ্নিপতিকে দিয়ে আমার কাছে একটি চিঠি পাঠালো। তাতে লেখা ছিল, আমাকে এবং মেয়েকে শেষবারের মতো দেখতে চায়। সে বর্তমান আশ্রয় ছেড়ে অনেক দূরে চলে যাবে। তার সাথে আর জীবনে কোনদিন দেখা না-ও হতে পারে। আমি যেন মুন্নিকে নিয়ে এই ভগ্নিপতির সঙ্গে সেদিনই তার সাথে দেখা করার জন্য রওনা হই। এই খবর পেয়ে আব্বা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বললেন, আমাকে অনুসরণ করে পুলিশ সেখানে যাবে এবং মাহবুবকে ধরে ফেলবে। ... অন্যনোপায় হয়ে আব্বা বোরখা পড়ে যাওয়ার অনুমতি দিলেন যেন আমাকে কেউ চিনতে না পারে।[৫৪]

তারপর লিখেছেন রূঢ় বাস্তবতা ও বৈরী পরিস্থিতির কথা,

> রুমঘাটা থেকে ঘোড়ার গাড়ি করে চাকতাই এসে কর্ণফুলী নদীতে সাম্পানে উঠলাম। সমুদ্রে উত্তাল ঢেউ। তার মধ্যে আমাদের নৌকা ঢেউয়ের তালে একবার ডুবছে আবার ভেসে উঠছে। মেয়েকে কোলে নিয়ে আমি যেন পানির মধ্যে ভেসে চলেছি। আমার ভয়-ভীতি কোথায় উবে গেছে। অধীর অপেক্ষায় ক্ষণ গুণছি। যেদিকে চোখ যায় সব পানি আর পানি। ক্রমে কর্ণফুলীর সেই ভয়ঙ্কর যাত্রা শেষে আমাদের নৌকা ছোট নদীতে প্রবেশ করলো। তারপর

> কদলপুর গ্রামে পৌঁছলাম। কতখানি পথ পাড়ি দিতে হয়েছিল মনে পড়ছে না। সন্ধ্যা ছয়টার দিকে আমার ননদের বাড়ির পেছনের উঠোন দিয়ে আমাদের নৌকা ভিড়লো।... মাটির দেয়াল, টিনের ছাউনি দেয়া ঘর। পরিস্কার ঝকঝকে মেঝে, মাটি দিয়ে লেপা। প্রদীপ জ্বলছে মিট মিট করে। আমার অবুঝ মনে আর তর সইছেনা, কখন তাকে দেখবো। বারান্দা পার হয়ে ঘরে ঢুকতেই মাহবুব এগিয়ে এলো। এক অসহ্য বেদনায় মন কেঁদে উঠল। তার মুখে দাড়ি। পরনে লুঙ্গী গায়ে গেঞ্জি। এ যেন অন্য কেউ, মাহবুব নয়।[৫৫]

হুলিয়া প্রত্যাহারের পর মাহবুব উল আলম চৌধুরীর তাঁর বন্ধু আজিজুস সামাদের পরামর্শক্রমে চট্টগ্রামস্থ প্রুডেনসিয়াল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। কোম্পানী উত্তরোত্তর উন্নতি, বীমা ব্যবসা ও অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে যে পুঁজি সঞ্চয় হয় তা দিয়ে ৬০ নম্বর দেওয়ান বাজারে ছোট্ট বাড়ি করেন। ফলে রুমঘাটা পিতৃবাড়ি ছেড়ে জওশন আরা নিজের বাড়িতে ওঠেন। মাহবুব উল আলম চৌধুরী ছিলেন প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রান্তিক নব নাট্য সংঘের প্রাণপুরুষ। তৎকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতায় সংগঠনটিকে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব ছিল না। সংগঠনের স্মৃতি রক্ষার্থে বাড়ির নাম রাখা হয় 'প্রান্তিক'। 'প্রান্তিক' ছিল চট্টগ্রামের প্রগতিশীল সংস্কৃতিকর্মীদের আড্ডাস্থল।[৫৬]

১৯৬৬ সাল থেকে পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠান নিজেদের মধ্যে ঘরোয়াভাবে শুরু করেন, বাড়ির পেছনের উঠোনে। জওশন আরা স্মৃতিচারণ করেছেন,

> ঊষালগ্নে সুচরিতদার বাঁশী বাদনের মধ্য দিয়ে পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠান শুরু হতো। তারপর সকলে মিলে 'এসো হে বৈশাখ এসো এসো' এই গান গেয়ে আমরা বছরের প্রথম দিনকে বরণ করতাম। চমৎকার আবৃত্তি করতেন চিত্তরঞ্জন দাশ। পর পর অনেকগুলো একক ও সম্মিলিত গানের শেষে পরিবেশন করা হতো লুচি-তরকারি। পুতুল রানী এতে আমাকে সহায়তা করতেন। রোদ তীব্র হয়ে ওঠার আগেই আমাদের অনুষ্ঠান শেষ হতো।[৫৭]

এই দম্পতির একমাত্র সন্তান মুন্নী– সাফিনা আহমেদ। পাঁচ বছর বয়সে ওস্তাদ বেলায়েত আলীর নিকট শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিখেছেন। ওয়াহিদুল হকের কাছে শিখেছেন রবীন্দ্রসঙ্গীত। ছোটবেলায় আয়োজন করেছিল ছোটদের রবীন্দ্রজয়ন্তী। ষাটের দশকে পহেলা বৈশাখ, রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী, গণসঙ্গীত এবং নানাধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁর স্বামী ইশতিয়াক আহমেদ, স্থপতি। তাদের দুই পুত্রসন্তান– ইখতিসাদ, ইবতিসাম। মুন্নীর শ্বশুর এম এ রকীব খ্যাতনামা রাজনীতিক, শাশুড়ি উম্মে কুলসুম ছিলেন নওগাঁ সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। ইখতিসাদ আহমেদ লন্ডনের ইনার টেম্পল থেকে ব্যারিস্টার হয়েছেন। তিনি সাহিত্যচর্চায় মনোযোগী। ইতোমধ্যে তাঁর দুটি গ্রন্থ বের হয়েছে– কাব্যগ্রন্থ Cryptic Verses (Dhaka: Mati ar manush, 2009) এবং নাটক The Peliverence of Sanctuary (Autor House™ UK Ltd. 2010). কনিষ্ঠজন নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক পর্যায়ে অধ্যয়নরত।

মাহবুব উল আলম চৌধুরী ১৯৭৫ সালে ঢাকায় স্থায়ীভাবে এসে ভাড়া বাড়িতেই থাকতেন। তারপর উত্তরায় বাড়ি করেন। বাড়ির নাম রাখা হয় 'সীমান্ত' পত্রিকার নামে– 'সীমান্ত'। তাঁদের দীর্ঘদিনের দাম্পত্য জীবন ছিল মধুর ও সৌন্দর্যমণ্ডিত। মাহবুব উল আলম চৌধুরীর কণ্ঠে শুনি এ সৌন্দর্যের স্বরূপ,

> আমি রাজনীতিতে যুক্ত থাকায় সে জীবনে বহু দুর্যোগের মুখোমুখি হয়েছে। কিন্তু আমাকে কোনোদিন তার জন্য দোষারোপ করেনি। বরঞ্চ আমি যেন জীবনে বিষণ্নতা এবং নিরাপত্তাহীনতা থেকে মুক্ত হতে পারি, কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হতে পারি, সেজন্য নানাভাবে পরামর্শ দিয়ে, সঠিক নির্দেশনা দিয়ে, ভবিষ্যতের আশাবাদ দিয়ে, স্নেহ এবং ভালোবাসা দিয়ে আমাকে সুখী করার চেষ্টা করেছে। গোপনে তার ডায়েরি পড়েছিলাম, ওখানে লিখেছে– মাতৃস্নেহ বঞ্চিত, নানাভাবে অবহেলিত এবং সংগ্রামরত অতি সরল অভিমানী এই শিশুটিকে মানুষ করাই এখন থেকে আমার ব্রত হবে। এটা পড়ে চোখে জল এসেছিল। ...জীবনে যদি তার মতো স্ত্রী না পেতাম, লেখালেখি এবং রাজনীতির সঙ্গে গাটছড়া না বাঁধতাম, তাহলে আমার জীবনটা অর্থহীন হয়ে পড়তো।[৫৮]

জওশন আরা বন্ধু-স্বামীর আশিতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দীর্ঘ দাম্পত্যজীবনের শুরু, চড়াই-উৎরাই, আনন্দ-বেদনার যে চিত্র এঁকেছেন, তাতে সংসার-জীবনের প্রকৃত ছবি ফুটে ওঠেছে,

> জীবনের বহু চড়াই-উৎরাই পার হয়েছি। কঠোর বাস্তবতার সম্মুখীন হয়েছি। কখনো আনন্দের স্রোতে ভেসেছি। কখনো বেদনায় ভেঙে গেছি। কখনো অভিমানে মুখ ফিরিয়েছি। ক্ষোভে বিমর্ষ হয়েছি। রাগান্বিত হয়েছি। বিনিদ্র রাত্রিযাপন করেছি। আবার দু'জনে হাত মিলিয়েছি। প্রাণে প্রাণ এক করেছি। পরস্পর পরস্পরকে বুঝতে সচেষ্ট হয়েছি। ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছি একে অপরের কাছে। তাতে আমরা নিজেদের ক্ষুদ্র মনে করিনি। দুর্বার শক্তি সঞ্চয় করেছি। দু'জনে দু'জনের আলোতে উদ্ভাসিত হয়েছি। সমৃদ্ধ হয়েছি।
>
> ১৯৫২ থেকে ২০০৬-এর সুদীর্ঘ বিবাহিত জীবনে মাহবুবকে বন্ধু হিসেবেই বেশি পেয়েছি। এখন মনে হয়– জীবন এত ছোট কেন?[৫৯]

কর্মজীবন

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিভীষিকা, বাস্তবতা এবং তজ্জনিত মন্বন্তরে আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য মাহবুব উল আলম চৌধুরীর পড়াশুনায় ছেদ পড়েছিল। পরিবার বলতে যার সংসারে তিনি ছিলেন, মামা আহমদ সাগীর চৌধুরী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কারণে তাঁর জুবিলী ওভারসিজ ব্যাঙ্ক ও ইন্সুরেন্স কোম্পানী (১৯৩৭) দেউলিয়া হয়ে যায়, অন্যান্য ব্যবসাও বন্ধের উপক্রম হয়। ফলে তিনি প্রায় নিঃস্ব হয়ে যান। যুদ্ধের বাস্তবতা, এর সঙ্গে মাহবুব উল আলম চৌধুরীর জীবনের যোগ পূর্বোল্লিখিত হয়েছে। এ অবস্থায় মামার সংসার চালানো দায় হয়ে পড়ে। তখন তাঁর কনিষ্ঠ মামা লুৎফে আহমদ চৌধুরী আন্দরকিল্লায় একটি দোকান ভাড়া নিয়ে সেখানে খুলে বসলেন মুদির দোকান। তিনি লিখেছেন,

> আমি মাঝে মাঝে ওই দোকানে বসতাম এবং দাঁড়িপাল্লায় নিয়ে নিজের হাতে চাল, ডাল, গম, নুন, তেল ইত্যাদি বিক্রি করতাম। এতে করে মুদির দোকান সম্পর্কে আমার কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়। এক পর্যায়ে ছোট মামা বোমার ভয়ে আমাকে নিয়ে গ্রামে চলে যেতে চাইলেন। মেজ মামা ও মামী গ্রামে যেতে অসম্মতি জানালেন। আমিও মেজ মামার পরিবারকে এই দুর্দিনে পরিত্যাগ করে গ্রামে যেতে সম্মত হলাম না।

তিনি সেখানে একটি মুদির দোকান খুলেন। যেহেতু তাদের পুঁজি তেমন ছিল না, তাই দু-একদিন পর পরই খাতুনগঞ্জ ও চাকতাই থেকে জিনিসপত্র পাইকারি দামে কিনে আনতেন এবং খুচরা দামে বিক্রি করতেন। তাতে যে রোজগার হতো তা দিয়ে সংসার চলতো।[৬০] তারপর শুরু হয় দিন ফেরার কাহিনী। তিনি লিখেছেন,

> একদিন আমার দোকানে সাবান কেনার জন্য এলেন এক ইংরেজ সৈনিক। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট রবার্ট ক্রস। প্রথম দিনেই তার সঙ্গে আমার হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। তাকে আমি আমার এবং মামার জীবনের সব কাহিনী খুলে বললাম। তিনি আমাদের প্রতি খুব সহানুভূতিশীল হয়ে উঠলেন। ১৯৪৩ সালের কথা। রবার্ট ক্রস ছিলেন ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির একজন সদস্য। রবার্ট ক্রস আমাকে মার্কসিজমের ওপর এমিল বার্নের 'What is Marxism... ও জন স্ট্রেচির Why You should Be a Socialist' বই দুটি পড়তে দেন। আমি বই দুটি পড়ে মার্কসিজমের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি[৬১]

তারপরের বৃত্তান্ত এ রকম,

> শহরের অবস্থা যখন এরকম তখন রবার্ট ক্রস একদিন আমাকে বললেন, যেন গ্রাম থেকে মামাকে খবর দিয়ে শহরে নিয়ে আসি। দু'দিন পরই মামা শহরে এলেন। তার সঙ্গে পরামর্শক্রমে রবার্ট ক্রস ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর জন্য একটি আধুনিক রেস্টুরেন্ট খোলার পরামর্শ দেন। কে. সি. দে রোডের এখন যেখানে সোনালী ব্যাংক, ওখানে ছিল কলকাতা ন্যাশনাল ব্যাংক। তার উল্টোদিকে যে দালানটিতে এক সময় চিটাগাং স্টোরস ছিল যুদ্ধের কারণে সেটা বন্ধ হয়ে যায়। সেই দালানের মালিক ছিলেন চকবাজারের সৈয়দ আহমদ খান। তখন চট্টগ্রাম ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট স্টুয়ার্ট এবং ডিভিশনাল কমিশার জেমিসন। রবার্ট ক্রস মামাকে স্টুয়ার্টের কাছে নিয়ে গিয়ে ওই সম্পূর্ণ দালানটি রিক্যুজিশন করে নেন। ওখানে শুরু করা হয় রেস্টুরেন্ট। ক্রস এর নাম দিয়েছিলেন Trocadero। ...রবার্ট ক্রস সেনাবাহিনীকে খাদ্য সরবরাহের একটি কন্ট্রাক্টও আমাদের পাইয়ে দেন। সার্কিট হাউজের বিপরীতে ছিল আর্মির খাদ্য ডিপো। আমরা সেখানে আলু, মাছ, মুরগি এবং ফলমূল সাপাই দিয়েছি প্রায় এক বছর। এতে আমরা প্রচুর অর্থ সম্পদের মালিক হয়ে উঠি।[৬২]

১৯৪৯ সালে আহমদ সাগীর চৌধুরী মারা গেলে তাঁর বিষয়সম্পত্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি দেখভালের দায়িত্ব পড়ে মাহবুব উল আলম চৌধুরীর ওপর। তখন তাঁর মামাতো ভাই-বোনেরা সবাই ছোট। লিখেছেন তিনি,

> কলকাতায় সিনেমা হল, সাগীর পিকচার্স নামের ফিল্ম পরিবেশনা এবং প্রযোজনা কোম্পানি এবং চট্টগ্রামে খুরশীদ মহল সিনেমা হল চালাতে গিয়ে আমি মাঝে মাঝে ধৈর্য হারিয়ে ফেলতাম। এর পরেও ছিল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, 'সীমান্ত' প্রকাশনা এবং রাজনীতির প্রতি আমার গভীর অঙ্গীকার। একসময় রাজনীতি, সংস্কৃতি এবং ব্যবসার কাজ এক সঙ্গে চালানো আমার পক্ষে কঠিন হয়ে ওঠে। তবুও আমার ছোট ছোট মামাতো ভাইবোনদের মুখের দিকে চেয়ে এই দুরূহ কাজ আমি সম্পাদন করেছি। মামার এই সাম্রাজ্যে যদিও কিঞ্চিত অংশীদার আমি ছিলাম।[৬৩]

এ প্রসঙ্গে আরও লিখেছেন,

> আমার কাজের এবং দায়িত্বের পরিধি এত বেড়ে গেল যে আমি খাওয়া এবং গোসলের সময় পর্যন্ত পেতাম না। কলকাতার কর্পোরেশন স্ট্রিটের সিনেমা হলের নির্মাণ কাজ তদারক করা, খিদিরপুর সিনেমা হলের জন্য কেনা জমি দখলে রাখা, চট্টগ্রাম খুরশীদ মহল সিনেমার জন্য ফিল্ম বুক করা, করাইয়া রোডের বাড়িতে মামীদের থাকা-খাওয়ায় যেন কোনো অসুবিধা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা, সীমান্তের জন্য লেখা সংগ্রহ করা– সব মিলে আমি ভয়ানকভাবে ভারগ্রস্থ হয়ে পড়লাম।[৬৪]

মাহবুব উল আলম চৌধুরী জীবিকা নির্বাহের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে কোনো কর্মে কখনো নিয়োজিত ছিলেন না। সাহিত্য-সংস্কৃতি, সংগঠন, পত্রিকা সম্পাদনা, রাজনীতি ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। ১৯৫৪ সালে ৯২ক ধারায় আত্মগোপন থেকে ফেরার পর তিনি চট্টগ্রামস্থ প্রুডেনস্নিয়াল ইন্সুরেন্স কোম্পানীর প্রধান কর্মকর্তা তাঁর বন্ধু আজিজুস সামাদের আগ্রহ-আতিশয্যে এর সঙ্গে যুক্ত হন। বিশেষ ধৈর্য ও জনপ্রিয়তার জন্য সাফল্য অর্জন করেন। বীমা ব্যবসা ও অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে যে পুঁজি সঞ্চয় হয় তা দিয়ে বাড়ি করেন। ফলে সংসারে আসে স্বচ্ছলতা। মুক্তিযুদ্ধের পর চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশ করেন দৈনিক স্বাধীনতা। সেখানে যুক্ত থাকেন কিছুদিন। ১৯৭৫ সালে স্থায়ীভাবে ঢাকায় আসার পর এলিট প্রিন্টিং ও প্যাকেজিং-এর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন—এই তাঁর কর্মজীবন।

রাজনৈতিক জীবন

চল্লিশ দশক থেকে শুরু করে পাকিস্তান সৃষ্টি এবং পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত পূর্ব বাংলার প্রত্যেকটি রাজনৈতিক সংগ্রামে মাহবুব উল আলম চৌধুরী অবদান রাখেন। দেশীয় ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদের বিরোধিতা ছিল তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার অন্যতম দিক। কল্যাণধর্মী, সমাজবাদী ও উদারনীতিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি নিরন্তর সংগ্রাম করেছেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবন আবর্তিত হয়েছে সমকালীন সমস্যা, সঙ্কট ও অচলায়তনকে ঘিরে। জাতির সামনে যখন যে সঙ্কট উদ্ভব হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে সংগ্রাম করেছেন জনগণের পক্ষে। গণমুখিতা ছিল তাঁর রাজনৈতিক ভাবাদর্শের মৌল বৈশিষ্ট্য।

কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির ছাত্রসংগঠন ছাত্র কংগ্রেসে যোগদানের মধ্য দিয়ে মাহবুব উল আলম চৌধুরীর রাজনৈতিক জীবন শুরু। অল্পকাল ব্যবধানেই তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসে পরিবর্তন আসে। তিনি বামপন্থী রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং সমাজবাদের যে দীক্ষা গ্রহণ করেন তা আমৃত্যু অক্ষুণ্ন থাকে।

ছাত্র কংগ্রেস

চট্টগ্রাম জেলা ছাত্র কংগ্রেসের সম্পাদক বৈদ্যনাথ মিত্র তাঁকে টেনে নেন ছাত্র কংগ্রেসে। ১৯৪২ সালে ভারত-ছাড়ো আন্দোলনে যোগ দিতে গিয়ে কাচারি পাহাড়ের নিচে অবস্থিত সাব-রেজিস্ট্রি অফিস পুড়িয়ে দিতে গিয়েছিলেন এবং পুলিশের হাতে ধরা পড়ে জেলও খেটেছিলেন। প্রমাণের অভাবে মুক্তি দেয়া হয়।[৬৫] ছাত্র কংগ্রেসে ছিল কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির ছাত্রসংগঠন। নেতৃত্বে ছিলেন দীনেশ দাশগুপ্ত, পুলিন দে, হেমেন্দু দস্তিদার, মুহাম্মদ ইদ্রিস– এদের সঙ্গে ভারত–ছাড়ো আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন, বহু গোপন সভায় যোগ দিয়েছেন। পরিচিত হয়েছেন কংগ্রেসের নেতা বিনোদ বিহারী চৌধুরী, যতীন রক্ষিত, 'দৈনিক পাঞ্চজন্য'-এর সম্পাদক অম্বিকা দাশ, চারুদত্ত, সাপ্তাহিক 'যুগধর্ম' পত্রিকার সম্পাদক জ্যোতিষ কর, মাওলানা মনিরুজ্জমান এসলামাবাদী প্রমুখের সঙ্গে।[৬৬]

একবার মেথরদের দাবির সমর্থনে অনশন করেছিলেন বলে দৈনিক 'পাঞ্চজন্য'-এ তাঁর ছবি উঠেছিল। ছাত্র কংগ্রেসের সাংস্কৃতিক শাখা তরুণ সাহিত্য সংঘের তিনি ছিলেন সম্পাদক।[৬৭]

১৯৪৪ সালে অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রসার ঘটানোর উদ্দেশ্যে চট্টগ্রামে আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কিংবদন্তিতুল্য পুরুষ হুমায়ুন কবিরকে। তাঁকে চট্টগ্রাম রেলস্টেশনে মাল্যভূষিত করে নিয়ে আসা হয় সাহিত্য সংঘের অফিসে। পুলিশি নির্যাতনের বিরুদ্ধে মাহবুব উল আলম চৌধুরীর নিজের লেখা 'দারোগা' নাটকের পাণ্ডুলিপি পড়ে ভূমিকা লিখে দেন, যার প্রথম বাক্য– 'আনন্দই সৃষ্টির উৎস'। হুমায়ুন কবির সভাস্থলে যেতেই মুসলিম লীগের পেশীসর্বস্ব সমর্থকেরা স্লোগান দিতে শুরু করে 'কংগ্রেসের দালাল ফিরিয়া যাও।' তাঁদের দিকে ইট-পাটকেল ছুঁড়তে থাকে।[৬৮] এ ঘটনা ছিল মাহবুব উল আলম চৌধুরীর মর্মবেদনার কারণ।

ছাত্র ফেডারেশন ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলন

১৯৪৪ সালে মাহবুব উল আলম চৌধুরী যোগ দেন ছাত্র ফেডারেশনে। ক্রমে তিনি বামপন্থী রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন। সেই উত্তাল দিনগুলোর ঢেউ চট্টগ্রামকেও তরঙ্গায়িত করে তোলে। তদানীন্তন চট্টগ্রাম জেলা কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড কল্পতরু সেনগুপ্ত, ছাত্রনেতা মধু সিংহ, চিরেন সরকার ও চিত্ত বিশ্বাসের আহ্বানে এবং অনুপ্রেরণায় তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন।[৬৯]

১৯৪৫ সালে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয় বোয়ালখালীর কধুরখিল গ্রামে তিন দিনব্যাপী ছাত্র ফেডারেশনের প্রাদেশিক সম্মেলন। সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার কাজে তিনি

নিয়োজিত ছিলেন। শেষ দিনের প্রকাশ্য অধিবেশন হয় চট্টগ্রাম মুসলিম হল প্রাঙ্গণে। সম্মেলনে কলকাতা থেকে এসেছিলেন গীতা মুখার্জী, অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য, রমেন ব্যানার্জী, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, কমলাপতি রায় প্রমুখ। আর ঢাকা থেকে এসেছিলেন মুনীর চৌধুরী, আখলাকুর রহমান ও রবিগুহ। কলকাতা থেকে আরো এসেছিলেন ভবানী সেন, গোপাল হালদার, সত্যপ্রিয় রায় এবং কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। সম্মেলনকে সফল করে তোলার জন্য ছাত্র ফেডারেশনের নেতাকর্মীরা প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছিলেন। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী মুনীর চৌধুরী, আখলাকুর রহমান, অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল আহমদ সাগীর চৌধুরীর সিনেমা হল খুরশীদ মহলের তিন তলায়। মাহবুব উল আলম চৌধুরী সেখানেই থাকতেন। ওই সূত্রে সুকান্ত ভট্টাচার্যসহ সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জন্মে। সম্মেলনে সুকান্তের সঙ্গে একই মঞ্চে তিনি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।[৭০]

কাহাড় পাড়া ঘটনা

ছাত্র ফেডারেশন সম্মেলনের শেষদিনে এক দুর্ঘটনার খবর শুনে সবাই উত্তেজিত হয়ে পড়ে। চট্টগ্রাম শহর থেকে প্রায় আট-নয় মাইল দূরে আতুরার ডিপোর কাছে কাহারপাড়া গ্রাম। ব্রিটিশ সৈন্য বাহিনীর পাইওনিয়ার কোরের সৈন্যরা থাকতো নতুনপাড়া স্টেশনের নিকটবর্তী ক্যান্টনমেন্টে। কয়েকজন সৈন্য কাহার পাড়ায় ঢুকে এক যুবতীর শ্লীলতাহানি করে। তার চিৎকারে পাড়ার লোকেরা ছুটে সৈন্যদের মারধর করে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু প্রতিশোধপরায়ণ সৈন্যরা দলবল নিয়ে পরের দিন ভোররাতে কাহারপাড়ায় ঘরবাড়ি পেট্রোল দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। এ ঘটনা বিবৃত করে লিখেছেন,

> সম্মেলনের কাজে ব্যবহারের জন্য আমার মামা একটি পুরোনো জিপ গাড়ি দিয়েছিলেন। ওই জিপে করে ক্ষুব্ধ কল্পনা দত্ত, কল্পতরু সেনগুপ্ত, আমার মামা আহমদ সাগীর চৌধুরীসহ আরো অনেককে নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম।... সেখানে আরো উপস্থিত ছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য, গীতা মুখার্জী, ছাত্র ফেডারেশন নেতা চিরেন সরকার ও চিত্ত বিশ্বাস, পূর্ণেন্দু দস্তিদার, রণধীর দাশগুপ্ত, সেকান্দর হোসেন, কৃষক নেতা আবদুস সাত্তার।

পরদিন জেলাব্যাপী ডাকা হয় হরতাল। মাহবুব উল আলম চৌধুরী এবং কিছু ছাত্রকর্মীকে দায়িত্ব দেয়া হয় রেলওয়ে বিল্ডিং অঞ্চলে পিকেটিং করার। সভায় উত্তেজিতভাবে বক্তৃতা করেন রফিউদ্দিন সিদ্দিকী, আহমদ সাগীর চৌধুরী, কল্পতরু সেনগুপ্ত এবং কল্পনা দত্ত প্রমুখ। সভা শেষে নতুনপাড়া ক্যান্টনমেন্ট থেকে অবিলম্বে পাইওনিয়ার কোরকে প্রত্যাহার করে নিয়ে এবং দোষীদের শাস্তি দেয়ার দাবি জানিয়ে ইংরেজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. স্টুয়ার্টকে স্মারকলিপি দেয়া হয়।[৭১]

সারা ভারত কৃষক সম্মেলন

১৯৪৫ সালের ৫ এপ্রিল থেকে নেত্রকোণায় নাগড়ার মাঠে কয়েক দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় সারা ভারত কৃষক সম্মেলন। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কমরেড মুজাফ্ফর আহমদ,

অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন কমরেড মণি সিংহ। মাহবুব উল আলম চৌধুরী সম্মেলনে যোগদান করেন। চট্টগ্রাম প্রতিনিধি দলে ছিলেন কমরেড আবদুস সাত্তার, কমরেড কল্পতরু সেনগুপ্ত, কৃষক নেতা ধীরেন শীল, কৃষক নেতা নবী, কল্পনা দত্ত ও বঙ্কিম সেন। ভারত থেকে এসেছিলেন পি.সি. যোশী, ভবানী সেন, বঙ্কিম মুখার্জী, কৃষ্ণ বিনোদ রায়, সোমনাথ লাহিড়ী প্রমুখ। সম্মেলনের স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন,

> শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে হাজংদের এক বিরাট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে কাজ করতে দেখেছি। কিশোরগঞ্জ থেকেও পায়ে হেঁটে কৃষকদের এক বিরাট বাহিনী সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে কর্মী বাহিনী এবং নেতারা উপস্থিত হয়েছিলেন সম্মেলনে।.. প্রায় আট দশ ফুট উঁচু শিকল ভাঙা কৃষকের একটি চমৎকার ভাস্কর্য তৈরি করা হয়েছিল।... তেজেন সেনের নেতৃত্বে আমরা চট্টগ্রাম থেকে দশজনের একটি গানের স্কোয়াডও নিয়ে গিয়েছিলাম। তার মধ্যে রমেশ শীল রচিত কয়েকটি গান শ্রোতাদের কাছে খুবই উপভোগ্য হয়েছিল।[৭২]

১৯৪৬ সালের নির্বাচন

ব্রিটিশ সরকারের অধীনে সারা ভারতে শেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথার ভিত্তিতে। ওই নির্বাচনে চট্টগ্রামে কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছিলেন নেলী সেনগুপ্তা আর কমিউনিস্ট প্রার্থী হয়েছিলেন চট্টগ্রাম বিদ্রোহের অগ্নিকন্যা কল্পনা দত্ত। সে সময় জওহরলাল নেহরু দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সহধর্মিনী শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তার পক্ষ হয়ে নির্বাচনী প্রচারণার জন্য চট্টগ্রাম আসেন। তিনি এক সময় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভানেত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন। ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী হিসেবে মাহবুব উল আলম চৌধুরী কল্পনা দত্তের পক্ষে প্রচারণায় নামেন। নির্বাচনে নেলী সেনগুপ্তার কাছে কল্পনা দত্ত অল্প ভোটে হেরে যান।[৭৩] সে-সময়ের কথা লিখেছেন এভাবে,

> চট্টগ্রাম কলেজ হোস্টেলের সামনে প্যারড ময়দানের বিশাল জনসভায় জওহরলাল ভাষণ দিলেন। বললেন, কল্পনা একজন বীর লাড়কি। কিন্তু এই সংকট মুহূর্তে আমাদের নেলী সেনগুপ্তার মতো নেত্রীর প্রয়োজন। সভায় প্রারম্ভে আমার বন্ধু সুচরিত চৌধুরী এবং আরো কয়েকজন মিলে আজাদ-হিন্দ ফৌজের কওমি সঙ্গীত, কদম কদম বাড়ায়ে যা, খুশি কি গীত গায়ে যা; এ জিন্দেগি হায় কওম কী, কওম পে লুটায়ে যা গানটি গেয়েছিলেন।[৭৪]

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তি কমিটি গঠন

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী ১৯৪৭ সালে দেশভাগকে অনিবার্য করে তোলে। ১৯৪৬ সালে উপমহাদেশে বিশেষ করে কলকাতা, নোয়াখালী এবং বিহারে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' উদযাপন উপলক্ষ্যে ১৬ আগস্ট চট্টগ্রামে মুসলিমলীগের উগ্রপন্থীরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে দিতে তৎপর হয়ে

ওঠে। এই দাঙ্গাকে রুখবার জন্য মাহবুব উল আলম চৌধুরীর নেতৃত্বে নজরুলজয়ন্তী উদযাপনের আয়োজন করা হয়। চট্টগ্রামে সাম্প্রদায়িকতার ঢেউ যাতে না ছড়ায় চট্টগ্রাম জেলা জজ শৈবাল গুপ্তকে সভাপতি, আহমদ সাগীর চৌধুরীকে সম্পাদক এবং কল্পতরু সেনগুপ্তকে যুগ্ম সম্পাদক করে চট্টগ্রাম জেলা শান্তি কমিটি গঠিত হয়। এ সম্পর্কে লিখেছেন,

> মনে পড়ে, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের প্রবাদপ্রতিম স্বাধীনতা যোদ্ধাদের নিয়ে আমি এবং ছাত্রলীগের নূরুল ইসলাম চৌধুরী চট্টগ্রামের বিভিন্ন উপদ্রুত এলাকা সফর করি। ইউনিয়ন পর্যায়ে শান্তি কমিটি গঠন করি। চট্টগ্রাম শহরে নজরুলজয়ন্তী উৎসবের মাধ্যমে এই দাঙ্গাকে রুখে দাঁড়াবার উদ্যোগ গ্রহণ করি। দাঙ্গার বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের খ্যাতনামা শিল্পী-সাহিত্যিক, অধ্যাপক এবং উভয় সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের নিয়ে মিছিল সহকারে চট্টগ্রাম শহর প্রদক্ষিণ করি।[৭৫]

চট্টগ্রাম বিদ্রোহের বীরনায়ক সংবর্ধনা

১৯৪৬ সালে চট্টগ্রাম বিদ্রোহের বীর নায়ক অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী, লোকনাথ বল কারামুক্ত হলে তাঁদের সংবর্ধনা প্রদানের উদ্যোগ গৃহীত হয়। এর দায়িত্ব অর্পিত হয় মাহবুব উল আলম চৌধুরীর স্কন্ধে। আহমদ সাগীর চৌধুরীর সহযোগিতায় কমিউনিস্ট পার্টির সার্বিক তত্ত্বাবধানে তিনি এ উদ্যোগকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। এ প্রসঙ্গে লিখেছেন,

> আমি এই সব মুক্ত বীর সেনানীদের নিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে পার্টির সহায়তায় সভা-সমিতিতে তাদের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনে কাজ করি।[৭৬]

মাদারসা গণহত্যা

স্বাধীনতাউত্তরকালে চট্টগ্রামের হাটহাজারী, ফটিকছড়ি– তিনটি থানায় অধিক ফসল ফলানোর উদ্দেশ্যে বন্যা এবং বন্যার আনুষাঙ্গিক দুর্ভোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য লোকেরা কর্মতৎপর হয়ে ওঠে। সরকারের কাছে দাবি জানায় যেন ওই সমস্ত দুর্গত এলাকায় খাল খনন এবং টেক কাটার বন্দোবস্ত করে। তহবিল শূন্যতার অজুহাত দেখিয়ে সরকার এতে সারা না দেয়ায় এই এলাকার জনগণ সরকারি সহযোগিতা পেতে ব্যর্থ হওয়ার পর নিজেরাই খাল খনন এবং টেক কাটার উদ্যোগ গ্রহণ করে। মেখল, কোটালিঘোনা ও গহিরার জনগণ নিজেদের উদ্যোগে তিনটি ছোট খাল খনন করতে সক্ষম হয়। এরপর তারা মাদারসার হালদা নদীর রামদাস টেক (বাঁক) এলাকায় খাল খননের জন্য তৈরি হয়। এটাই ছিল সর্ববৃহৎ বাঁক। প্রস্তাবিত খালের দৈর্ঘ্য প্রায় নদীর গতিপথকে পাঁচ থেকে ছয় মাইল কমিয়ে দেবে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর তিন থানার অধিবাসী যথাক্রমে চিবাতলী, গুমারমর্দন, ধর্মপুর, বক্তপুর, মাদারসা, পরদুয়ারা, গহিরা এবং অন্যান্য গ্রামের বিপুলসংখ্যক মানুষ ওই এলাকায়

রামদাস টেক কাটতে জড়ো হয়। টেক কাটলে কোনো এক জমিদারের ক্ষতি হবে বিধায় সরকার ১৪৪ ধারায় নিষেধাজ্ঞা জারি করে। জনতা নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে খাল খননে এগিয়ে গেলে পুলিশ সমবেত জনতার ওপর গুলিবর্ষণ করে। গুলিতে নিহত হন ১৮ জন কৃষক এবং বুলেটে আহত হয়ে হাসপাতালস্থ হন ২২ জন। এ ঘটনা উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন,

> এই উপলক্ষে কেউ যেন কোনো সমাবেশ এবং মিছিল করতে না পারে তার জন্য সরকার চট্টগ্রাম শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে। আমরা ১৪৪ ধারা অমান্য করে গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে চট্টগ্রাম শহরে বিরাট মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করি। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নাসির উদ্দিন এবং গুলি চালনার আদেশদাতা হারমাদ আলীর ফাঁসির দাবি করি। এটিই ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রথম হত্যাকাণ্ড।[৭৭]

কমিউনিস্ট পার্টির হঠকারী নীতি

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে চট্টগ্রাম শহরে মাহবুব উল আলম চৌধুরীর নেতৃত্বে তিনটি লঙ্গরখানা খোলা হয় এবং কমিউনিস্ট পার্টি-পরিচালিত বেবি হোমেও তিনি নিয়মিত আর্থিক সাহায্য প্রদান করেন। দুর্ভিক্ষের সময় ত্রাণকার্য পরিচালনার সূত্রে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির নিকটবর্তী হন। ১৯৪৮ সালে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে পার্টির নব নির্বাচিত সম্পাদক বি টি রণদীভে যে থিসিস তুলে ধরেন তা হলো– ভারত ও পাকিস্তানের জনগণের প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জিত হয়নি এবং কংগ্রেস-লীগ বিশ্বাসঘাতকতা দরুন ভারত ও পাকিস্তানে স্থাপিত হয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশ। দেশের জনগণের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য পার্টির সর্বস্তরে শ্রমিক নেতৃত্ব কায়েমের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনের পর জনগণ এই স্লোগান শুনতে প্রস্তুত ছিল না। মাহবুব উল আলম চৌধুরী লিখেছেন,

> পার্টির এই ভ্রান্তনীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা রাজপথে স্লোগান দিলাম– 'ইয়ে আজাদী জুটা হ্যায়, লাখো ইনসান ভুখা হ্যায়– ভুলো মাৎ ভুলো মাৎ'। আমাদের লাঠিপেটা করার জন্য পুলিশের প্রয়োজন হলো না। জনগণই আমাদের শায়েস্তা করলো। ...এভাবে হাজার হাজার পার্টি কর্মী ভারতে ও পাকিস্তানে নিগৃহীত হয়েছে, জেলে গিয়েছে বহু নেতাকর্মী, আত্মগোপনে চলে যেতে হয়েছে পার্টির শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে।[৭৮]

ফলে কমিউনিস্ট পার্টি গণবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং পি সি যোশীর আমলে চল্লিশের দশকে যে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের তরঙ্গ সৃষ্টি হয় তা নিস্তেজ হয়ে পড়ে। এ সময় পূর্ববাংলার কিছু এলাকায় সশস্ত্র কৃষক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মুক্ত এলাকা সৃষ্টির ব্যর্থ প্রচেষ্টা চলে।

বিশ্বশান্তি আন্দোলন

১৯৫০ সালে বিশ্বব্যাপী চলছিল বিশ্বশান্তি আন্দোলন। দুটি মহাযুদ্ধে উগ্র সমরাস্ত্রের ব্যবহারে মানবসভ্যতার অমূল্য সব সম্পদ ধ্বংস হয়েছে। মানবসভ্যতাকে টিকিয়ে

রাখতে প্রয়োজন শান্তির। বিশ্বশান্তি আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে ভারতবর্ষে। মাহবুব উল আলম চৌধুরী কলকাতায় অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি সম্মেলনে যোগদান করেন এবং অনুপ্রাণিত হয়ে চট্টগ্রামে বিশ্বশান্তি পরিষদ গঠন করেন। এ সম্পর্কে লিখেছেন,

> সীমান্তের উদ্যোগে আমাকে সাধারণ সম্পাদক এবং আবদুল হক দোভাষকে সভাপতি করে ১০১ জনের একটি বিশ্বশান্তি কমিটি গঠিত হয়।... আমরা জে এম সেন হল প্রাঙ্গণে যুদ্ধবিরোধী এবং শান্তির সপক্ষে একটি সম্মেলন আহ্বান করি। এতে সলিল চৌধুরী রচিত এবং চট্টগ্রামের বিশিষ্ট গীতিকার চিরঞ্জীব দাশ শর্মার গান অবলম্বনে একটি গীতিনাট্য পরিবেশন করা হয়। রাতে রমেশ শীল এবং ফণী বড়ুয়ার যুদ্ধ এবং শান্তি নিয়ে কবিগান অনুষ্ঠিত হয়। হাজার হাজার লোক এই সম্মেলনে যোগদান করেন। ইতোমধ্যে আমরা আণবিক বোমা নিষিদ্ধকরণের দাবিতে চট্টগ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্বাক্ষরসম্বলিত একটি ইস্তেহার বের করি। ইস্তেহারের শিরোনাম ছিল– বিশ্বশান্তির ডাকে স্বাক্ষর দিন।[৭৯]

চট্টগ্রাম থেকে তাঁরা আণবিক বোমা নিষিদ্ধকরণের দাবিতে সাত লাখ স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন। এই সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৫৩ সালে স্টকহোমে অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি সম্মেলনে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু পাকিস্তান সরকার তাঁর পাসপোর্ট জব্দ করার কারণে সম্মেলনে যোগদান করতে পারেননি।[৮০]

মূলনীতি বিরোধী আন্দোলন

১৯৫০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর মুসলিম লীগ সরকার ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার ভিত্তি হিসেবে 'মূলনীতি' কমিটি সুপারিশমালা প্রকাশ করলে পূর্ব পাকিস্তানের সচেতন রাজনৈতিক অংশ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কারণ এই রিপোর্টে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন ও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবিকে উপেক্ষা করা হয়েছিল। মূলনীতি কমিটির রিপোর্টের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের জন্য সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন শেখ রফিউদ্দিন সিদ্দিকী এবং যুগ্ম আহ্বায়ক মাহবুব উল আলম চৌধুরী এবং রেলওয়ে এমপ্লীয়জ লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল হক। সংগ্রাম কমিটির আহ্বানে লালদীঘি ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় মূলনীতি কমিটির সুপারিশ বাতিলের দাবি জানিয়ে বিশাল মিছিলসহকারে চট্টগ্রামের গণপরিষদ সদস্য এ কে খান এবং নূর আহমদ চেয়ারম্যানের বাড়ি ঘেরাও করা হয়।

ঢাকায়ও মূলনীতি বিরোধী সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এই সংগ্রাম পরিষদ ঢাকার বার লাইব্রেরি হলে ১৯৫০ সালের ৪ ও ৫ নভেম্বর মহা জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করে। সেখানে দুইদিনব্যাপী অধিবেশনে একটি বিকল্প মূলনীতি রচনা করা হয়। সম্মেলনে চট্টগ্রামের প্রতিনিধি হিসেবে মাহবুব উল আলম চৌধুরীর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন কৃষ্ণগোপাল সেন ও দেবপ্রিয় বড়ুয়া।[৮১]

সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলন ও শান্তি সম্মেলন

১৯৫০ সালে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের উগ্র সাম্প্রদায়িক বক্তৃতা, পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের সরকারি কর্তৃপক্ষ ও গণমাধ্যমের সাম্প্রদায়িক প্রচারণার ফলে পূর্ববাংলার মুসলিম লীগ

সরকার ও আমলাতন্ত্র পূর্ববাংলায় দাঙ্গা সৃষ্টির সুযোগ পায়। ১৪ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামে দাঙ্গা শুরু হয়ে পর দিন পর্যন্ত চলে।[৮২] পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলে এর বিস্তৃতি ঘটে। দাঙ্গা বাঁধার সাথে সাথেই ঢাকাসহ পূর্ববাংলার সর্বত্র শান্তি আন্দোলন শুরু হয়। দাঙ্গা রুখার জন্য মাহবুব উল আলম চৌধুরীর নেতৃত্বে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। 'সীমান্ত' অফিসে এক সভায় রফিউদ্দিন সিদ্দিকীকে সভাপতি এবং মাহবুব উল আলম চৌধুরীকে সম্পাদক করে শান্তি সম্মেলন নামে দাঙ্গাবিরোধী সংস্থা গঠিত হয়। সাতটি শরীর চর্চা ক্লাবের সদস্যদের নিয়ে গঠন করেন শান্তিফৌজ। কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ট্রেড ইউনিয়নের শ্রমিকদের নির্দেশ দেয়া হয় শান্তিফৌজে যোগ দিতে। এ প্রেক্ষাপট উল্লেখ করে মাহবুব উল আলম চৌধুরী লিখেছেন,

> প্রথমে আমরা জে এম সেন হল প্রাঙ্গণে এবং জুবিলী সিনেমায় দু'টি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মিলিত হই। সেখান থেকে মিছিল করে শহর প্রদক্ষিণ করি। শান্তি ফৌজের ইউনিফর্ম পরিহিত যুবকেরা ব্যান্ড বাজিয়ে মিছিলের অগ্রভাগে থেকে মিছিল পরিচালনা করেন। মিছিলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার নেতাকর্মী, শিক্ষাবিদ, ছাত্র, আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী-সাহিত্যিক যোগ দেয়ায় সংখ্যালঘুদের মনে আস্থার ভাব সৃষ্টি হয়।... শান্তি ফৌজের সৈনিকেরা মহল্লায় মহল্লায় শান্তির বাণী প্রচার করে, যাতে দুস্কৃতকারীদের মনে ভয় এবং সংখ্যালঘুদের মনে আশা ও বিশ্বাসের সঞ্চার হয় তার জন্য পাড়ায় পাড়ায় পাহারার ব্যবস্থা করি।[৮৩]

মাহবুব উল আলম চৌধুরী সম্পাদিত 'সীমান্ত'র দাঙ্গাবিরোধী সংখ্যা সে-সময় কলকাতায় খুবই প্রশংসিত হয়। চিত্ত প্রসাদ এই সংবাদ জানার পর মাহবুব উল আলম চৌধুরীকে কলকাতায় আমন্ত্রণ করে নিয়ে বিভিন্ন উপদ্রুত এলাকায় বক্তৃতা করান।[৮৪]

মোহাজের পুনর্বাসন সংসদ

দেশভাগের প্রেক্ষাপটে পূর্ববাংলার যারা আশ্রয় নেয়, তাদের অধিকাংশই ছিল অবাঙালি। তাদের বলা হতো মোহাজের। এই অবাঙালিদের মধ্যে যারা বিত্তশালী এবং অভিজাত—সরকার তাদের পুনর্বাসিত করার জন্য উদ্যোগ নিলেও গরিব শ্রমিক মোহাজেরদের জন্য তেমন কিছু করেনি। তারা ফুটপাতে, রেল স্টেশনে এবং উন্মুক্ত মাঠে সর্বহারা হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করে এবং মাঝে মাঝে দাঙ্গার জন্য উৎসাহিত হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় দরিদ্র মোহাজেরদের পুনর্বাসিত করার জন্য মাহবুব উল আলম চৌধুরীর নেতৃত্বে আন্দোলনের সূচনা হয়। গঠন করেন মোহাজের পুনর্বাসন সংসদ। মহাজের ও স্থানীয় জনগণকে নিয়ে মিছিল ও সমাবেশ করেন।

পুনর্রাসন সংসদের পক্ষ থেকে স্থানীয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও বিভাগীয় কমিশনারের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেন। ইতোমধ্যে সংসদের উদ্যোগে সিভিল সার্জনের পাহাড় ও চট্টগ্রাম কোর্ট বিল্ডিংয়ের চারদিকে অস্থায়ী বাসস্থান নির্মিত হয়। এই কাজে স্থানীয় জনগণ মুক্তহস্তে দান করেন। পরে সরকার ফৌজদার হাট, পাহাড়তলী এবং হালিশহরে ছোট ছোট বহুতল গৃহ নির্মাণ করে মোহাজেরদের পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ করে।[৮৫]

ইলা মিত্রের জবানবন্দী সংবলিত ইস্তেহার বিলি

রাজশাহীর নাচোলে সরকারের ইন্ধনে পুলিশ কর্তৃক ইলা মিত্রের লাঞ্ছিত হওয়ার একমাস পর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান চট্টগ্রামে আসেন। ইলা মিত্রের জবানবন্দি সম্বলিত ইস্তেহারটি ঢাকায় কমিউনিস্ট পার্টির গোপন কেন্দ্রের সাইকোস্টাইল মেশিনে ছাপা হলে, আত্মগোপন অবস্থায় কমরেড কল্পতরু সেনগুপ্ত দু'টি কপি চট্টগ্রাম নিয়ে আসেন। পার্টি সমর্থক গোপনে এই ইস্তেহারের পাঁচ হাজার কপি ছাপিয়ে বের করেন। লিয়াকত আলীর প্যারেড গ্রাউন্ডের জনসভায় এটি বিলির দায়িত্ব পড়ে মাহবুব উল আলম চৌধুরী ও তাঁর বন্ধুদের ওপর। তিনি লিখেছেন,

> পার্টি থেকে আমাকে বলা হয়েছিল যে, ধর্মান্ধ জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হলে সভায় আমাদের চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই সতর্কতা বাণী সত্ত্বেও সেদিন যে ইস্তেহারটি বিলি করতে পেরেছিলাম, তার জন্য প্রভূত গৌরব অনুভব করি। চট্টগ্রামে বিলি করা ইস্তেহারের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক প্রেস এই ঘটনা এবং ইস্তে হারের বয়ান দেশে-বিদেশে প্রচার করে। এই ইস্তেহারের মাধমেই ইলা মিত্রের ওপর পাশবিক অত্যাচারের ঘটনা ভারতে এবং পৃথিবীর নানা স্থানের মানুষ জানতে পারে।[৮৬]

পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ

১৯৫১ সালে অরাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে দেশের প্রথম অসাম্প্রদায়িক সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ। মাহমুদ আলী সভাপতি, অলি আহাদ সাধারণ সম্পাদক। মাহবুব উল আলম চৌধুরী যুক্ত হন যুবলীগ চট্টগ্রাম শাখার সঙ্গে। যুবলীগ চট্টগ্রাম শাখার জন্ম এবং একে সংগঠিত ও বিকশিত করতে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন মাহবুব উল আলম চৌধুরী তাদের অন্যতম। ১৯৫৫ সালে মাহবুব উল আলম চৌধুরীকে সভাপতি, সামসুল আলমকে সম্পাদক করে চট্টগ্রাম যুবলীগের শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটি যুবলীগকে গ্রাম পর্যায়ে ছড়িয়ে দেয় এবং শহর ও গ্রামের প্রায় সকল ক্লাব, পাঠাগার সমিতি ইত্যাদির সাথে যোগাযোগ সাধন করে ব্যাপক যুব আন্দোলন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালায়।[৮৮]

ভাষা আন্দোলন

ভাষা আন্দোলনের প্রয়োজনে পূর্বগঠিত মূলনীতি বিরোধী সংগ্রাম কমিটিকে পরিবর্ধিত করে ১৯৫২র ৪ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম জেলা সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন মাহবুব উল আলম চৌধুরী, যুগ্ম আহ্বায়ক চৌধুরী হারুনুর রশীদ ও এম এ আজিজ। সকল শ্রেণীর পেশাজীবী সংগঠন, কৃষক, শ্রমিক, সংগঠন কমিটির অন্তর্ভুক্ত হয়। একুশে ফেব্রুয়ারির প্রস্তুতি পর্বে ১৯ ফেব্রুয়ারি তিনি জলবসন্তে আক্রান্ত হন। একুশের সেই উত্তাল দিনে ঢাকার রক্তপাতের খবর চট্টগ্রামে পৌছার পর রোগশয্যায় মাহবুব উল আলম চৌধুরী রচনা করেন 'কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে

এসেছি'। ২৩ ফেব্রুয়ারির জনসভায় চৌধুরী হারুনুর রশীদ কবিতাটি পাঠ করে শোনান। অমর একুশের ওপর এটিই প্রথম কবিতা। এ বিষয়ে পরবর্তী পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

গণতন্ত্রী দল গঠন

১৯৫২ সালের ৩১ ডিসেম্বর ঢাকায় হাজী মোহাম্মদ দানেশকে সভাপতি এবং সিলেটের সাপ্তাহিক 'নওবেলাল' পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদ আলীকে সাধারণ সম্পাদক করে অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী 'পাকিস্তান গণতন্ত্রী' দল গঠিত হয়।

মাহবুব উল আলম চৌধুরী চট্টগ্রামের প্রতিনিধি হিসেবে গণতন্ত্রী দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। যখন জেলা কমিটি গঠিত হয় তখন তিনি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন, সভাপতি নির্বাচিত হন বদিউস সালাম। সহ-সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক মফিজুল ইসলাম এবং শঙ্খমিত্র মুৎসুদ্দি।

কমিউনিস্ট পার্টি আইনত নিষিদ্ধ না হলেও সরকারের নির্যাতনের কারণে প্রকাশ্যে কোনো রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। এক পর্যায়ে পার্টি স্থির করে গণতন্ত্রী দলকে শক্তিশালী না করে, গণতন্ত্রী দলের কর্মীদের আওয়ামীলীগে অনুপ্রবেশ করানোই অধিকতর বাঞ্ছনীয়। পার্টির এই কৌশল নিয়ে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়। মাহবুব উল আলম চৌধুরী গণতন্ত্রী দলকে বিলুপ্ত করার বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন।[৮৯]

যুক্তফ্রন্টের নিবার্চন

১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে গঠিত হয় নির্বাচনী মোর্চা যুক্তফ্রন্ট। মাহবুব উল আলম চৌধুরী চট্টগ্রাম যুক্তফ্রন্ট কর্মী শিবিরের আহ্বায়ক হিসেবে নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[৯০] নির্বাচনে গণতন্ত্রী দলের জন্য বরাদ্ধকৃত ১৬টি আসনের মধ্যে পার্লামেন্টারি বোর্ড চট্টগ্রামের জন্য একটি আসন নির্ধারণ করেন। প্রার্থী মনোনয়নের দায়িত্ব পড়ে চট্টগ্রাম জেলা কমিটির ওপর। বিভিন্ন সময়ে ছাত্র সম্মেলন ও নানা ইস্যুতে মিটিং-মিছিল এবং আন্দোলনে যুক্ত হয়ে মীরেরসরাইকে বামপন্থীদের ঘাঁটি করে তোলা হয়। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় মফিজুল ইসলামকে ওই কেন্দ্র থেকে দাঁড় করানো হবে। কিন্তু তিনি নিজ এলাকা কুমিল্লার বুড়িচং আসনে নির্বাচনে ইচ্ছুক বলে জেলা কমিটির সুপারিশে মাহবুব উল আলম চৌধুরীকে কেন্দ্রীয় কমিটি মনোনয়ন দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মীরেরসরাইয়ের কর্মীরা কোমর বেঁধে তাঁর পক্ষে প্রচারণা শুরু করে। কিন্তু সার্বিক বিবেচনায় তিনি কর্মীদের কঠিন প্রতিবাদের মুখে মাহফুজুল হকের পক্ষে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেন। মাহফুজুল হক জয়ীও হলেন।[৯১] এই সিদ্ধান্তের ফলে মীরেরসরাইয়ের কর্মীরা ক্ষুদ্ধ হয়েছিল। তিনি কর্মীদের সঙ্গে বহুবার বৈঠক করে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের বাস্তব কারণ তুলে ধরেন।[৯২]

সুয়েজ খাল জাতীয়করণ

১৯৫৬ সালে মিসরের বিপ্লবী নেতা আবু নাসের জামাল সুয়েজখাল জাতীয়করণ করে। ব্রিটিশ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এই জাতীয়করণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে যুদ্ধের হুমকি দেয়। এ সময় বিশ্ববিবেক নাসেরের সমর্থনে আন্দোলন শুরু করে। সোভিয়েত নেতা ক্রুশচেভের কঠোর হুমকির মুখে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হাত গুটিয়ে নেয়। তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দী। পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির নায়ক। তিনি সাম্রাজ্যবাদের পক্ষাবলম্বন করে এ আন্দোলনে শরিক না হওয়ার জন্য আওয়ামী লীগকে সতর্ক করেন। এ প্রেক্ষাপটে মাহবুব উল আলম চৌধুরীর নেতৃত্বে চট্টগ্রামে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিরাট মিছিল সমাবেশের আয়োজন হয়। তারা লালদীঘি ময়দানে সমবেত হয়ে কর্নেল নাসেরের স্বপক্ষে জনসভা করেন। স্মারকলিপি দিতে চাইলে পুলিশ তাদের বাধা দেয়। ফলে পুলিশের সঙ্গে তাদের খণ্ডযুদ্ধ হয়।[৯৩]

ভাষা আন্দোলনে ভূমিকা

পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ভূমিকা, সাময়িকপত্র সম্পাদনা, প্রগতিশীল রাজনীতি, সাহিত্যসাধনা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কর্ম সম্পন্ন করলেও মাহবুব উল আলম চৌধুরী একুশের কবি হিসেবেই খ্যাতির চূড়ায় দীপ্তমান। পরবর্তীকালে সাধারণ্যে এটিই হয়ে ওঠে তাঁর প্রধান পরিচয়। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম-পরিষদের আহ্বায়ক হিসেবে তাঁর সেই কাব্যভূমিকার রয়েছে রাজনৈতিক ভিত্তি। ১৯৪৮-১৯৫২ পর্যন্ত রাজনৈতিক ভূমিকার মধ্যে তার অবদানের স্বরূপ অন্বেষণ করা যায়।

এ প্রসঙ্গে ভাষা আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জি বর্ণনা প্রয়োজন।

১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। অধিবেশনে ২৫ ফেব্রুয়ারি পূর্ব বাঙলার সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু ও ইংরেজির সঙ্গে বাংলাকেও গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে ব্যবহার করার দাবী জানিয়ে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করলে তুমুল বিতর্কের পর তা বাতিল হয়ে যায়। এ সংবাদ ঢাকায় প্রকাশিত হওয়া মাত্র ছাত্র, রাজনীতিক ও শিক্ষিত মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকার ছাত্র সম্প্রদায় ধর্মঘট পালন করেন। ২ মার্চ 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়- এর আহবায়ক মনোনীত হন শামসুল আলম। গণপরিষদের সরকারি ভাষার তালিকা থেকে বাংলাভাষাকে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে ১১ মার্চ সমগ্র পূর্ব বাঙলায় সাধারণ ধর্মঘটের আহবান জানিয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। পূর্ব বাঙলার প্রায় সর্বত্র ঐদিন ছাত্ররা পূর্ণ ধর্মঘট পালন করে। ১১ মার্চের পুলিশি জুলুমের প্রতিবাদে ১৫ মার্চ পর্যন্ত ধর্মঘট অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কারণ ঐ দিনটি ছিল পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক সভার প্রথম অধিবেশন। ১৪ মার্চ পূর্ব বাংলার সর্বত্র বিপুল উদ্দীপনার সঙ্গে ধর্মঘট পালিত হয়। ১৫ মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কয়েকজন সদস্য বর্ধমান হাউসে প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীনের সাথে আলোচনায় মিলিত হন এবং নাজিমুদ্দীন তাদের সবকটি দাবী মেনে নিতে বাধ্য হন। আন্দোলন অব্যাহত রাখার জন্যে ১৬ মার্চ পুনরায় সাধারণ ধর্মঘটের আহবান জানানো হয়। ঐ দিন ব্যবস্থাপক অধিবেশন

চলাকালে পরিষদ ভবনের সামনে সন্ধ্যা পর্যন্ত ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এক সময় উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় ও পুলিশ ছাত্রদের উপর লাঠিচার্জ করে। সংগ্রাম পরিষদের এক বৈঠকে পুলিশি জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ১৭ মার্চ ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ ঢাকার নাগরিকবৃন্দ রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট ও পাকিস্তান মুসলিমলীগের সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। জিন্নাহ তাঁর বক্তৃতায় ভাষার প্রশ্ন এবং ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেন। তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতার একটি বাক্যই এখানে উল্লেখ যথেষ্ট- 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু'। ২৪ মার্চ কার্জন হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে জিন্নাহ রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যের পুনরুক্তি করেন। উভয় সভায় জিন্নাহর 'উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে' ঘোষণামাত্র কিছু সংখ্যক ছাত্র 'না, না' ধ্বনিতে প্রতিবাদ করে।

১৯৪৯ থেকে শুরু করে প্রতি বৎসর ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা দিবস হিসেবে উদযাপিত হলেও ভাষা-আন্দোলনের ক্ষেত্রে অন্য কোন তৎপরতা ১৯৫১ সাল পর্যন্ত তেমন দেখা যায়নি।

১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন পল্টন ময়দানে পূর্ব বাঙলার প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বলেন, কায়েদে আজম ঘোষিত উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। নাজিমুদ্দীনের বক্তৃতা বেতারযোগে সরাসরি প্রচারিত হওয়ায় তা সমগ্র প্রদেশে ভয়ানক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ২৯ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি প্রতিবাদ সভার মাধ্যমে বিক্ষোভের সূচনা করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির আহবানে ৪ ফেব্রুয়ারি প্রদেশের সর্বত্র ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৩১ জানুয়ারি ঢাকা বার লাইব্রেরিতে আওয়ামী মুসলিমলীগের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে গঠিত হয় 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি'। এই কমিটির আহবায়ক নির্বাচিত হন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি কাজী গোলাম মাহবুব। ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের সভায় সভাপতিত্ব করেন গাজীউল হক। হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'আরবি হরফে বাংলা চলবে না' ইত্যাদি ধ্বনি সহকারে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে বের হয়ে আসে। ঐদিন বিকেলেই সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির একটি সভায় একুশে ফেব্রুয়ারি প্রদেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট আহবানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ পর্যায়ে ২০ ফেব্রুয়ারি বিকালে ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়।

একুশে ফেব্রুয়ারি গাজীউল হকের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ছাত্রদের সভা শুরু হয়। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হবে কি হবে না এ নিয়ে বাদানুবাদ চলে। পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার পক্ষে- শেষ পর্যন্ত তাই হলো। ছাত্ররা বেলা বারটার দিকে এক এক দলে দশজন করে বিশ্ববিদ্যালয় গেট থেকে বের হয়ে মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের দিকে অগ্রসর হয়। তখন ছাত্র ও পুলিশের

মধ্যে ইট-পাটকেল ছোঁড়াছুড়ি হয় এবং পুলিশ ছাত্রদের দিকে কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অধিবেশন শুরু হওয়ার সময় ব্যবস্থাপক পরিষদ ভবনের দিকে (বর্তমান জগন্নাথ হল) ছাত্ররা অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে, লাঠি চার্জ করে ও ইট-পাটকেল ছুঁড়ে। বেলা প্রায় তিনটার দিকে পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। পুলিশ ছাত্রজনতার উপর দুইবার গুলিবর্ষণ করে। শহীদ হন সালাহুদ্দীন, আবদুল জব্বার, আবুল বরকত, রফিকউদ্দিন আহমদ। সেদিন সন্ধ্যার পর রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্র থেকে পুলিশের গুলি বর্ষণ ও ছাত্র হত্যার সংবাদ প্রচারিত হয়। প্রতিবাদের ঝড় ওঠে দিকে দিকে।

ভাষা আন্দোলনের সূচনাপর্বে পূর্ববাংলার আর্থসামাজিক পরিস্থিতি ছিল খুবই নাজুক। যে স্বপ্ন নিয়ে জনগণ পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রত্যাশা করেছিল তা বাস্তব পরিস্থিতির ছিল একেবারেই বিপরীত। এজন্য জনগণের মধ্যে বিক্ষুদ্ধতা বাড়তে থাকে। মধ্যবিত্তের বিকাশ যখন সংকটের মুখোমুখি হয় তখন বাস্তবিকই সে আন্দোলন হয়ে ওঠে জোরদার। প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৭ সাল থেকেই অর্থাৎ পাকিস্তান রাষ্ট্র কায়েম হওয়ার পর থেকেই, পূর্ব বাঙলার সর্বত্র খাদ্যসংকট দেখা দেয় এবং ব্যাপক এলাকায় ১৯৪৯ সালের শেষ পর্যন্ত এবং পুনরায় ১৯৫১ সালে তা দুর্ভিক্ষের আকার পরিগ্রহ করে। কৃষক জনগণ দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী, খাজনার নির্যাতন ইত্যাদিতে জর্জরিত হতে থাকেন। সরকারি খাদ্য-নীতির ফলে কর্ডন ও লেভির অত্যাচারও দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। বস্ত্র, কেরোসিন, ভোজ্য তেল ইত্যাদির দুস্প্রাপ্যতা ও মূল্যবৃদ্ধি জনগণের সামগ্রিক অর্থনৈতিক জীবনকে চারদিক থেকে বিপর্যস্ত করে তোলে।[৯৫]

১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের সূচনাপর্বে চট্টগ্রামে মাহবুব উল আলম চৌধুরী আন্দোলনের সূচনা করেন। ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের শুরুতে চট্টগ্রাম জে এম সেন হলে প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিলেন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। কিন্তু মুসলিম লীগের গুন্ডারা এই সভা পণ্ড করে দেয়। প্রচারকার্য চালাবার সময় মাহবুব উল আলম চৌধুরী ও শহীদ সাবের গুন্ডাদের হাতে প্রহৃত হন। তারা মাইক কেড়ে নিয়ে যায়। সাহিত্যবিশারদ এত বেশি ক্ষুদ্ধ হয়েছিলেন যে, তাদের প্রতিটি সভা-সম্মেলনে উপস্থিত থেকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবির প্রতি দৃঢ়তার সঙ্গে কথা বলতেন, বাঙালির ঐতিহ্য সম্পর্কে সবাইকে সতর্ক করতেন।[৯৬]

১৯৪৯ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ছিল তুঙ্গে। রাষ্ট্রীয় প্রচারযন্ত্র, সরকারি কর্তাব্যক্তিরা সুযোগ পেলেই বাংলাভাষার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাতো। এমতাবস্থায় ১৯৪৯ সালে পূর্ব বাংলার গভর্নর, কলকাতা কর্পোরেশনের এক সময়ের মেয়র, স্যার আবদুর রহমান সিদ্দিকী চট্টগ্রাম কলেজ পরিদর্শনে আসেন। কলেজ মিলনায়তনে ছাত্রদের উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে কটূক্তি করেন এবং আরবি অক্ষরে বাংলা লেখার পক্ষে ওকালতি করেন। মাহবুব উল আলম চৌধুরী তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং কিছু সংখ্যক ছাত্রদের নিয়ে হল থেকে বেরিয়ে আসেন। অধ্যক্ষ আবু হেনা তাঁকে ওই ব্যাপারে ক্ষমা চাওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি সবিনয়ে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এভাবে তাঁর ছাত্রজীবনের অবসান ঘটে। ১৯৪৮-

৫১ সাল পর্যন্ত প্রথমে সংস্কৃতি বৈঠক ও পরে যুবলীগের ব্যানারে প্রতিবছর তাঁরা উৎসাহের সঙ্গে ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা দিবস হিসেবে পালন করেন।[৯৭]

১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নাজিমউদ্দিন ঢাকায় দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করলেন; 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।' তখন থেকে ঢাকায় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাথে যোগাযোগ রেখে চট্টগ্রামে সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ইতোপূর্বে গঠিত মূলনীতি বিরোধী সংগ্রাম কমিটিই ছিল চট্টগ্রামে ভাষা আন্দোলনসহ সকল কর্মকাণ্ডের চালিকাশক্তি। কিন্তু আন্দোলনের প্রয়োজনে ১৯৪৮ সালে গঠিত মূলনীতি বিরোধী সংগ্রাম কমিটিকে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করে 'চট্টগ্রাম জেলা সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়। ১৯৫২-এর ৪ ফেব্রুয়ারি আন্দরকিল্লাস্থ তৎকালীন আওয়ামী মুসলিম লীগ অফিসে এই পরিষদ গঠিত হয়। কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন মাহবুব উল আলম চৌধুরী এবং যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন চৌধুরী হারুনুর রশিদ ও এম এ আজিজ। সকল শ্রেণীর পেশাজীবী সংগঠন, কৃষক, শ্রমিক সংগঠন, আওয়ামী মুসলিম লীগ ও তমদ্দুন মজলিসের প্রতিনিধিদের এই কমিটির অন্তর্ভূক্ত করা হয়। সংগ্রাম পরিষদে নেতৃস্থানীয় ছিলেন জহুর আহমদ চৌধুরী, মোজাফফর আহমদ, ডা. আনোয়ার হোসেন (শিল্পপতি), আজিজুর রহমান, চৌধুরী হারুনুর রশিদ, আজিজুর রহমান (তমদ্দুন মজলিস নেতা), মুসলেম উদ্দিন, নুরুজ্জামান, কৃষ্ণগোপাল সেন, শামসুদ্দিন আহমদ, মফিজুল ইসলাম, রুহুল আমিন নিজামী, সুধাংশু ভট্টাচার্য, মনীন্দ্র মহাজন, সুনীল মহাজন, এমদাদুল ইসলাম, আবু জাফর, ডা. সাইদুর রহমান, ডা. সরোজ দে, ডা. নুরুল আজিম, আমির হোসেন দোভাষ, এজহারুল হক প্রমুখ।[৯৮] একুশের পূর্বমুহূর্তের স্মৃতিচারণ করে মাহবুব উল আলম চৌধুরী লিখেছেন,

> চট্টগ্রামে একুশে ফেব্রুয়ারি পালনের জন্য আমি, চৌধুরী হারুনুর রশীদ, আজিজুর রহমানসহ অনেকে বিভিন্ন এলাকায় সভা-সমাবেশ করি। ২০ ফেব্রুয়ারি বিভিন্ন এলাকায় সভা-সমাবেশ করে যখন অফিসে আসলাম তখন আমার ১০৪ ডিগ্রি জ্বর এবং গায়ে জলবসন্ত। সারাদিনই আমি জ্বর এবং জলবসন্ত নিয়ে কাজ করেছি। কাজের উত্তেজনায় আমি এসব কিছু অনুভব করতে পারিনি। অসুস্থতার কারণে আমাকে আমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। আমি যেহেতু ছাত্র ফেডারেশনের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম সে কারণে ছাত্র ফেডারেশনের একজন কর্মীকে আমার সঙ্গে দেয়া হয় কমিটির সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষার জন্য। একুশে ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামে আসেন সর্বদলীয় ভাষা সংগ্রাম পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির একজন প্রভাবশালী সদস্য খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস। তিনি একজন বড় সাংবাদিক। তিনি একুশে ফেব্রুয়ারি বিকেল ৩টার দিকে ঢাকায় যোগাযোগ করে জানতে পারেন ছাত্র-জনতার মিছিলের ওপর গুলি চলেছে এবং এতে অসংখ্য লোক মারা গেছে। কত লোক মারা গেছে তাও কেউ জানে না এবং তখনো বরকত-সালামের নাম চট্টগ্রামে আসেনি। খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াসের কাছ থেকে এ খবর জানার পর সবাই ফুঁসে উঠল। আমি বাড়িতে অসুস্থ অবস্থায় যখন ঢাকায় গুলির খবর শুনলাম, তখন 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি' কবিতাটি শ্রুতলিখনের মাধ্যমে লিখে ফেললাম।

সন্ধ্যায় খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন এবং আমার এই দীর্ঘ কবিতাটি পড়েন। তিনি বলেন, এটি অসাধারণ একটি কবিতা। এটি ছাপিয়ে ২৩ তারিখের জনসভায় বিলি করতে হবে এবং আবৃত্তি করে শোনাতে হবে।[৯৯]

পরের ঘটনাবলি নিম্নরূপ,

কবিতাটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশের সমস্ত দায়িত্ব ন্যস্ত হয় খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস ও 'উদয়ন' পত্রিকার সম্পাদক রুহুল আমিন নিজামীর ওপর। তারা আন্দরকিলাস্থ কোহিনূর ইলেকট্রিক প্রেসে কবিতাটি ছাপাবার ব্যবস্থা করেন। এই পুস্তিকার মুদ্রাকর হিসেবে নাম ছিল দবির আহমদ চৌধুরী এবং প্রকাশক হিসেবে নাম থাকে পাথরঘাটা অঞ্চলের পৌর কমিশনার নির্বাচনের প্রার্থী কামাল উদ্দিন আহমদ খানের। আর দাম ছিল দু'আনা।

রাতের শেষ প্রহরে কবিতার কম্পোজ ও প্রুফের কাজ প্রায় শেষ। গেলি বাঁধা হয়ে গেছে। ফর্মা তোলার আগে মেশিন পরিষ্কারের কাজ চলছে। ফাল্গুনের ঝিরঝিরে বাতাসে ছিল শেষ শীতের আমেজ, তাই দরজা জানালা টাইট করে বন্ধ করে তখন সবাই চা খাচ্ছে। এমন সময় দরজায় টোকা মারার শব্দ, সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ দরজা খুলুন। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলেন পুলিশ প্রেসটিকে ঘিরে ফেলেছে। করিৎকর্মা প্রেসের লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের ওপর রাখা কবিতার প্রুফ কপি এবং মেটারসহ খোন্দকার ইলিয়াসকে দোতলায় নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখলেন। পুলিশ বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন এসপি আলমগীর কবির, প্রখ্যাত সাহিত্যিক হুমায়ুন কবিরের ভাই। সদলবলে তিনি তন্ন তন্ন করে সমগ্র প্রেস ঘুরে ঘুরে দেখলেন। ব্যাপক খানাতল্লাশির পর পুলিশ যখন খালি হাতে ফিরে যায়, শ্রমিক-কর্মচারী শুরু করেন তাদের অসমাপ্ত কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে। দুপুরের মধ্যে মুদ্রিত ও বাঁধাই হয়ে প্রকাশিত হয় পুস্তিকাটির প্রায় দশ হাজার কপি বিক্রয় ও বিতরণের জন্য।[১০০]

খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াসের জবানিতে শুনি পরের ঘটনা,

পরের দিন ২২ ফেব্রুয়ারি, (প্রকৃতপক্ষে ২৩ ফেব্রুয়ারি) বিকাল ৩ ঘটিকা। অপরাহ্নে লালদীঘি ময়দানের জনসমুদ্রের সভাপতির আসন অলংকৃত করলেন চট্টগ্রামের মুসলিম লীগ নেতা জনাব রফিউদ্দিন সিদ্দিকী। তাঁর পাশে উপবিষ্ট ছিলেন জনাব আবদুল হক দোভাষ ও জনাব নূর আহমদ এমসিএ। সভায় যোগ দিলেন অগণিত জনগণের সঙ্গে জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী এবং তদানীন্তন পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য শিল্পপতি এ কে খানও। এই দুই নেতার মধ্যে বিরোধ ছিল। ফজলুল কাদের চৌধুরী তার বিপুল সংখ্যক কর্মী দ্বারা মঞ্চের চারদিক ঘিরে রাখেন। তাদের কাজ ছিল জিন্দাবাদ ধ্বনি দেওয়া এবং বিপক্ষ দলকে টিটকারি মারা ও হেয় প্রতিপন্ন করা। সভার কর্মসূচির এক পর্যায়ে ছিল মাহবুব উল আলম চৌধুরীর রচিত 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি' পাঠ। পাঠের দায়িত্বটি কঠিন। তবুও চৌধুরী হারুনুর রশিদ সে দায়িত্ব সফলতার

সঙ্গে পালন করে শ্রোতৃবৃন্দের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেন। কিন্তু লীগ নেতাদের কেউ কেউ কবিতা পাঠের বিরুদ্ধে আপত্তি করছিলেন। কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে চৌধুরী হারুনুর রশিদ সফল আবৃত্তিকারের মতোই কবিতা পাঠ সমাপ্ত করলেন। চারদিকে করতালি। কবিতার যেমন ভাষা, তেমনি তার ভাব, তেমনি ছন্দ। শ্রোতৃবৃন্দ একেকবার উত্তেজিত হয়ে ফেটে পড়ছেন আর আওয়াজ তুলছেন 'চল চল ঢাকা চল'। শিল্পপতি এ কে খান হঠাৎ বিচলিত হলেন, ক্ষুব্ধ হলেন, রুষ্ট হলেন, শেষে হলেন ক্রুদ্ধ। তিনি দাঁড়িয়ে আদেশ দিলেন বন্ধ করো তোমার কবিতা পাঠ। সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করে উঠে সমগ্র জনতা 'খুনী লীগ শাহীর পতন চাই, লীগ নেতাদের ফাঁসি চাই। নূরুল আমিনের কলা চাই। আবার করতালি।

সুযোগটি নিলেন এ কে খানের চরম প্রতিদ্বন্দ্বী সুবক্তা ফজলুল কাদের চৌধুরী। তিনি এক ঢিলে দুই পাখি নয় মারলেন তিন পাখি। তাঁর তেজস্বী ভাষা ও কৌতুকপ্রিয়তা মিশ্রিত ভাষণে জনতা কর্তৃক ধিকৃত হলেন পুঁজিপতি এ কে খান। আর জনতার কাছে নন্দিত হলেন ফজলুল কাদের চৌধুরী। লীগ বিরোধী ছাত্র জনতার কাছে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে পরিণত হলেন তাঁদের নেতৃরূপেও। সুযোগটি করে দিলেন কিছুটা সভাপতি জনাব রফিউদ্দিন সিদ্দিকী। তিনিও ধনিকগোষ্ঠীর একজন। দান-ধ্যান ও আচার ব্যবহারের সরলতায় ছিলেন সাধারণ মানুষের কাছাকাছি। কিন্তু বক্তা হিসেবে তার খ্যাতি ছিল না। প্রতিটি বাক্যের শুরুতে মাঝখানে ও শেষে কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করেন 'আমার আপনার, আপনার আমার'। তিনি নিজেও ছিলেন খুব উত্তেজিত। কাজেই স্বভাবসুলভভাবে ও উত্তেজিত কণ্ঠে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, 'নূরুল আমিন আপনার গুলি মেরেছে আপনার, হত্যা করেছে আপনার আমার ছাত্র ভাই আমার আপনার। আমি আপনার দুঃখ রাখার আপনার আমার জায়গা নেই আপনার।' এইভাবে আমার আপনার আপনার আমার করে করে সভা যখন শেষ হলো তখন সেই বিশাল জনসমুদ্র সৃষ্টি করে যে ঐতিহাসিক বিক্ষোভ শোভাযাত্রা তার পদভারে সেদিন প্রকম্পিত হয়ে পাহাড়ের গায়ে হেলান দেওয়া বন্দরনগরী চট্টগ্রাম।[১০১]

ওই দিন সরকার এক আদেশ বলে কবিতাটি বাজেয়াপ্ত করে এবং মাহবুব উল আলম চৌধুরীর ওপর গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে। ইতোমধ্যে জনসভায় কবিতা পাঠ করার অপরাধে শ্রমিক নেতা চৌধুরী হারুনুর রশীদকে ২৪ ফেব্রুয়ারি গ্রেফতার করা হয়। মাহবুব উল আলম চৌধুরী গ্রেফতার এড়াবার জন্য বাড়ির গাড়িতে পর্দা টাঙিয়ে বোরখা পরে পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে আত্মগোপনে চলে যান এবং আত্মগোপনে থেকে কর্মীদের মাধ্যমে আন্দোলন পরিচালনা করেন।[১০২] পুলিশ কোহিনুর ইলেকট্রিক প্রেসে তালা ঝুলিয়ে দেয় এবং প্রেস থেকে দবির আহমদকে গ্রেফতার করে।

পরবর্তীকালে এই সরকারি মামলা চট্টগ্রাম সদর উত্তর মহকুমার আদালতে ১৯৫২ সাল হতে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত চলে। বিচারে শেষ পর্যন্ত মুদ্রাকর কোহিনুর ইলেকট্রিক প্রেসের দবির আহমদকে ছয় বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়। চৌধুরী হারুনুর রশিদকে

বেকসুর খালাস দেয়া সত্ত্বেও চট্টগ্রাম জেল থেকে রাজশাহী জেলে স্থানান্তর করে তাঁর উপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়ে। মাহবুব উল আলম চৌধুরীকে রফিউদ্দিন সিদ্দিকীর হস্তক্ষেপে মোকদ্দমার দায় হতে নিস্কৃতি দেয়া হয়।[১০৩]

সাহিত্যজীবন

প্রত্যেক লেখকেরই আত্মপ্রকাশের পটভূমি থাকে। কোনো না কোনো প্রেক্ষাপটে অভিজ্ঞতা, দৃষ্টি, মনন, পরিবেশ, সমাজ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে নির্মিত হয় লেখকের মন ও মনন। আর সমকালীন সমাজ মানসের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পের কোনো না কোনো মাধ্যম বা শাখায় তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেন। মাহবুব উল আলম চৌধুরী এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। সাহিত্যসাধনার ঐতিহ্য তাঁর পরিবারে বিদ্যমান ছিল। তাঁর নানা মধ্যযুগের কবি দৌলত কাজীর উত্তরপুরুষ, কবি আবদুল বারী চৌধুরী তাঁর নানীর পিতা। তাঁর মনন-পরিধিতে এইসব সাহিত্যশিল্পীদের প্রভাব থাকা বিচিত্র কিছু নয়।

ছেলেবেলায় তিনি দেখেছেন সিরাজউদদৌলা ও শাহজাহান নাটক, স্মৃতিচারণে বলেছেন এসব নাটকের আবেগময় সংলাপ তাঁকে দেশের প্রতি উদ্দীপ্ত করে। স্কুলজীবনে তাঁর একাধিক বন্ধু জুটেছিল। এই রকম একজন বন্ধুর প্রতি ভালবাসা থেকে তাঁর কাব্যশক্তির উন্মেষ ঘটে, লিখেছেন,

> এক শরৎকালের কথা। শিশিরভেজা রোদ উঠেছে সকালে। বাগানে সবুজ ঘাসের ওপর পড়েছে শিউলি ফুলের শুভ্র আস্তরণ। মধুর একটা গন্ধে উতলা হয়ে উঠেছে মন। ইচ্ছে হলো শিউলি ফুলের মালা গাঁথি। পরে ভাবলাম মালা গাঁথা তো মেয়েদের কাজ। পরে খাতায় তাকে উদ্দেশ্যে করে একটি কবিতা লিখে ফেললাম। এই আমার জীবনের প্রথম কবিতা। এর আঙ্গিক কী ছিল, আদৌ কবিতা হয়েছিল কি-না আজ আর মনে নেই। সেদিন হয়েছিল আমার কবি জীবনের প্রথম পদ্ম উন্মীলন।[১০৪]

এভাবেই সাহিত্যের অঙ্গনে নিজেকে আবিষ্কার করেন। প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সারাজীবন কবিতা লিখবেন। অবশ্য বাল্যবয়সের এই প্রতিজ্ঞার মধ্যে কোনো প্রত্যয় ছিল না, ছিল আবেগের আতিশয্য– তাই হয়তো তাঁর প্রথম বইয়ের নাম 'আবেগধারা' (১৯৪৪)।

তাঁর শিক্ষাজীবনের কিছু কাল কাটে গ্রামে। তারপর চলে আসেন চট্টগ্রামে। মেজো মামা আহমদ সাগীর চৌধুরী সংবাদপত্র প্রকাশ করেছেন, কনিষ্ঠ মামা লুৎফে আহমদ চৌধুরী ছিলেন সাহিত্য সংগঠনের কর্ণধার। সেই সংগঠনে সাহিত্য আলোচনা হতো, সংস্কৃতি চর্চা হতো। এসব বিষয়ও তাঁকে সাহিত্য-সাধনা ও সংস্কৃতি চর্চায় প্রণোদিত করে থাকবে। লুৎফে আহমদ চৌধুরীর ঝোঁক ছিল গুণীজনের সান্নিধ্যে আসার। প্রাথমিক স্কুলে পড়ার সময়ই হয়তো ভাগনে মামাকে সাহিত্যপ্রীতির কথা বলে থাকবেন কিংবা ভাগনে যে সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট মামা তা টের পান। বিভিন্ন গুণীজনের সান্নিধ্যে মামা ভাগনেকে নিয়ে যেতেন। একদিনের ঘটনা,

> নন্দনকাননে যাওয়ার মুখে রথের পুকুর। পুকুরের পূর্ব দিকে পাহাড়ের শীর্ষে তুলশীধাম। পাদদেশে ছোট্ট টিলার ওপর লতাপাতায় ঘেরা কবি আশুতোষ চৌধুরীর বাড়ি। ঢুকতেই দেখলাম চারিদিকে ঝুমকো ফুল ফুটে আছে। প্রবেশদ্বারের পিলারে মার্বেল পাথরে লেখা 'নিভৃত নিলয়', তার নিচে লেখা শ্রী আশুতোষ চৌধুরী। সামনে সিঁড়ির কয়েক ধাপ ওপরে উঠে ছোট মামা হাঁকতে লাগলেন, আশুদা বাড়ি আছো। তিনি বেরিয়ে এসে বললেন, আরে লুতু মিয়া, এসো, ভেতরে চলে এসো। তিনি আমাদের বৈঠকখানায় নিয়ে বসালেন। হেসে হেসে বললেন, এই নতুন অতিথিটি কে? মামা আমার পরিচয় দিয়ে বললেন, আমার ভাগনে, মা নেই, শহরে নিয়ে এসেছি, মুসলিম হাইস্কুলে পড়ে। এই বয়েসেই কবি হওয়ার খুব শখ। তিনি তাঁর ছোট ছেলে সুচরিতকে ডেকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।[১০৫]

এ প্রসঙ্গে আরও লিখেছেন,

> সুচরিতকে বন্ধু হিসেবে পেয়ে এবং তার রসিক পিতাকে সাহিত্যের শিরোমনি হিসেবে ভাবতে গিয়ে আমার জীবনের মোড় ঘুরে যায়। আমি সাহিত্যকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করার উৎসাহ পাই এই পরিবার থেকে।[১০৬]

ইতোমধ্যে তাঁর জীবনে যোগ হয় রাজনৈতিক মাত্রা। ১৯৪২ সালে কংগ্রেস সোশালিস্ট পার্টির ছাত্রসংগঠন ছাত্র কংগ্রেসে যোগ দেন এবং এর সাহিত্য সংঘের সম্পাদক নিযুক্ত হন। কিছুকাল পর যোগ দেন কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্রসংগঠন ছাত্র ফেডারেশনে, সম্পৃক্ত হন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে। ছিলেন ভারতীয় গণনাট্যের প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘের চট্টগ্রাম শাখার সহকারী সম্পাদক। তাঁর সাহিত্যজীবনে বিপুল বৈচিত্র্য ও পরিবর্তন আসে এই প্রেক্ষাপটে। তাছাড়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, পঞ্চাশের মন্বন্তর এবং দেশভাগ তৎপরবর্তী ভাষা আন্দোলন ও পূর্ববাংলার রাজনৈতিক সংগ্রাম তাঁর সাহিত্যজীবনে বিশেষ প্রভাব ফেলে। তাঁর সাহিত্যারম্ভ কবিতা দিয়ে। প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ কাব্য 'আবেগধারা'। তিনি লিখেছেন, 'নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, এইটি ছিল আবেগে ভরপুর একটি কাব্যগ্রন্থ এবং নামটিও আধুনিক নয়, একটি রোমান্টিক নাম। 'আবেগধারায় স্নান করাব এসো এসো আমার কাব্যরাণী/ অনুরাগের রঙিন সুতোয় বাঁধাবো তোমার আঁচলখানি'– এই দুটি পঙক্তির কথা মনে পড়ছে।' এ কথা উল্লেখ করে সাহিত্যপ্রয়াস সম্পর্কে লিখেছেন,

> চল্লিশ এবং পঞ্চাশ দশকে কোলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় আমার দুটি কাব্যগ্রন্থ– যথাক্রমে 'ইস্পাত' এবং 'অঙ্গীকার'। প্রখ্যাত সাহিত্যিক হুমায়ুন কবিরের ভূমিকাসম্বলিত 'দারোগা' ও 'আগামীকাল' নামে দু'টি নাটকও আমি লিখেছি। 'দারোগা' নাটকে পুলিশী অত্যাচারকে তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৪৭ সালে আমি লিখি 'বিপ্লব' নামে একটি পুস্তিকা। এতে কীভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে ব্রিটিশ সরকারকে হটানো যায়- সেই সম্পর্কে লিখেছিলাম।[১০৭]

'দারোগা' নাটকের 'ভূমিক'ায় হুমায়ুন কবির প্রথমেই লিখেছিলেন, 'আনন্দই সৃষ্টির উৎস'। মুনীর চৌধুরীর সঙ্গে প্রগতি লেখক সংঘের সূত্রে যোগাযোগ ছিল। তিনি তাঁকে সাহিত্যচর্চায় উৎসাহ দিতেন। 'আগামীকাল' নাটকটি তাঁরই আগ্রহে রচিত, যা তিনি

সম্পাদনা করে দিয়েছিলেন।[১০৮] একই সময় পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিতে লিখেন 'ভাঙন'। এটি তাঁর জীবনের প্রথম নাট্যরচনা।

তাঁর সাহিত্যকর্ম সমকালীন রাজনীতি ও সমাজের অভিঘাত থেকে রচিত। কালের ধ্বনিকে তিনি তুলে ধরেছেন কালি ও কলমে। ফলে সমকালীনতা তাঁর সাহিত্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। নিভৃতচারী হয়ে কলাকৈবলবাদী সাহিত্যসাধনা তাঁর স্বভাবধর্ম নয়। বরং 'সহস্র বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তি'র মন্ত্রে তিনি উজ্জীবিত।

সাংস্কৃতিক সত্তাকে প্রকাশ করতে গিয়ে লেখক সত্তাকে হারিয়ে ফেলেননি। তাকে লালন করেছেন, পরিচর্যা করেছেন। যেমন ১৯৫২ ও ১৯৫৪ সালে কুমিল্লা ও ঢাকায় যে ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে যথাক্রমে তিনি 'সমাজ ও সভ্যতা' এবং 'সাহিত্যে সমাজ চেতনা' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এ থেকে উপলব্ধি করা যায়, কবিতা দিয়ে সাহিত্যচর্চা শুরু করলেও, পরে প্রবন্ধসাহিত্য চর্চায় মগ্ন হন এবং আগ্রহী হন মননচর্চায়।

তিনি চট্টগ্রামের গুণী সাহিত্যজনের সান্নিধ্যের পাশাপাশি কলকাতার লেখক-শিল্পীদেরও সংস্পর্শ লাভ করেন, যা তাঁর সাহিত্যজীবনে বিশেষপ্রভাব বিস্তার করে। মামার ব্যবসাসূত্রে কলকাতায় যাতায়াত তাঁর জন্য ছিল খুব স্বাভাবিক। আর রাজনৈতিক সূত্র সেই সুযোগকে আরও পরিপুষ্ট করে। ব্যবসা, রাজনীতি ও সংস্কৃতি চর্চার সূত্র প্রকারান্তরে তাঁর সাহিত্য-সাধনাকে বিশেষ সমৃদ্ধি দান করে। আর 'সীমান্ত 'প্রকাশ ছিল সেই সুযোগ ও বিকাশের চূড়ান্ত প্রকাশ। কলকাতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ তাঁর পুরো সাহিত্যজীবনে দান করে বিশেষ মাত্রা।[১০৯]

ফলে সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি, আদর্শ, আঙ্গিক, শৈলী ইত্যাদি জ্ঞাত হওয়ার পথ হয় অবারিত। এ সূত্রে পরিচিত হন কলকাতার খ্যাতনামা সব লেখক-শিল্পীর সঙ্গে। ফলে কলকাতার সব বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে বিশ্বশান্তি পরিষদের সূত্রে দেখা করেন পাবলো নেরুদার সঙ্গে, দিল্লিতে। তিনি তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'রেসিডেন্স অন আর্থ' তাঁকে উপহার হিসেবে প্রদান করেন। এই কাব্যগ্রন্থের প্রভাব তাঁর 'কাঁদতে আসিনি, ফাঁসীর দাবি নিয়ে এসেছি'র মধ্যে লক্ষ্যযোগ্য।

'সীমান্ত' পত্রিকা পূর্ববাংলার প্রগতিশীল সাহিত্যরুচির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। সমকালে এ পত্রিকা ব্যাপক সাড়া জাগায়। ১৯৪৭-৫২ পর্যন্ত পূর্ব বাংলার সাহিত্য জগতে উদার, অসাম্প্রদায়িক ও সমাজবাদী সাহিত্যধারা নির্মাণে এই পত্রিকার বিশেষ অবদান রয়েছে। এর সম্পাদক হিসেবে মাহবুব আলম চৌধুরী তাঁর চিন্তাচেতনা ও মেধা প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। সাহিত্য যে নিছক আনন্দ ও বিনোদনের সামগ্রী নয়, এর মধ্য দিয়ে যে সমাজ পরিবর্তনের ধারা বিকাশ করা সম্ভব একথা তিনি 'সীমান্তে'র মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন।

এরমধ্যে আসে ভাষা আন্দোলন। একুশে ফেব্রুয়ারির ধর্মঘটকে সাফল্যমণ্ডিত করা জন্য কয়েকদিন খেটে আকস্মিকভাবে জলবসন্তে আক্রান্ত হন। একুশে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্রহত্যার খবর পেয়ে রোগশয্যায় রচনা করেন ভাষা আন্দোলনের ওপর প্রথম কবিতা

'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি।' ঐ কবিতার পটভূমি কিংবা ইতিহাস প্রসঙ্গে মাহবুব উল আলম চৌধুরী বলেন,

> সাংবাদিকরা আমার এই কবিতা নিয়ে আমার অনুভূতির কথা জানতে চাইলে আমি বলি, এই কবিতা মুহূর্তের সৃষ্টি নয়, এই কবিতা লিখতে আমার দশ বছর সময় লেগেছে। ৪২ সালের ভারত-ছাড়ো আন্দোলন থেকে শুরু করে ৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্যে ব্যাপ্তি।[১১০]

ভাষা আন্দোলন-উত্তরকালে রাজনীতি নিয়ে কর্মতৎপর ছিলেন। প্রগতিশীল রাজনীতির পাটাতন নির্মাণে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের হয়ে কাজ করেন। ১৯৫৬ সালে মিশরের বিপ্লবী নেতা আবু নাসের জামাল সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করলে ব্রিটিশ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে যুদ্ধের হুমকি দেয়। ফলে বিশ্ববিবেক নাসেরের সমর্থনে আন্দোলন শুরু করে। পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদের পক্ষাবলম্বন করলে চট্টগ্রামে সাম্র্যাজ্যবাদ বিরোধী বিরাট মিছিল বের করেন। এই সূত্রে কমরেড দেবেন শিকদারের উৎসাহে এক রাতে তিরিশ পৃষ্ঠার 'মিসরের মুক্তিযুদ্ধ' পুস্তিকা রচনা করেন। ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারির ফলে তাঁর রাজনৈতিক জীবন যেমন ম্রিয়মান হয়ে পড়ে, সাহিত্যজীবন হয়ে পড়ে স্থবির। সংস্কৃতি চর্চা, সংবাদপত্র প্রকাশ করলেও তিনি চলে যান নিভৃতে, সবার অলক্ষ্যে। বলা যায়, এ পর্যন্ত তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রথম অধ্যায়।

১৯৭৫ সালে তিনি ঢাকায় আসেন স্থায়ীভাবে। সেখানেও নিশ্চুপ ছিলেন, যা তাঁর স্বভাবধর্ম নয়, বৈশিষ্ট্য তো নয়ই। ত্রিদিব দস্তিদারের উৎসাহে তিনি আবার সরব হয়ে ওঠেন।[১১১]

শুরু হলো তাঁর সাহিত্যজীবনের দ্বিতীয় পর্ব। বের হলো তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'কাঁদতে আসেনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি' (১৯৮৮)। এই কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে পুনরায় আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হন। সাহিত্যচর্চায় পুরো মাত্রায় সক্রিয় হয়ে ওঠেন। নতুন করে সঞ্জীবিত করেন নিজেকে, সাহিত্যসত্তাকে। লিখলেন কবিতা, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, আত্মকথা, স্মৃতিচারণ। স্মৃতিতর্পণ ও মূল্যায়ন করলেন মণীষী ও গুণীজনের। কবিজীবন, সংগঠক-জীবন ইত্যাদি বিষয়ে সাক্ষাৎকার প্রদান করলেন– এ এক সৃষ্টিমুখর মৌসুম, মৌতাত।

পঞ্চাশের দশকে সাহিত্যচর্চা নিয়ে যেমন শশব্যস্ত ছিলেন, জীবনের এই পর্যায়েও তেমনি ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এই পর্যায়ে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে 'সংস্কৃতি: জাতীয় মুখশ্রী' প্রবন্ধ গ্রন্থ অন্যতম। এ গ্রন্থের মধ্য দিয়ে তাঁর মানস জগতের স্পষ্ট ছবি ভেসে ওঠেছে। জাতীয় সংস্কৃতির অবয়ব, বাংলার জাগরণ ও এর সঙ্গে মুসলিম সমাজের সম্পর্ক, দেশাত্মবোধক গান, রবীন্দ্রনাথ, সংস্কৃতির ধারা, দেশভাগ, একুশের চেতনা, মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট ইত্যাদি বিষয়ে তিনি মতামত ব্যক্ত করেছেন। ফলে সহজে উপলব্ধি করা যায়, কোন মানস পটভূমিতে তিনি রাজনীতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য সাধনা করেছেন।

তবে তাঁর শেষজীবনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ আত্মজীবনী 'স্মৃতির সন্ধানে'। তিনি অবশ্য একে আত্মজীবনী বলতে নারাজ, বলেছেন, 'এই বইতে কিন্তু আমার জীবনী ধারাবাহিকভাবে লিখিনি। যখন যা স্মৃতিতে উদয় হয়েছে তাই লিখেছি। এজন্য এর নাম

দিয়েছি 'স্মৃতির সন্ধানে'।' প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি স্মৃতিরই সন্ধান করেছেন, অন্বেষণ করেছেন সেই সময়ের বৃত্তান্ত, চরিত্র, ঘটনাধারা। নিজের স্মৃতি ও সত্তা হাতড়ে তুলে এনেছেন এর উপাদান। কতজনের কত সাধনা, চিন্তা-ভাবনা ও আত্মত্যাগের ইতিবৃত্ত এই গ্রন্থ। এই গ্রন্থ বাংলা আত্মজীবনী সাহিত্যে মূল্যবান সংযোজন।

তিনি সওগাত, সোনার বাংলা, পরিচয়, নতুন সাহিত্য, দৈনিক সত্যযুগ, অগ্রণী, ডাক, ইস্পাত, পরিচিতি, পূর্ব্বাশা, নওবেলাল, সাপ্তাহিক আওয়াজ, উদয়ন ও প্রগতি পত্রিকায় গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখেছেন। সেসব রচনা ও গ্রন্থাবলি বিভিন্ন সময় পুলিশি হামলায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। প্রগতিশীল রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের জন্যে মাহবুব উল আলম চৌধুরী বরাবরই ছিলেন শাসকশ্রেণীর কোপানলে। দুঃখ করে লিখেছেন,

> শেষ আক্রমণ আসে একাত্তরে। তখন আমার ঘর-বাড়ি ভাঙচুর, লুটপাট করে পোড়োবাড়িতে পরিণত করে পাক-হানাদার বাহিনী। আমার সমৃদ্ধ লাইব্রেরি, প্রকাশিত-অপ্রকাশিত গ্রন্থ, নাটক, কবিতা, ছোটগল্প, প্রবন্ধ এবং আমার দশ বছরের রাজনৈতিক ডায়রি যা ঐ লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত ছিল, বর্বর পাকবাহিনী তা পাউডার দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। আমি নিঃসন্তান হয়ে যাই।[১১২]

একুশের প্রথম কবিতা উদ্ধারের কাহিনী

১৯৫২ সালে একুশের প্রথম কবিতা 'কাঁদতে আসিনি, ফাঁসীর দাবী নিয়ে এসেছি' বাজেয়াপ্তির পর কেউ আর এর খোঁজ করেনি। কবি স্মরণ থেকে কিছু পঙক্তি উদ্ধার করতে পেরেছিলেন। অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম স্মৃতি থেকে বেশ কিছু পংক্তি উদ্ধার করেন। কিন্তু সম্পূর্ণ কবিতার অবিকল পাঠ কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিলো না। ফলে পুরো কবিতাটি ছিল বিস্মৃতির অতল গর্ভে। মাহবুব উল আলম চৌধুরী এক সাক্ষাৎকারে সবিনয় আহ্বান জানান যদি কারও কাছে কবিতাটি থাকে তাহলে তা উদ্ধারের জন্যে। এ পর্যায়ে প্রাবন্ধিক ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'সাহিত্য প্রকাশ'-এর পরিচালক মফিদুল হক কবিতাটি উদ্ধার করে কবিকে দেন। এর পটভূমি এ রকম– পুলিশ কর্মকর্তা মীর আশরাফুল হক ভাষা আন্দোলনের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হল তল্লাশি কালে অন্য কাগজের সাথে এই কবিতা পান। কবিতাটি ভাল লাগায় বাসায় নিয়ে আসেন এবং স্ত্রী জোবেদা হকের কাছে রাখেন। তিনি এটি রাখা নিরাপদ মনে না করে ননদ মীর মঞ্জুরা বেগমকে দিয়ে দেন। স্কুল ছাত্রী মঞ্জুরা বেগম এক পর্যায়ে ডায়েরিতে কবিতাটি লিখে রেখে মূল কবিতাটি নষ্ট করে ফেলেন। কবিতাটি এভাবেই রক্ষা পায়। উল্লেখ্য, মীর মঞ্জুরা বেগম মফিদুল হকের ফুফু।[১১৩]

কিন্তু মূল কবিতাটি ছিল দুষ্প্রাপ্য। পরবর্তীকালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক চৌধুরী জহুরুল হক বহু অনুসন্ধান করে মূল কবিতাটি উদ্ধার করেন এবং এ নিয়ে 'প্রসঙ্গঃ একুশের প্রথম কবিতা' শীর্ষক গবেষণাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এভাবেই কবিতাটি উদ্ধার পায়। পূর্ণতা পায় ইতিহাসের অপূর্ণ বৃত্ত।

সাময়িকপত্র সম্পাদনা

১৯৩৫-এর মধ্যে চট্টগ্রাম থেকে কোনো নিয়মিত সাহিত্যপত্রিকা বের হয়নি। চট্টগ্রাম সাহিত্য পরিষদের মুখপত্র হিসেবে নবীনচন্দ্র দাসের সম্পাদনায় ত্রৈমাসিক 'প্রভাত' নিয়মিত বের হয়েছে কিনা তা অনিশ্চিত। অবশ্য 'পূরবী' চট্টগ্রামের সাহিত্যচর্চায় অসামান্য ভূমিকা রেখেছে। 'পূরবী'তে লিখতেন মাহবুব উল আলম, আশুতোষ চৌধুরী, মুহম্মদ এনামুল হক, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, কাজী আবদুল ওদুদ, আবদুল কাদির।[১১৪] সীমান্ত পত্রিকা বের হয় ১৯৪৭-এ। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট পত্রিকাটি প্রকাশে নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছিল। দুইটি মহাযুদ্ধে বিশ্বে অশান্তি বিরাজ করছে, দেশে দেশে স্বাধীনতার ডাক উঠছে। কিন্তু তাকে স্তব্ধ করতে চায় সাম্রাজ্যবাদ। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র পরিকল্পনা সমাজবাদী জনগণকে হতাশ করে তুলে। এই পটভূমিতে 'সীমান্ত' হয়ে ওঠে মানবতার প্রতীক। নজরুলজয়ন্তী উপলক্ষে বড় ধরনের সমাবেশ হয়েছিল। এ ধরনের কার্যকলাপে তরুণ ও প্রবীণদের মধ্যে দারুণ উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল। এ পটভূমিতে প্রকাশিত হয় 'সীমান্ত'। মাহবুব উল আলম চৌধুরী লিখেছেন,

> এই মাসিক পত্রিকার মূলনীতি হবে অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ, জাতীয়তাবাদ– এবং আমরা এর চেয়ে বেশী কিছু চেয়েছিলাম– 'সবার উপরে মানুষ সত্য', এই কথাটি যেমন মানবতাবাদের বিশ্লেষণ করে, তেমনি এটাকে শ্রেণীগত বিশেষণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে চেয়েছিলাম। আমরা এ দাবীও করেছিলাম যে, শিল্প-সাহিত্যকে রাজনীতির হাতিয়ার হতে হবে। আমাদের এ দুঃসাহসিক দাবী তখনকার অনেক উদারনৈতিক সাহিত্যিকরা স্বচ্ছল চিত্তে গ্রহণ করতে পারেন নি। কারণ এই দাবীর পেছনে হয়তো আমাদের কিছুটা হঠকারিতা থাকতে পারে। কিন্তু আমাদের বুকে যে আগুন ছিল, সে আগুনের উত্তাপকে কিন্ত তাঁরা অস্বীকার করতে পারেন নি। একটা নতুন সমাজ তৈরী– যেখানে শ্রেণী ভেদ থাকবে না, কোন বর্ণ ভেদ থাকবে না, হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে না– এই ধরনের একটা চিন্তা-ভাবনা নিয়ে আমরা 'সীমান্তে' পত্রিকা প্রকাশে আগ্রহী হই।[১১৫]

সীমান্তের উদ্দেশ্য সম্পর্কে লিখেছেন,

> আমরা যারা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে দুনিয়া জুড়ে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে বিতাড়িত করার সংগ্রাম জনগণকে সামনে নিয়ে এসেছি, সাম্প্রদায়িকতার অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করার সংগ্রাম করেছি, শিল্প সাহিত্যকে জনগণের কাছে এনে তাদের রুটি-রুজির অধিকারকে সুনিশ্চিত করার চেষ্টা করেছি, বাম চেতনার বিকাশের ক্ষেত্রে কাজ করেছি– তারা দেশকে এই পশ্চাদপদতার দিকে ঠেলে দেয়াকে কোনভাবেই গ্রহণ করতে পারিনি। মুক্তির পথ কোথায়, এর সন্ধানে আমরা 'সীমান্ত'কে সামনে নিয়ে এলাম।[১১৬]

'সীমান্ত'র সম্পাদক মাহবুব উল আলম চৌধুরী। প্রথম কয়েক সংখ্যার যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন সুচরিত চৌধুরী। সীমান্তে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক, উপন্যাস ছাড়াও থাকতো

নিয়মিত পুস্তক পরিচয়, পাঠকের মতামত, বিশ্বশান্তির উপর নিয়মিত ফিচার এবং দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা শিল্পী-সাহিত্যিকদের মূল্যবান লেখা। ১৯৪৭-৫২ পর্যন্ত তিনটি বিশেষ সংখ্যা বের করে– দাঙ্গা বিরোধী সংখ্যা, সাংস্কৃতিক সম্মেলন সংখ্যা ও বিশ্বশান্তির পক্ষে একটি সংখ্যা।

'সীমান্ত' প্রকাশ উপলক্ষে বাংলা সাহিত্যের অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব শুভেচ্ছাবাণী ও অভিমত প্রেরণ করেন। হবিবুল্লাহ বাহার 'শুভেচ্ছা' জানিয়ে লিখেন—

> পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত থেকে 'সীমান্ত' নাম দিয়ে তোমরা মাসিক কাগজ বের করছো শুনে খুশি হলাম। বহুদিন আগে চট্টগ্রাম থেকে আর একখানি কাগজ বেরিয়েছিল নাম ছিল 'প্রান্তবাসী'। যারা মধ্যদেশে বাস করে তাদের চেয়ে চিরদিনই বেশী প্রাণ শক্তির পরিচয় দেয় সীমান্তের লোক।
>
> চট্টগ্রামের তো কথাই নাই। পূর্বে এর সজাগ প্রহরীর মতো পর্বতশ্রেণী। বুক চিরে বেরিয়েছে এর কর্ণফুলির ফল্গুধারা। ভিতরে জ্বলছে বাড়বকুন্ডের দাবানল। চরণ ধোয়ায় এর বঙ্গপোসাগরের তরঙ্গমালা। যুগে যুগে কত বিচিত্র মানুষের ধারা এসে মিশেছে চট্টগ্রামের মহামানবের এই সাগর তীরে।
>
> চট্টগ্রামকে বাঙ্গালা সাহিত্য কখনও ভুলতে পারবেনা। দেবভূমি থেকে বঙ্গ সাহিত্যকে মাটির পৃথিবীতে নামিয়ে এনেছেন চট্টগ্রামের সাহিত্যিকরা। রোসাঙ্গের কবি দৌলত কাজী ও আলাওলই আমাদের সাহিত্যে মানবতার আমদানি করেন সর্ব প্রথম।
>
> সীমান্তবর্তী চট্টগ্রাম সাহিত্যে আবার নতুন পথ সৃষ্টি করবে এ ভরসা আমরা করতে পারি। বাঙ্গালা সাহিত্যের কারবার এখনো মধ্যবিত্ত সমাজকে নিয়ে। জনগণমনকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করা, তারই জন্য পথ রচনা করুক 'সীমান্তের' অগ্রপথিকরা।[১১৭]

জীবনবাদী সাহিত্যধারা সৃষ্টিতে সীমান্তের ভূমিকা বিপুলভাবে অভিনন্দিত হয়েছিল। কারণ সেখানে ছিল জীবনের প্রতিচ্ছবি, মানুষের মনের কথার অকপট প্রকাশ। ১৯৪৭-৫২ পর্যন্ত সীমান্ত বের হয়। কিন্তু আজ এর প্রকাশিত অর্ধসংখ্যক সংখ্যাও পাওয়া যায় না। ডক্টর ইসরাইল খান ও জওশন আরা রহমান সম্পাদিত 'সীমান্ত সংগ্রহ' থেকে সীমান্তের সূচিপত্র থেকে এর আদর্শ ও অবয়ব স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়।

সীমান্ত পত্রিকা নিছক সাহিত্যসাধনার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেনি। পাকিস্তান সৃষ্টির গোড়ার দিকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নিয়ে ব্যাপক চিন্তা-ভাবনা চলছিল। সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রে এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা, যুক্তিতর্ক চলে, নানা গুণীজন তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। 'সীমান্ত' প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩৫৪তে 'রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক আলোচনা স্থান পায়। সেখানে বলা হয়,

> রাষ্ট্রে যদি গণতান্ত্রিক হয় তবে গণের ভাষা; যে ভাষায় যে কথা বলে অকুণ্ঠিত ভাবে, যার দ্বারা সে মনের ভাব প্রকাশে সমর্থ হয়, সেই ভাষাই রাষ্ট্রে স্থান পাবে এটা স্বাভাবিক।... যদি গণের ভাষা রাষ্ট্রে স্থান না পায় তবে গণতন্ত্রের দুর্দ্দিন

> বলে বলতে হবে। গণতন্ত্রের বুলি আওড়াইলেই গণতন্ত্রের মর্যাদা দেওয়া হয় না। ভাষার দিক থেকে যদি বিচার করা যায় তবে বাংলা অপাঙক্তেয় নয় বরং পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা বলে পরিচিত লাভ করেছে। এর সাহিত্য পৃথিবীর যে কোন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের দরবারে স্বচ্ছন্দে আসন করে নিতে পারে। যদি লোক গণনার ভিত্তিতেও একে বিচার করা যায় তবে পৃথিবীর কম দেশই আছে যেখানে একটি ভাষায় এত লোক কথা বলে। কিন্তু এগুলিই বা রাষ্ট্রের ভাষায় বিচার্য্য বিষয় হবে কেন? রাষ্ট্র যদি জনসাধারণের হয় তবে জনসাধারণের ভাষাই রাষ্ট্রে স্থান পাবে। তা সে যতই অপাঙক্তের হ'ক না কেন, কারণ এই ভাষাতেই রাষ্ট্রের মঙ্গল নিহিত। মানুষের চোখ উপড়িয়ে ফেলে তাকে যেমন সুন্দর করে তোলা যায় না, জনের ভাষাকে বাদ দিয়ে জনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি তেমনি অসম্ভব।

'সীমান্ত'র দাঙ্গা বিরোধী বিশেষ সংখ্যা সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের 'পরিচয়' (শ্রাবণ, ১৩৫৭) পত্রিকায় গোপাল হালদার মূল্যায়ন প্রণিধানযোগ্য,

> অধ্যাপক মোতাহের হোসেন চৌধুরীর বিশেষ দাবি পশ্চিমবঙ্গের কবি, শিল্পী ও সাহিত্যিকদের নিকট। রাজনীতি ও ধর্মের প্রতি তার গভীর অবিশ্বাস; তিনি আহ্বান করেছেন, এ ব্যাপারে সত্যেন মজুমদার, অন্নদাশঙ্কর রায়, সুশোভন সরকার, সুধীন দত্ত, যামিনী রায়, বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্র, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কবি, শিল্পী ও সাহিত্যিকদের কাছে।' আর এই উদ্দেশ্যে তিনি চান শিল্পী ও সাহিত্যিকদের দুই বঙ্গে মিলিত পরিভ্রমণ ব্যবস্থা। সুসংবাদও তিনি জানিয়েছেন– চাটগাঁ শহরে তরুণ শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা মিলে সেখানে একটি দাঙ্গা বিরোধী প্রতিষ্ঠান এবং শান্তিফৌজও গড়ে তুলেছেন। পশ্চিম বাংলার শিল্পী ও সাহিত্যিকগণ হয়তো তা শোনেন নাই। তাই আমরা বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার শিক্ষিতদের দৃষ্টি এই উদারপ্রাণ বাঙালি বন্ধুর প্রবন্ধটির দিকে আকৃষ্ট করতে চাই। পশ্চিম বাংলার শিল্পীরা পূর্ব বাংলার এই সংস্কৃতি সহধর্মীর হাতে হাত মিলান।[১১৮]

সংবাদপত্র সম্পাদনা

১৯৫৩ সালে মাহবুব উল আলম চৌধুরী শিল্পপতি বদিউস সালাম, রুহুল আমিন নিজামী, গোপাল বিশ্বাস, ফকির আহমদ এবং মফিজুল ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে 'পত্রিকা লিমিটেড' নামে একটি কোম্পানী গঠন করেন। এই কোম্পানীর আর্থিক সহায়তায় ঢাকা থেকে বের হয় বাংলা নামের প্রথম বাংলা দৈনিক 'আমার দেশ'। উদ্যোক্তাদের ইচ্ছে ছিল পত্রিকাটি হবে গণতন্ত্রী দলের মুখপত্র। শেষ পর্যন্ত তা হয়নি, পত্রিকাটিও বেশি দিন চলেনি।

১৯৭২ সালে চট্টগ্রাম থেকে বের হয় দৈনিক স্বাধীনতা। মাহবুব উল আলম চৌধুরী ছিলেন এর সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি। অরুন দাশগুপ্তের স্মৃতিচারণে মাহবুব উল আলম চৌধুরীর সম্পাদক-সত্তার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন,

> দৈনিক স্বাধীনতায় কাজ করতে গিয়ে পরিচয় পেয়েছিলাম তাঁর বিশ্লেষণী ক্ষমতার। তখনই বুঝেছিলাম কি করে পুস্তকলব্ধ জ্ঞানকে বিশ্লেষণী ক্ষমতা দিয়ে বিচার করে বিবেচনায় আনতে হয় এবং এটাই একজন সম্পাদকের কাছে পাঠকরা চান। আমার দুঃখ– মাহবুব ভাই বেশিদিন কেন পত্রিকা সম্পাদনায় রইলেন না! থাকলে চট্টগ্রামের পত্রিকা সম্পাদনার মান আরো বাড়তো।[১১৯]

আবুল মোমেন দৈনিক স্বাধীনতায় তাঁর তত্ত্বাবধানে কাজ করার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে লিখেছেন,

> আমরা তখন একবারেই তরুণ, ছাত্রত্ব শেষ হয়নি, জীবনের প্রথম চাকরি। কিন্তু মাহবুব ভাই কাউকে হাল্কাভাবে নিতেন না। আমাদের মতামত যেমন শুনতেন তেমনি তাঁর মতামত নিয়ে আমাদের সাথেই আলোচনা করতেন। একটা যথার্থ সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশে তাঁর সাথে কাজ করার সুযোগ হয়েছে আমার।[১২০]

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাহবুব উল আলম চৌধুরী স্বাধীনতা পত্রিকা ত্যাগ করেন, এর কারণ হিসেবে আবুল মোমেনের পর্যবেক্ষণ,

> অনেক দিনের জড়তা কাটিয়ে নিজেকে যেন মেলে ধরতে পারেননি। আলাপচারিতায় তাঁর মেধা, যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যেত। কিন্তু সকল কুণ্ঠা ছাপিয়ে আবার লেখা কাজে ঝাঁপিয়ে পড়াব উৎসাহটা দেখা যেত না। সম্ভবত তাঁর যথার্থ পরিমণ্ডলটা পাচ্ছিলেন না, যা তাঁকে প্রেরণা ও উৎসাহ যোগাতে পারে।[১২১]

সাংস্কৃতিক কর্মপ্রয়াস

ইতিহাস ও ঐতিহ্যের গর্বিত অংশীদার হিসেবে চট্টগ্রাম পূর্ববাংলায় সংস্কৃতি ক্ষেত্রে প্রাগ্রসর ভূমিকা পালন করেছে। সেখানে ছিল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অতীত ঐতিহ্য ও অহঙ্কার, যে অহঙ্কার মাহবুব উল আলম চৌধুরীকে প্রণোদিত করেছিল ভবিষ্যতের দিকে চালিত করতে।

চট্টগ্রাম সাহিত্য পরিষদ (১৯১১) সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে বিশ শতকের প্রথমার্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এই পরিষদের সভাপতিদের মধ্যে ছিলেন নবীনচন্দ্র দাস, শশাঙ্কমোহন সেন। পরিষদ ১৯১৫-৩৮ সালে জেলার বিভিন্ন স্থানে সাতটি সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করে।[১২২] বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এই শাখা সংস্কৃতিচর্চায় পালন করে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা। এই শাখা গঠনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেরও বিশেষ ভূমিকা ছিল।

সাহিত্য-সংগঠন 'সাহিত্য মজলিশ' (১৯৩৩-৩৫) গড়ে ওঠে আবুল ফজল, মাহবুব উল আলম, আবদুল হক ফরিদী, ওহীদুল আলম ও সুবোধরঞ্জন রায়ের প্রচেষ্টায়।[১২৩] অন্যান্যের মধ্যে যুক্ত ছিলেন সা'দত আলী আখন্দ। মজলিশের প্রথম বার্ষিক সভা ১৯৩৫-এর ১৪ জুন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ।[১২৪] সাহিত্য মজলিশে উপস্থিত থাকতেন অন্নদাশঙ্কর রায়, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, জনার্দন চক্রবর্তী, আশুতোষ চৌধুরী, ত্রিপুরা শঙ্কর চৌধুরী, মনিরুজ্জমান এসলামাবাদী, সুরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ, অমূল্যচরণ সেনগুপ্ত।[১২৫]

ওহীদুল আলম ও আশুতোষ চৌধুরীর যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক পূরবী (১৯৩৬)।[১২৬] 'পূরবী'কে ঘিরে গড়ে ওঠে চট্টগ্রামে সাহিত্য আন্দোলন। ১৯৩৭ সালে ১৭ অক্টোবর চট্টগ্রামে পূরবী সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনের সঙ্গে জড়িত এবং অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে আছেন কাজী আবদুল ওদুদ, মুহম্মদ এনামুল হক, উপেন্দ্রনাথ রায়, বেনীমাধব দাস, আবদুল কাদির, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, আশুতোষ চৌধুরী, কালিকারঞ্জন কানুনগো, মাহবুব উল আলম, মনিরুজ্জমান এসলামাবাদী, আবুল ফজল, ওহীদুল আলম, সা'দত আলী আখন্দ, নূতনচন্দ্র দাস প্রমুখ।[১২৭] সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ।

প্রায় একই সময়ে 'আর্য সঙ্গীত সমিতি' ও 'সঙ্গীত পরিষদ'-এ প্রশিক্ষণের একটা শ্লথ ও নিরুত্তাপ প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল।[১২৮] তা সত্ত্বেও নাজুক পরিস্থিতিতে সংস্কৃতি চর্চায় ভাঁটা পড়ছিল, বিশেষ করে প্রগতিশীল সংস্কৃতিচর্চায়। এসব সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক উদ্যোগ চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক ভূমিকে উর্বর করে তোলে। মাহবুব উল আলম চৌধুরী সংস্কৃতি-সাধনায় উৎসাহিত হন এখান থেকেই। এই সাংস্কৃতিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে সংস্কৃতি-চর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন।

রাজনীতি ও সাহিত্যচর্চার সূত্রেই মাহবুব উল আলম চৌধুরী সংস্কৃতি অঙ্গনের সঙ্গে যুক্ত হন। ঘরোয়া ও পারিবারিক সংস্কৃতি চর্চা থেকে ক্রমে বহিরাঙ্গনের সংস্কৃতি জগতে সক্রিয় হয়ে উঠেন। সংস্কৃতিচর্চার সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাস ও সাহিত্যিক ভাবাদর্শ ছিল অভিন্ন। অর্থাৎ সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সমাজ পরিবর্তনের যে আদর্শ তিনি গ্রহণ করেছিলেন সংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়ে ঐ একই স্বপ্নকে ধারণ করেছেন। অর্থাৎ সংস্কৃতি হবে মানবমুক্তির পথ। ভারতীয় গণনাট্যের আলোকে এবং সমকালীন রাজনীতি, সংস্কৃতি ও সমাজের অচলায়তনকে ভেঙ্গে তিনি গণমুখী সংস্কৃতিধারা প্রবর্তন করেছিলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালে কমিউনিস্ট পার্টি ভারতব্যাপী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের উত্তাল ঢেউ সৃষ্টি করে। ওই সময় সৃষ্টি হয় প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ। ভারতীয় গণনাট্য সংঘে (আইপিটিএ, ১৯৪৩) উঠে আসেন দেশের সেরা শিল্পী ও নাট্যকর্মিরা। এদের কার্যক্রম সম্পর্কে মাহবুব উল আলম চৌধুরী লিখেছেন,

> তারা বিশ্বব্যাপী শোষণের পরিসমাপ্তি ঘটানোর উদ্দেশ্যে সমাজতন্ত্রকে লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাই সংস্কৃতির মূলধারায় শ্রেণী চেতনার প্রসার ঘটানোকে আবশ্যিক কর্তব্য বলে মনে করতেন। তাদের গান, কবিতা, নাটক, চিত্র, প্রত্যেকটি শিল্পকর্ম, অনুষ্ঠান, সম্মেলন প্রভৃতির মূল প্রেরণা ছিল সমাজ পরিবর্তন। আর তাদের সৃষ্টিশীল উদ্যোগকে জনগণের নিকটবর্তী করা। এই পরিবর্তনে তারা শ্রেণীসংগ্রামে বিশ্বাসী ছিলেন এবং শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন।[১২৯]

তাঁর সাংস্কৃতিক কর্মপ্রয়াসেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। তিনি সম্পৃক্ত হয়েছিলেন নানা সাংস্কৃতিক উদ্যোগে। তাঁর সমাজবাদী মনের প্রাণময় প্রকাশ ঘটেছে এসব কর্মতৎপরতায়। নিম্নে কালানুক্রমে এসবের বিবরণ প্রদত্ত হলো–

সুরবাণী

চট্টগ্রাম এনায়েত বাজারে অলক চ্যাটার্জি প্রতিষ্ঠা করেন সঙ্গীত বিদ্যাপীঠ· 'সুরবাণী' (১৯৪৪)। চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী সঙ্গীত বিদ্যাপীঠ আর্য সঙ্গীত ও সঙ্গীত পরিষদের বাইরে এটি ছিল তখনকার নবীন শিল্পীদের প্রাণবন্ত সংগঠন। সুরবাণীর উদ্যোগে মিশর কুমারী, শ্যামা এবং চিত্রাঙ্গদা মঞ্চস্থ হয়। সুরবাণী থেকে অনেক প্রতিভাধর শিল্পী বেরিয়ে এসেছিল, বেরিয়ে এসেছিল সুচরিত চৌধুরীর মতো বংশীবাদক। এই সংগঠনের সঙ্গে এর বংশীপ্রশিক্ষক সেন্টু মাহবুব উল আলম চৌধুরীকে যুক্ত করে দেন। স্মৃতিচারণ করে তিনি লিখেছেন,

> এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে জীবনে সর্বপ্রথম সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মে ব্যস্ত হয়ে উঠি। নৃত্য-নাট্যসমূহ মঞ্চস্থ করার ব্যাপারে পরিশ্রম করি। শিল্পীদের আনা-নেয়ার ব্যাপারে কাজ করি। তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হই। পরবর্তীতে চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে গিয়ে আমার এই প্রাথমিক অভিজ্ঞতা খুবই কাজে লেগেছিল।[১৩০]

ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, চট্টগ্রাম শাখা

কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সংস্রবের সূত্রে মাহবুব উল আলম চৌধুরী সম্পৃক্ত ছিলেন প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের কর্মী ও শিল্পী খালেদ চৌধুরীর উপস্থিতিতে ১৯৪৪ সালে গণনাট্য সংঘের চট্টগ্রাম শাখা গঠিত হয়। মাহবুব উল আলম চৌধুরীকে আহ্বায়ক করে কমিটিতে ছিলেন বাদল দাশ, বঙ্কিম সেন, তেজেন সেন, মলয় ঘোষ দস্তিদার, রুনু বিশ্বাস।[১৩১] ১৯৪৫ সালে কলকাতার মোহাম্মদ আলী পার্কে ফ্যাসিবাদবিরোধী শিল্পী, লেখক সম্মেলনের তৃতীয় বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। ওই সম্মেলনে যোগ দিতে বোম্বে থেকে এসেছিলেন খাজা আহমদ আব্বাস, কৃষণ চন্দর, মূলক রাজানন্দ। মাহবুব উল আলম চৌধুরী চট্টগ্রাম প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের সহকারী সম্পাদক হিসেবে রমেশ শীলদের সঙ্গে নিয়ে সম্মেলনে যোগ দেন।[১৩২]

রবীন্দ্রজয়ন্তী

১৯৪৪ সালে চট্টগ্রামের জেলা জজ শৈবাল গুপ্ত এবং তাঁর স্ত্রী অশোকা গুপ্তের প্রেরণায় মাহবুব উল আলম চৌধুরী ও তাঁর বন্ধুরা সেন্ট প্লেসিড স্কুল হলে চট্টগ্রামে সর্বপ্রথম রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করেন। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য 'শ্যামা' অভিনীত হয়। খুরশীদ মহলের তিনতলায় রবীন্দ্রজয়ন্তীর গান এবং নাচের মহড়া চলত। এভাবে খুরশীদ মহলের তিনতলা চট্টগ্রামের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে ওঠে।[১৩৩]

আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ জয়ন্তী

১৯৪৫ সালে চট্টগ্রাম মুসলিম হল প্রাঙ্গণে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের জয়ন্তী পালিত হয়। অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসেন হবিবুল্লাহ বাহার, আজাদ পত্রিকার বার্তা সম্পাদক মোহাম্মদ মোদাব্বের, বিশিষ্ট লেখক রবিউদ্দীন উদ্দীন আহমদ প্রমুখ। জয়ন্তী

উপলক্ষে সাহিত্য বিশারদের সঙ্গে পরিচয় ঘটে ও সম্পর্ক রচিত হয় মধ্যযুগের কবি আলাওল, দৌলত কাজী সম্পর্কে জ্ঞাত হন। এছাড়াও নানা অনুষ্ঠানে সাহিত্যবিশারদের সংস্পর্শে আসেন।[১৩৪]

নজরুল জয়ন্তী

১৯৪৬ সালে দাঙ্গা চট্টগ্রামে ছড়িয়ে পরার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দেয়। দাঙ্গার বিরুদ্ধে সরাসরি মুখোমুখি হতে পারা অসম্ভব চিন্তা করে নজরুলকে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রতীক হিসেবে নজরুলজয়ন্তী উৎসবের প্রস্তুতি নেওয়া হয়। সকল দলমতের শিল্পী-সাহিত্যিক এবং সামাজিক নেতাদের এক সভায় অধ্যাপক আবুল ফজলকে সভাপতি এবং মাহবুব উল আলম চৌধুরীকে সম্পাদক করে একশ'জনের একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির উদ্দেশ্য ছিল নজরুলকে সামনে এনে তাঁর গান এবং কবিতার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক চেতনার উন্মেষ ঘটানো এবং দাঙ্গার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি। স্মৃতিচারণে লিখেছেন,

> গান-নাচ এবং আবৃত্তি প্রোগ্রাম এমনভাবে সাজিয়েছিলাম, যাতে এর প্রভাবে শ্রোতারা দাঙ্গার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার প্রেরণা লাভ করে। অনুষ্ঠানটিকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করি। প্রথমটি পালন করি সেন্ট প্লেসিড স্কুল হলে, দ্বিতীয়টি জে এম সেন হলের মাঠে। জে এম সেন হল মাঠে অনুষ্ঠানটি করতে বিপুল সংখ্যক জনসাধারণ এই অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ পায়। অনুষ্ঠান শেষে আমরা এক বিশাল মিছিল বের করি।[১৩৫]

কবি সমিতি

১৯৪৫ সালে চট্টগ্রামে প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলনের সময় পার্টির সংস্কৃতি ফ্রন্টের নেতা কমরেড বঙ্কিম সেনের উদ্যোগে রমেশ শীলকে সভাপতি এবং ধীরেন্দ্র চন্দ্র সেনকে সম্পাদক করে কবিয়াল সমিতি গঠন করা হয়। রণদীভের ভ্রান্তকারী নীতির ফলে এই সমিতি ভেঙে যায়। পরবর্তীকালে মাহবুব উল আলম চৌধুরীর নেতৃত্বে রমেশ শীলকে সভাপতি এবং রাই গোপালকে সম্পাদক করে কবি সমিতি গঠিত হয়। এর অন্তর্গত কবিরা সমিতির নিয়মকানুন মেনে চলতো। প্রধান শর্ত ছিল কেউ অশ্লীল গান করবে না, সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেবে না।[১৩৬]

সংস্কৃতি বৈঠক

১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় সংস্কৃতি বৈঠক। সংস্কৃতির সঙ্গে যাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তারা সাংস্কৃতিক জীবনের তাগিদ থেকে একটি বৈঠকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলেন। দেশভাগ-উত্তরকালে প্রগতিশীল সংস্কৃতির যে ধারা তৈরি হতে যাচ্ছিলো, সংস্কৃতি সম্পর্কে কতিপয় শিল্পী-সাহিত্যিকের মধ্যে যে মতৈক্য সৃষ্টি হয়েছিল, তাদের ঐক্যবদ্ধতা ও মতবিনিময়ের জন্য একটি পরিসরের দরকার হয়ে পড়ে। ননী সেনগুপ্ত ও গোপাল

বিশ্বাসের গৃহে এবং মিউনিসিপ্যাল হলে কয়েকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে যোগ দেন আবুল ফজল, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, ওহীদুল আলম, শুভাশীষ চৌধুরী, মাহবুব উল আলম চৌধুরী, শওকত ওসমান, সুচরিত চৌধুরী, আহমদুল কবির, সানাউল হক প্রমুখ। এ প্রসঙ্গে এবনে গোলাম নবী লিখেছেন, 'এখন সবারই চিন্তা এই সমাবেশকে কী করে চিরস্থায়ী করা যায়। যে প্রচেষ্টা এই সমাবেশের মূলে সেই প্রচেষ্টাই চিরস্থায়ীর পথ প্রশস্ত করবে। এক সুন্দর মিলিত সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।'[১৩৭] সংস্কৃতি বৈঠকের 'এর কোনো নিয়মকানুন ছিল না। প্রগতি গোষ্ঠী ও সাহিত্য সংঘ যখন সরকারের হামলায় ভেঙে গেল তখন সমস্ত প্রগতিশীল শিল্পী সাহিত্যিকরা এই সাংস্কৃতিক বৈঠকে এসে জমায়েত হলেন। তখন এনায়েত বাজারে, 'সাগীর মঞ্জিল'এর সামনে একটা বেড়ার ঘর ছিল। সেই ঘরে খুরশীদ মহলের শ'খানেক পরিত্যক্ত চেয়ার ছিল। সেখানে প্রতি সপ্তাহে চট্টগ্রামের শিল্পী-সাহিত্যিকরা সমবেত হতেন– তাদের নিজেদের লেখা গল্প, কবিতা, পাঠ করতেন।'[১৩৮] সংস্কৃতি বৈঠকের তাৎপর্য সম্পর্কে সায়ীদুল হাসান লিখেছেন,

> সচেতন শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যতীত সংস্কৃতির পূর্ণ উৎকর্ষ সাধন সম্ভব নয়। এছাড়া এ ধরনের বৈঠক নূতন লেখকদের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করতে সাহায্য করে ও তাদের উৎসাহ দেয়।..এছাড়া যুদ্ধবিরোধী শান্তিকামী, মোহাজের সমস্যা, দাঙ্গা বিরোধী ইত্যাদি বিভিন্ন মুখ্য লেখার অনেক দৃষ্টান্ত আমরা পেয়েছি এই সংস্কৃতি বৈঠকে। এসব কারণে আমরা সংস্কৃতি বৈঠক ভবিষ্যত সম্পর্কে অত্যন্ত আশাপ্রদ।[১৩৯]

এই পটভূমিতে উপলব্ধি করা যায়, নিছক আড্ডা কিংবা সাহিত্য সম্মিলনের মাঝে সংস্কৃতি বৈঠকের আবেদন শেষ হয়ে যায়নি। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে সমকালীন সমস্যা ও সংকট নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা ছিল এর বৈশিষ্ট্য। এভাবে সংস্কৃতি বৈঠকের ডালপালা নানাভাবে বিস্তৃত ছিল। আগাগোড়া মাহবুব উল আলম চৌধুরী সাংগঠনিক তৎপরতায় ব্যাপৃত ছিলেন।[১৪০]

প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ

পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে গড়ে ওঠে প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ। সংগঠনের মূল লক্ষ্য ছিল পাকিস্তান সরকার কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ, নির্যাতন, নিপীড়ন ও শোষণের বিরোধিতা এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পক্ষে জনমত গঠন।[১৪১] প্রান্তিক সঙ্গীত ও নাটক নিয়ে যাকে বলে 'পিপলস কালচার'– তা শুরু করে। এর মধ্যে ছিলেন রমেশ শীল।[১৪২] সংগঠনটি চট্টগ্রাম শহরে ও গ্রামে গণসঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে নাটকের ক্ষেত্রে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের অনুকরণে একটি বিশেষ ধারা প্রবর্তন করে। সংগঠনের সঙ্গে অন্যান্যের যুক্ত ছিলেন কলিম শরাফী, চিরঞ্জীব দাসশর্মা, অচিন্ত্য কুমার চক্রবর্তী, নির্মল মিত্র, হরিপ্রসন্ন পাল, দীননাথ সেন, গোপাল বিশ্বাস, মাহবুব হাসান, রমেশ মজুমদার, স্নেহময় রক্ষিত, এম এ সামাদ, এ জি নবী, এস এ জামান প্রমুখ সংস্কৃতিকর্মী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। মূল নেতৃত্বে ছিলেন মাহবুব উল আলম চৌধুরী। এ সম্পর্কে ননী দত্ত লিখেছেন,

> পঞ্চাশের দশকে প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ নামে যে সাংস্কৃতিক সংগঠন পূর্ব পাকিস্তানে গণমানুষকে গণসঙ্গীতের মাধ্যমে সচেতন করে তোলার উদ্যোগ হাতে নিয়েছিল, সেই সংগঠনের নেতৃত্বে ছিলেন মাহবুবদা। তাঁর বিপুল উৎসাহ, উদ্দীপনা ও প্রেরণায় আমরা এতে অংশগ্রহণ করি।[১৪৩]

প্রান্তিকের সংস্কৃতি চর্চার ভিন্ন একটি তাৎপর্যও রয়েছে। নাটকের নারী চরিত্রে তখন পর্যন্ত কোনো মহিলা শিল্পীকে মঞ্চে আনা সম্ভব হয়নি। প্রান্তিক সংগঠিত হওয়ার পর ১৯৫১ সালে এ অচলায়তন ভাঙ্গা সম্ভব হয়। দু'জন নারীশিল্পী কামেলা খান মজলিশ ও মনি ইমাম 'জবানবন্দী' নাটকে মঞ্চে অভিনয় করলেন। তৎকালীন বাস্তবতায় সৌখিন নারী শিল্পীর এটি প্রথম মঞ্চাবতরণ।[১৪৪] প্রান্তিকের উন্মেষ ও তাৎপর্য নিয়ে মাহবুব হাসানের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য,

> প্রান্তিক-এর গণসঙ্গীতের দল সাধারণ মানুষের কাছ অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল আর তাই গ্রামে গ্রামে সঙ্গীত পরিবেশনের ডাক আসতে শুরু করলো। চট্টগ্রামের বাইরেও 'প্রান্তিক'এর নাম ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। ফলে ১৯৫২ সালে কুমিল্লায় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলনে' প্রান্তিক অংশগ্রহণ করলো। ১৯৫৪ সালে ঢাকার কার্জন হলে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন'এ প্রান্তিক যোগদান করে ফিরে এলো অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়ে।[১৪৫]

নজরুল নিয়াময় সমিতি

১৯৪১ সালে নজরুল অসুস্থ হয়ে কিছুদিন পর বাকশক্তি হারান। ১৯৫২ সালে মাহবুব উল আলম চৌধুরী কলকাতার বন্ধু রবিউদ্দীনকে সঙ্গে নিয়ে অসুস্থ নজরুলকে দেখতে যান। ইতোমধ্যে নজরুলের সুচিকিৎসার উদ্দেশ্যে নজরুল নিরাময় সমিতি গঠন করা হয়। রবিউদ্দীনকে সঙ্গে নিয়ে কমিটির সদস্য কাজী আবদুল ওদুদের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেন এবং নজরুলকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠাবার ব্যাপারে আলোচনা করেন। ফিরে এসে চট্টগ্রামে গঠন করেন নজরুল নিরাময় সমিতি। এস এ জামান, আহমদুল কবির, ফজলুল হক, বদিউস সালাম, কবীর চৌধুরী, শওকত ওসমান, তারাপদ ঘোষ এবং অন্যান্যের সহযোগিতায় প্রায় সতের হাজার টাকার তহবিল গঠন করে সমুদয় অর্থ রবিউদ্দীনকে দিয়ে কাজী আবদুল ওদুদের কাছে পাঠানো হয়। রবিউদ্দীন নজরুল, কবি-পত্নী, ছেলে অনিরুদ্ধ, সেবিকা লতিফা ঘোষকে নিয়ে ভিয়েনায় যান। সেখানে Dr. Hanshoff জানান দেরি হয়ে যাওয়ায় নজরুলকে আর সুস্থ জীবন ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়।[১৪৬]

কৃষ্টি কেন্দ্র

১৯৫৪ সালে পাকিস্তান সরকার ৯২ (ক) ধারা জারি করলে প্রান্তিকের কর্মীদের উপরে নেমে আসে সরকারী দমননীতি। তবু প্রান্তিককে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু অধিকাংশ সদস্য তাতে সায় না দেওয়ায় প্রতিকূল পরিস্থিতিতে 'কৃষ্টি কেন্দ্র' নামে সংগঠন

চালুর প্রয়াস নেয়া হয়; সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন আবুল ফজল ও আবুল হাসনাত। কৃষ্টি কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রকাশিত 'কৃষ্টি' স্মরণিকায় 'কৃষ্টিকেন্দ্র প্রসঙ্গে' অধ্যাপক আবুল ফজল যা লিখেছিলেন তাতে কৃষ্টির প্রতিষ্ঠার পটভূমি এবং প্রেক্ষাপট স্পষ্ট হয়েছে। তিনি লিখেছেন,

> যতটুকু সম্ভব অনুকূল পরিবেশ রচনা ও তরুণ শিল্প-সেবীদের জন্য শিল্পচর্চার একটুখানি সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা সংক্ষেপে কৃষ্টি কেন্দ্রের এই লক্ষ্য। বলা বাহুল্য আমাদের তরুণ কর্মীদের সাধ যতখানি সাধ্য ততটুকু নয়, তবুও একেবারে নিশ্চেষ্ট না থেকে তাঁরা এগিয়ে এসেছেন সংস্কৃতি-সেবীদের একটুখানি সামনের দিকে এগিয়ে দেওয়ার জন্য- কলাশিল্পের পথে পা ফেলার রচনার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে। সংকল্প যদি হয় দৃঢ়, এই পথই হয়ত একদিন আজকের অবহেলিত ও উপেক্ষিত সংস্কৃতি-সেবীদের এক নতুন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিতে সক্ষম হবে।[১৪৭]

কৃষ্টি কেন্দ্রে সাহিত্য, সঙ্গীত ও নাট্য বিভাগ খোলা হয়। সাহিত্য আসরে যোগ দিতেন শওকত ওসমান, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, আবুল ফজল, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, সুচরিত চৌধুরী প্রমুখ।[১৪৮] কৃষ্টি কেন্দ্র ছিল প্রান্তিকের নতুন সংস্করণ। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পূর্বঐতিহ্যের ধারায় কাজ করা সম্ভব হয়নি। তখন কৃষ্টি কেন্দ্র সংস্কৃতি জগতে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। এর সাংগঠনিক কাজে মাহবুব উল আলম চৌধুরী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

চট্টগ্রাম সাহিত্য পরিষদ

১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারির পর কৃষ্টিকেন্দ্র বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে মাহবুব উল আলম চৌধুরী একটি অরাজনৈতিক সাহিত্য সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। জওশন আরা রহমান লিখেছেন, এই মর্মে, আড্ডা শেষে একদিন মুহম্মদ ইউনুসের সাথে মাহবুব উল আলম চৌধুরী দীর্ঘ আলোচনা করেন। তিনিও রাজি হলেন। আবুল ফজলকে সভাপতি এবং মুহাম্মদ ইউনূসকে সম্পাদক করে গঠিত হয় চট্টগ্রাম সাহিত্য পরিষদ। এর সকল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের রিহার্সেল মাহবুব উল আলম চৌধুরীর বাসাতেই হতো। এই পরিষদের উদ্যোগে গঠিত হয় রমেশ শীল সংবর্ধনা সংসদ। এরও সম্পাদক ছিলেন মুহাম্মদ ইউনূস। ১৯৬৪ সালে ১০ এপ্রিল মুসলিম ইসস্টিটিউটে প্রবাদপ্রতিম কবিয়াল রমেশ শীলকে সংবর্ধনা দেয়া হয়। এই উপলক্ষে মাহবুব উল আলম চৌধুরীর সম্পাদনায় সংবর্ধনা সংসদের পক্ষ থেকে 'লোকগীতি' নামে রমেশ শীলের গান এবং ছড়া সংবলিত ১১৮ পৃষ্ঠায় একটি সংকলন প্রকাশ করা হয়। এসব কর্মকাণ্ডে মাহবুব উল আলম চৌধুরীর ছিল সক্রিয় ভূমিকা।[১৪৯]

আবুল ফজল হীরক জয়ন্তী

১৯৫৯ সালের ১ জানুয়ারি আবুল ফজল সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এ উপলক্ষে সুধীজন ও প্রান্তিকের পুরোনো কর্মীদের উপস্থিতিতে আবদুস সোবহান

চৌধুরীকে সভাপতি ও মাহবুব উল আলম চৌধুরীকে সম্পাদক করে সংবর্ধনা-অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা বের হয়। ১৯৬৩ সালে আবুল ফজলের ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে তাঁর হীরক জয়ন্তী পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সংবর্ধনা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন চট্টগ্রাম কলেজের বাংলার অধ্যাপক আহমদ হোসেন এবং মাহবুব উল আলম চৌধুরী। সংবর্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যক্ষ আবু রুশদ মতিনউদ্দিন। উদ্বোধন করেছিলেন পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ইমাম হোসেন চৌধুরী। সম্মেলনে উপস্থিত সংবর্ধনা ও হীরক জয়ন্তীর মানপত্রের লেখক ও উপস্থাপক ছিলেন মাহবুব উল আলম চৌধুরী। উভয় প্রয়াসে তিনি নেতৃভূমিকা পালন করেন।[১৫০]

নববর্ষ উদযাপন পরিষদ

মাহবুব উল আলম চৌধুরী সংস্কৃতির মধ্যে আনন্দ খুঁজে নিয়েছেন, ঘটিয়েছেন মনের উৎকর্ষ ও শুদ্ধি। এ জন্যে যত প্রতিকূলতাই আসুক তিনি সেখান থেকে নিবৃত্ত হননি। খান শামসুর রহমানকে সভাপতি এবং মাহবুব উল আলম চৌধুরীকে সম্পাদক করে ব্যাপক ভিত্তিতে নববর্ষ উদযপানের লক্ষ্যে গঠিত হয় নববর্ষ উদযাপন সংসদ। সংসদের প্রথম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান উদযাপন হয় ১৯৬৭ সালে। উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. এ. আর মল্লিক। এতে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও অতুল প্রসাদের গান এবং গণসঙ্গীতসহ মোট ত্রিশটি গান পরিবেশিত হয়। গেয়েছিলেন ননী দত্ত, হরি প্রসন্ন পাল, প্রণোদিত বড়ুয়া, চমন আফরোজ, শেফালী ঘোষ, শিখারাণী দাশ, সাফিনা মাহবুব মুন্নি। এরপর শুরু হয় চিরঞ্জীব দাশ শর্মার পরিচালনায় 'এসো হে বৈশাখ' গীতিনকশা। কৃষকদের ফসল তোলার আনন্দের ওপর ভিত্তি করে রচিত নৃত্যনাট্য 'সোনালি ফসল' মঞ্চস্থ হয়। এই সংসদের উদ্যোগে প্রতি বছর পয়লা বৈশাখ উদযাপিত হয়। শেষবারের মতো হয় ১৯৭০ সালে।[১৫১]

মাহবুব উল আলম চৌধুরী ছিলেন সংস্কৃতিসাধক। অল্পবয়স থেকে সংস্কৃতিসাধনার যে মন্ত্র পাঠ করেছিলেন আমৃত্যু তা অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করেন। সংস্কৃতির চর্চার মধ্যে প্রভূত আনন্দ পেতেন এবং এর মধ্য সমাজ পরিবর্তনে প্রয়াসী দিলেন। এ সম্পর্কে আনিসুজ্জামানের অভিমত,

> প্রথম যৌবনে মাহবুব উল আলম চৌধুরী আকৃষ্ট হয়েছিলেন বামপন্থী রাজনীতির দিকে। সে রাজনীতি তাঁর সামাজিক-সাংস্কৃতিক চেতনাকেও গভীরভাবে উদ্দীপ্ত করেছিল। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ফ্যাসিবাদ, দেশীয় ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতা ছিল তাঁর জীবনবোধের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সাম্যবাদী সমাজ গঠনের স্বপ্ন ছিল তাঁর চোখে। ভেবেছিলেন, সেই স্বপ্ন অর্জনের জন্যে সংস্কৃতি হবে হাতিয়ার।[১৫২]

সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ভূমিকা

পঞ্চাশের দশকে পূর্ববাংলায় বেশ কয়েকটি সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ববাংলার সংস্কৃতির স্বরূপ উন্মোচনে সম্মেলনগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কয়েকটি সম্মেলনে সংগঠক, অন্যগুলিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে মাহবুব উল আলম চৌধুরী পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনে খ্যাতি লাভ করেন রাজনৈতিক সংগ্রাম, 'সীমান্ত' পত্রিকা সম্পাদনা ও সাংস্কৃতিক কর্মপ্রয়াসের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে যে ভিত্তি তৈরি করেছিলেন সাংস্কৃতিক সম্মেলনে তারই নির্যাস যেন ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন দেশজুড়ে। এখানে কালানুক্রমে সম্মেলনসমূহের সংক্ষিপ্তসার এবং প্রসঙ্গক্রমে তাঁর সম্পৃক্ততা ও ভূমিকা তুলে ধরা হলো–

পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন চট্টগ্রাম ১৯৫১

সংস্কৃতি পরিষদ ও প্রান্তিকের উদ্যোগে চট্টগ্রামে ১৯৫১ সালে ১৬-১৯ মার্চ হরিখোলা মাঠে অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক আবুল ফজল ও সায়ীদুল হাসান; সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুব উল আলম চৌধুরী, অফিস সম্পাদক চৌধুরী হারুনুর রশীদ।[১৫৩] বাঙলার শিল্পী সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীদের সম্মেলনে যোগদান ও তাকে সাফল্যমণ্ডিত করার উদ্দেশ্য একটি বিবৃতির মাধ্যমে আবেদন জানান। এই আবেদন প্রসঙ্গ বিবৃতিতে তাঁরা বলেন,

> পাকিস্তানের শিল্পী সাহিত্যিক এবং সংস্কৃতিসেবীদের একত্রিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যের পেছনে যে তাগিদ অনুভব করেছি, আমাদের বিশ্বাস কল্যাণকামী পাকিস্তানের সকল সংস্কৃতিসেবীদের, বিচ্ছিন্নভাবে হলেও, অন্তরে একই তাগিদ রয়েছে।
>
> আমাদের যে সুপ্রাচীন ও সুমহান সংস্কৃতি আলাওল, দৌলত কাজীর কাব্য-সুষমা থেকে শুরু করে, ভাটিয়ালী, বাউল, কীর্তন এবং সুফী দরবেশের সঙ্গীত ধারায় সিঞ্চিত হয়ে, গ্রাম্যগাথা এবং লোকসংস্কৃতির প্রাণরসে বেড়ে উঠেছিল, যে ধারার ছায়ায় জন্ম রবীন্দ্রনাথ, নজরুল প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত কবি সাহিত্যিকদের– তারই ঐতিহ্য বহনকারী উত্তরাধিকারী আমরা।[১৫৪]

সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও পটভূমি সম্পর্কে বলা হয়,

> দারিদ্র্য, মহামারী, দাঙ্গা, যুদ্ধের বিভীষিকার বিরুদ্ধে লড়াই করে বাস করতে হচ্ছে জীবনের অধিকাংশ সময়। অথচ বৃহত্তর জনতাকে বাদ দিয়ে সাংস্কৃতিক উন্নতির কথা ভাবতে যাওয়া কল্পনা-বিলাস মাত্র। বৃহত্তর জনতার জীবনে নিরাপত্তা, শান্তি, প্রাচুর্য চাই। সংস্কৃতিকে নিয়ে আজ ছিনিমিনি খেলা চলছে। বৃহত্তর জনতার মাতৃভাষাকে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করবারও আয়োজন চলছে পুরোমাত্রায়।... বৃহত্তর জনতাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অজ্ঞতার অন্ধকারে, মৃত্যুর অতল গহ্বরে। জনতার বিবেকের প্রতিনিধি বলেই শিল্পী সাহিত্যিকদের সংবেদনশীল মনে তুলেছে বিক্ষোভের তুফান।... কালের যাত্রাধ্বনিকে বজ্রকণ্ঠে

> ঘোষণা করতে শিল্পী-সাহিত্যিকরা কোনদিনই পিছপা হয়নি। আজকের শিল্পী-সাহিত্যিক-সংস্কৃতিসেবীরাও এগিয়ে এসেছে দৃঢ় পদক্ষেপে। তাই এই ঐতিহাসিক সম্মেলনের আয়োজন।[১৫৫]

ঢাকার মর্ণিং নিউজ, দৈনিক আজাদ সম্মেলন কমিউনিস্টদের উদযোগে হচ্ছে বলে প্রচারণা করলে ঢাকার অনেক সাহিত্যিক এতে অংশগ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন।[১৫৬]

সম্মেলনে মূল সভাপতি ছিলেন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, সুফিয়া কামাল প্রধান অতিথি। পশ্চিমবঙ্গের 'সত্যযুগ' পত্রিকার সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার অংশগ্রহণ করেন। মোতাহের হোসেন চৌধুরী 'কাব্যে সমাজচেতনা ও ঐতিহ্যবোধ', মোহাম্মদ ফেরদাউস খান 'মাতৃভাষার মর্যাদা' ও অন্যান্য প্রবন্ধকার প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। একটি চিত্র প্রদর্শনী ছিল। তাতে জয়নুল আবেদিন, সফিউদ্দিন আহমদ, কামরুল হাসান, আমিনুল ইসলাম প্রমুখের চিত্রকর্ম স্থান পায়। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বিভাগীয় কমিশনার এন এম খান। সলিল চৌধুরী ও ফরিদা হাসিন সঙ্গীত পরিবেশন করেন।[১৫৭] সিলেটের নওবেলাল পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদ আলী এবং আলাউদ্দিন আল আজাদসহ অনেক শিল্পী-সাহিত্যিক অংশগ্রহণ করেন।[১৫৮] মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, রমেশ শীল অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।[১৫৯] সম্মেলনে অভূতপূর্ব লোক সমাগম হয়েছিল। কীর্তন, রবীন্দ্রসঙ্গীত ও কবিগান সম্মেলনকে সফল করে তোলে। পূর্ব বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতি, ঐতিহ্য নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়।

উদ্বোধনী ভাষণে সাহিত্যবিশারদ বাঙালি সংস্কৃতির নানাদিক নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁর অভিভাষণের কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা যায়: 'ঐতিহ্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি ধ্রুব নক্ষত্র বিশেষ। ঐতিহ্যের অনুসরণ ও সেই স্রোতধারাকে চির-বহমান করিয়া তোলাই সংস্কৃতিসেবীর আসল কাজ।' 'ঐতিহ্যের প্রেম সাংস্কৃতিক সাধনার আসল সোপান। দেশের ইতিহাস এই জন্যই ভালরূপে জানা দরকার।' 'ভুলিয়া যাইবেন না অতীত আমাদের ভবিষ্যতের পথ প্রদর্শন করে। সেই আলোকে আমাদের বর্তমান নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। এই জন্য ঐতিহ্যের কথা বারবার স্মরণ করা দরকার।' 'ঐতিহ্য-হীন কোন কিছু গড়িতে গেলে আপনারা ভুল করিবেন। সাধনা পণ্ডশ্রম হইবে মাত্র। অথবা জাতীয় বিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়া দিবে।... ঐতিহ্য হইতে দূরে সরিয়া যাওয়ার অর্থ জীবন হইতে দূরে সরিয়া যাওয়া। জীবন হইতে দূরে সরিয়া যাওয়ার অর্থ পাঠশালার বালকও জানে মৃত্যু।'[১৬০]

সম্মেলনের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলা হয়,

> আজকের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ অতীতের গর্ভে নিহিত যা কিছু প্রগতির স্বপক্ষে, উজ্জ্বল আশার আলো যার মধ্যে থেকে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে তা নিয়ে শুরু হবে আমাদের শুভযাত্রা। অতীতের সংগে ভবিষ্যতের যোগসূত্র রচনা করে, বৃহত্তর জনতার বাস্তব জীবনকে ভালবেসে সমস্ত সৎবুদ্ধি সম্পন্ন, মানবতার পুজারী শিল্পী-সাহিত্যিকদের সংগে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমবেত প্রয়াস ও প্রচেষ্টা দিয়ে গড়ে তুলতে হবে নয়া শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতি।[১৬১]

সম্মেলনে মোট নয়টি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাবগুলির মধ্যে সম্মেলনের পুরো অবয়ব ফুটে ওঠে। প্রথমত: মানুষের কল্যাণ ও সামর্থ্যকে গতিশীলতার জন্য যে সাহিত্য তার প্রতি আশাবাদ ও আস্থা স্থাপন করে বলা হয় সে সাহিত্য হবে 'শোষণের বিরুদ্ধে, এক দেশের উপরে অন্য দেশের প্রভূত্বের বিরুদ্ধে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে, সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে'। দ্বিতীয়ত: শান্তির পক্ষ অবলম্বন করে বলা হয়, 'ভবিষ্যতে কোন যুদ্ধকেই আমরা বরদাস্ত করবো না'।

তৃতীয়ত: বাংলা ভাষার মূলে আঘাত ও মূলনীতি কমিটিতে বাংলার উপেক্ষার বিষয়টি উল্লেখ করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের কথা বলা হয়। চতুর্থত: সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরোধিতা করা হয়। পঞ্চমত: সংস্কৃতির মূল ভিত্তি শিক্ষা। তাই মাতৃভাষার মাধ্যমে জনশিক্ষার প্রসারে সরকারকে অনুরোধ জানানো হয়।

ষষ্ঠত: সংস্কৃতি বিকাশের লক্ষ্যে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করা হয় সপ্তমত: জাতিকে শিক্ষিত করে তোলার পাশাপাশি সভ্য করে গড়ে তোলার জন্য সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও ছাত্রদের সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার অংশ নেয়ার অধিকার ও সুযোগ প্রদানের প্রস্তাব করা হয়।[১৬২]

অষ্টমত: নজরুলের সুচিকিৎসার জন্য উভয় বাংলার সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। নবমত: প্রদেশব্যাপী একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।[১৬৩]

সম্মেলনের গুরুত্ব প্রসঙ্গে বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন,

> ১৯৫১ সালের চট্টগ্রাম সম্মেলনের উদ্যোক্তরা পূর্ব বাঙলায় একটি অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন গঠন করে তাকে বেগবান করার উদ্দেশ্যেই এই সম্মেলন আহবান করেছিলেন এবং সেই অনুযায়ী সম্মেলনের কর্মসূচিকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। এজন্যে এই সম্মেলনের বক্তব্য সমূহই যে শুধু তথাকথিত পাকিস্তানী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয়েছিলো তাই নয়, নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ অনেক ছাত্র-যুবকের সমাবেশও এতে ঘটেছিল।[১৬৪]

মাহবুব উল আলম চৌধুরী সম্মেলনের তাৎপর্য সম্পর্কে লিখেছেন,

> পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন, চট্টগ্রামের তথা পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াশীলতার ওপর দারুণ প্রভাব রেখে যায়। গণসঙ্গীত অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। প্রান্তিকের গানের 'স্কোয়াড' গ্রামে গ্রামে অনুষ্ঠান করে সাধারণ মানুষকে অধিকার সচেতন করে তোলার দায়িত্ব অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে পালন করতে থাকে।[১৬৫]

এ সম্মেলনের সঙ্গে মাহবুব উল আলম চৌধুরীর রয়েছে বিশেষ সম্পৃক্তি। তিনি এর উদ্যোক্তা, সংগঠক ও তাত্ত্বিকদের অন্যতম। তাঁর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়াসের যোগফল যেন এ সম্মেলন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর সংস্কৃতি সত্তার পূর্ণ প্রকাশ এই সম্মেলন।

পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন ১৯৫২ কুমিল্লা

১৯৫২ সালের ২২, ২৩ ও ২৪ আগস্ট প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রগতি মজলিসের উদ্যোগে পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ মনোনীত হন অধ্যাপক অজিতনাথ নন্দী, অধ্যাপক আবুল খায়ের আহমদ ও অধ্যাপক আশুতোষ চক্রবর্তী। বিশেষভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন অধ্যাপক আসহাবউদ্দীন আহমদ, জালালউদ্দীন সানু, ফয়েজউল্লাহ প্রমুখ। এ উদযোগে কুমিল্লার বিভিন্ন প্রগতিশীল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আন্তরিকভাবে এগিয়ে এসেছিলেন।[১৬৬]

এর আগের বছর চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক সম্মেলন এই সম্মেলনকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছিল। মাহবুব উল আলম চৌধুরী লিখেছেন,

> সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার লক্ষ্যে তারা আমাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। আমরা সম্মেলনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিই।' সম্মেলনের সার্বিক শৈলীর মধ্যেও চট্টগ্রামের প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট। এ সম্পর্কে তিনি আরও লিখেছেন, 'আসহাবউদ্দীন আহমদের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে প্রগতি মজলিসের কার্যালয়ে সম্মেলনের আর্থিক, সাংগঠনিক ব্যাপারে মজলিশের কর্মীদের সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা হয়। বিকেলে বৈঠক বসে পিডব্লিউডি'র নির্বাহী প্রকৌশলী সন্দ্বীপ নিবাসী রফিকুল হকের বাসায়। এখানে এলেন সানু, মফিজুল ইসলাম, আসহাবউদ্দীন আহমদ, আবুল খায়ের আহমদ, সালাহউদ্দীন, অজিত নন্দী, ফয়েজউল্লাহ ও ছদ্মবেশধারী বড় মিঞা।[১৬৭]

ভাষা আন্দোলনের আদর্শকে সমুন্নত রাখা, এদেশের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং সংস্কৃতি চর্চায় এদেশের শিল্পী ও সাহিত্যিকদের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার উদ্দেশ্য ছিল সম্মেলনের মূল প্রেরণা।

চট্টগ্রামের তুলনায় এ সম্মেলন ছিল ব্যাপক ও বিস্তৃত– কী অংশগ্রহণ, কী আলোচনা ও প্রণোদনায়। মাহবুব উল আলম অংশগ্রহণকারীদের চারটি ভাগে বিভক্ত করেছিলেন। গোষ্ঠী চারটি হচ্ছে কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও ঢাকা। চট্টগ্রাম গোষ্ঠীতে ছিল প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ ও রেলওয়ে শিল্পী সংঘ।

ঢাকা আর্ট স্কুল একটি চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন করে। এর দায়িত্বে ছিলেন শিল্পী কামরুল হাসান। আলী আহমদ স্বসংগৃহীত হস্তলিখিত পুঁথির প্রদর্শনী খুলেন।

সম্মেলনে প্রতিদিনের অনুষ্ঠান দুই পর্বে বিভক্ত ছিল। পূর্বাহ্ন ও অপরাহ্নে দুইটি সাহিত্যানুষ্ঠান হতো। এতে ছিল প্রবন্ধ পাঠ, কবিতা আবৃত্তি ও বক্তৃতা। দ্বিতীয় পর্বে সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

২২ আগস্ট সকালে সম্মেলন উদ্বোধন করেন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ আখতার হামিদ খান। পতাকা উত্তোলন করেন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। মূল সভাপতি হিসেবে সাহিত্যবিশারদের ভাষণ ছিল ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী। তিনি বলেছিলেন, 'মানুষের দেহ শুধু সচল নয়, তার মনও চঞ্চল ও গতিশীল। তাই মানুষ

চিরকাল পুরাতনকে বর্জন করিয়া নূতন কিছু অবলম্বন করিবার জন্য ব্যগ্র থাকিবে।' 'সংস্কৃতির জন্ম-প্রেরণা যেখান হইতেই আসুক না কেন, সংস্কৃতির উন্মেষ, বিকাশ ও প্রসার পরিবেশ-নিরপেক্ষ নহে। এই পরিবেশের প্রধান উপাদান ঐতিহ্য। ঐতিহ্য অস্বীকার করার অর্থ ভিত্তিকে অস্বীকার করা। মাটি ভিত্তি করিয়া তাজমহল দাঁড়াইয়া আছে। সেই মাটির গুরুত্ব অনেকখানি। ইহা ছাড়া তাজমহল তৈরি সম্ভব ছিল না। তেমনি ঐতিহ্য সম্পর্কহীন সংস্কৃতি সাধনাও অসম্ভব।' 'আজ প্রশ্ন উঠিয়াছে 'বাংলা আমাদের সংস্কৃতি ভাষা হইতে পারে না। আমাদের ধর্ম, ঈমান এই ভাষায় অটুট থাকিতে পারে না।' এই প্রশ্নের কোনো জবাব দেওয়া আমার কাছে লজ্জার ব্যাপার। বাদুড়ের ডানার ঝাপটায় চাঁদ কী মুখ কুণ্ঠিত করিয়া থাকে? না, চাঁদের মোকাবিলা করিতে আকাশ ছাড়িয়া নিচে নামিতে থাকে?' 'দেশের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের ছবি সম্মুখে থাকিলেই শুধু জীবনবোধ জাগ্রত হইতে পারে। এই পথে অগ্রসর হইতে হইলে দেশের ও মানুষের ইতিহাস জানা দরকার। এক কথায় স্বদেশ-প্রেমের মালা গাঁথিয়া গলায় পরা আবশ্যক।'

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে অংশগ্রহণ করেন মাহবুব উল আলম, খান সারওয়ার মুরশিদ, কাজী মোতাহার হোসেন, সুফিয়া কামাল, জসীমউদ্‌দীন, আহমদ শরীফ, মুস্ত াফা নূরউল ইসলাম, আনিসুজ্জামান প্রমুখ। চট্টগ্রামের অংশগ্রহণ সম্পর্কে মাহবুব উল আলম চৌধুরী লিখেছেন,

> চট্টগ্রাম থেকে বিরাট বাহিনী নিয়ে আমরা সম্মেলনের একদিন কি দু'দিন আগে কুমিল্লায় পৌঁছি। আমাদের মাথার মুকুট হিসেবে শোভা পাচ্ছিল অশীতিপর আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, দ্যুতিময় কথাশিল্পী মাহবুব উল আলম, আমাদের অগতির গতি কবীর চৌধুরী। সৈয়দ মোতাহের হোসেন চৌধুরীর বাড়ি কুমিল্লায়। তিনি সপ্তাহখানেক আগে কুমিল্লায় এসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।[১৬৮]

সম্মেলনে চট্টগ্রাম-দলের মধ্যে প্রবন্ধ পাঠ করেন মাহবুব উল আলম চৌধুরী: সমাজ ও সাহিত্য, গোপাল বিশ্বাস: সমালোচনা সাহিত্য, সুচরিত চৌধুরী: পরিহাস এবং রুহুল আমিন নিজামী: চলচ্চিত্র শিল্প। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে নজরুল সঙ্গীতের আসর উদ্বোধন করেন মাহবুব উল আলম চৌধুরী। তৃতীয় দিনের লোকসঙ্গীত ও গণসঙ্গীতের আসরে প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ চট্টগ্রামী ভাষায় রচিত লোকগীতি পরিবেশন করে। সুচরিত চৌধুরী বাঁশি বাজিয়ে শোনান। কবিয়াল রমেশ শীল 'যুদ্ধ বনাম শান্তি' পালা গাইলেন। তিনি নেন যুদ্ধের পক্ষ, তাঁর শিষ্য রায় গোপাল শান্তির পক্ষ। সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন প্রান্তিকের চিরঞ্জীব দাশশর্মা। এ দলে আরও ছিলেন অচিন্ত্য কুমার চক্রবর্তী, রমেন মজুমদার, স্নেহময় রক্ষিত, নির্মল মিত্র, এ কে মান্নান, মাহবুব হাসান, মহিউল ইসলাম, আমিনুল ইসলাম, নাসির উদ্দীন আহমদ, আবু মোহাম্মদ শাহাবুদ্দীন। সম্মেলনে এঁরা অনেক গান করেন। লোকসংস্কৃতির আসরে এঁরা চট্টগ্রামী ভাষায় যে গানটি করেন এবং যা বিশেষ জনপ্রিয় হয়, সেটির রচয়িতা মাহবুব উল আলম চৌধুরী। চট্টগ্রামের ইস্ট এন্ড ক্লাব পরিবেশন করে সুচরিত চৌধুরীর নাটিকা 'পার্কের কোণে'।

এভাবে চট্টগ্রামের অংশগ্রহণ সম্মেলনকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিল। সম্মেলনে মাহবুব উল আলম চৌধুরী নেতৃভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

লোকসংস্কৃতি সম্মেলন ১৯৫৩

প্রান্তিক ও কবি সমিতির যৌথ উদ্যোগে ১৯৫৩ সালের ১৭ ও ১৮ এপ্রিল জে এম সেন হল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় চট্টগ্রাম জেলা লোকসংস্কৃতি সম্মেলন। সম্মেলন কমিটির সভাপতি ছিলেন রমেশ শীল, অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি কথাশিল্পী মাহবুব উল আলম। নুরুল ইসলাম ও কলিম শরাফী ছিলেন যুগ্ম সম্পাদক। মাহবুব উল আলম চৌধুরী ছিলেন যুগ্ম সম্পাদক।[১৬৯]

সম্মেলনে কবিয়াল রমেশ শীল, ফনী বড়ুয়ার সঙ্গে পূর্ববাংলার অন্যান্য অঞ্চল থেকে অনেক লোকশিল্পী অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র সিংহ তথ্যমূলক ও তত্ত্বসংবলিত ভাষণ দিয়েছিলেন। উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন মাহবুব উল আলম চৌধুরী।[১৭০] প্রান্তিক সম্পর্কে কথাশিল্পী মাহবুব উল আলমের পর্যবেক্ষণ, 'তাঁদের কাজ হলো গণচিত্তে প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অসন্তোষের আগুন ধরিয়ে দেয়া। তাঁদের প্রধান টার্গেট হলো প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা।'[১৭১] অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণে মাহবুব উল আলম বলেছিলেন,

> এই নূতন সংস্থা গড়ে উঠতে পারে এক মাত্র সমবায়কে ভিত্তি করে। এই জন্য প্রয়োজন ব্যক্তি চরিত্রের উৎকর্ষের এবং সমাজ-বোধের। এই দিকে লোক-সংগীত কিছু কিছু কাজ শুরু করেছেন। তার মধ্যে বৃদ্ধ কবিয়াল রমেশ শীল সহজেই লক্ষ্য-যোগ্য। কিন্তু, এর সঙ্গে যোগ হওয়া চাই একটা সংগঠনী প্রতিভার। আপনাদের সাহচর্য্য তাঁহাদিগকে নূতন প্রেরণা যোগাবে– এটাই আমাদের আশা।[১৭২]

মাহবুব উল আলম চৌধুরী স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন, 'তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোককবি এবং লোকশিল্পী এসেছিলেন সম্মেলনে যোগ দিতে। কুষ্টিয়া থেকে একটি বাউল সম্প্রদায় এসেছিল বাউল গান পরিবেশন করতে। সিলেট এবং ময়মনসিংহের দুইজন লোককবি খুব সুন্দর গান করেছিলেন। সিলেটের কবি, যার নাম মনে আসছে না। তার গানের একটি পদ আমার এখনো মনে আছে : 'কলে চিপ দিলে উইড়া চলে কোম্পানির জাহাজ।'[১৭৩] লোকসংস্কৃতি সম্মেলনের মাধ্যমে গণসংস্কৃতিকে তুলে ধরাই ছিল প্রান্তিকের মূল লক্ষ্য।

পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন, ঢাকা ১৯৫৪

১৯৫৩ সালের শেষ দিকে মুসলিমলীগের বিরুদ্ধে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির নির্বাচনী জোট 'যুক্তফ্রন্ট' গঠিত হয়। পূর্ববাংলার সংস্কৃতিকর্মিরাও ঐক্যবদ্ধভাবে সাংস্কৃতিক সম্মেলনে উদযোগী হন।[১৭৪] ইতোমধ্যে '৫৪তে যুক্তফ্রন্টের নিরঙ্কুশ বিজয় এবং পূর্ববাংলায় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের প্রধান ভূমিকা

সত্ত্বেও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও সংবাদপত্র প্রতিনিধিবৃন্দ উদ্যোগী হয়ে ২৩-২৬ এপ্রিল সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করে। অধ্যক্ষ আবদুর রহমান খানকে সভাপতি, আবু জাফর শামসুদ্দীন ও আবদুল গণি হাজারীকে যুগ্ম সম্পাদক এবং ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই প্রমুখ ১৮জনকে সদস্য করে একটি কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়।

কার্জন হলে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে প্রদেশের বিভিন্ন জেলা এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে পাঁচশত প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলন উদ্বোধন করেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সভাপতিত্ব করেন আবদুল গফুর সিদ্দিকী।

সম্মেলনের বিভিন্ন দিন বিভিন্ন পর্যায়ে ছিল আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রদর্শনী ও মুশায়েরা। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। বিভিন্ন দিনে গণসঙ্গীত, লোকসংগীত ও লোক নৃত্য, ছায়া নাটিকা, রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নজরুলগীতির অনুষ্ঠান হয় এবং একাধিক নাটক মঞ্চস্থ হয়। তাছাড়া ছিল বর্ধমান হাউসে চিত্র ও পুঁথিপুস্তক প্রদর্শনী এবং উর্দু কবিদের মুশায়েরা।

উদ্বোধনী ভাষণে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, 'পূর্ববঙ্গবাসীদের উদারতা যে তারা চার কোটি লোকের ভাষাকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার দাবি না করে বরং উর্দুকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা রূপে মানতে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই উদারতায় কৃতজ্ঞ না হয়ে কেউ কেউ এখনো হুঙ্কার দিয়ে বলেছেন, যারা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি করে তারা পাকিস্তানের দুশমন।' উল্লেখ্য, ১৯৪৮ সালের সম্মেলনে মূল সভাপতির ভাষণে তিনি বাঙালিত্ব সম্পর্কে বলেছিলেন, 'আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙ্গালী। এটি কোন আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙ্গালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে মালা তিলক টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জোটি নেই।'[১৭৫]

সম্মেলনে চট্টগ্রামের অংশগ্রহণ সম্পর্কে দৈনিক আজাদ লিখেছে, 'সম্মেলনে সবচাইতে বেশী সংখ্যক প্রতিনিধি যোগদান করেন চট্টগ্রাম জেলা হইতে। বঙ্গোপসাগরের বারি বিধৌত ও পাহাড় ঘেরা চট্টগ্রাম হইতেই প্রায় দুইশত প্রতিনিধি যোগদান করেন এবং ইহাদের মধ্যে প্রায় কুড়িজন মহিলা রহিয়াছেন।' এ সম্পর্কে কলিম শরাফীর স্মৃতিচারণ, '১৯৫৪ সালে ঢাকার কার্জন হলে যে সংস্কৃতি সম্মেলন হয়েছিল এতে আমরা চট্টগ্রাম প্রায় শতাধিক শিল্পী নিয়ে যোগদান করেছিলাম। এর দলনেতা ছিলেন মাহবুব উল আলম চৌধুরী।'[১৭৬] সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ডের ওপর মাহবুব উল আলম চৌধুরী একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন, যা দীর্ঘদিন ধরে একটি সাংস্কৃতিক দলিল হিসেবে স্বীকৃত হয়েছিল।[১৭৭]

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম গোষ্ঠী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাভাষার গানে অংশগ্রহণ করেন চিরঞ্জীব দাসশর্মার নেতৃত্বে প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ। তারা গণসঙ্গীতের আসরেও অংশগ্রহণ করেন। 'নবজীবনের গান' পরিবেশন করে প্রান্তিক, 'ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা' ছায়ানাট্য পরিবেশন করেন নৃত্যানন্দ দত্ত ও শঙ্কর দাশগুপ্ত।

প্রান্তিক আরও পরিবেশন করে গীতিনকশা 'আর যুদ্ধ নয়' ও একাঙ্কিকা 'অরুণোদয়ের পথে', নৃত্য 'শিল্পীর নবজন্ম'। কবিয়াল রমেশ শীল ও তার দল কবিগান করেন।

পূর্ব পাকিস্তান আন্তঃকলেজ সাংস্কৃতিক সম্মেলন কুমিল্লা ১৯৫৫

১৯৫৫ সালের ১৮, ১৯, ২০ অক্টোবর কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান আন্তঃকলেজ সাংস্কৃতিক সম্মেলন। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ আখতার হামিদ খানের নেতৃত্বে ছাত্র সংসদ এ সম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কলেজের উপাধ্যক্ষ শ্রীজোৎস্নাময় বসুকে সভাপতি ও অধ্যাপক আলি নওয়াজকে সম্পাদক করে অভ্যর্থনা পরিষদ গঠিত হয়। দেশের বিভিন্ন কলেজ এতে অংশগ্রহণ করে। সম্মেলনে মূল সভাপতি ছিলেন অধ্যক্ষ আবদুর রহমান খান, উদ্বোধন করেন প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রী আশরাফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী।[১৭৮]

সম্মেলনে প্রথম দিনের কর্মসূচীর মধ্যে ছিল সম্মেলনে আগত অতিথিদের ভাষণ, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, গণসঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত, লোকগীতি ও আধুনিক গানের আসর। গণসঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন সুখেন্দু চক্রবর্তী ও পরিমল দত্ত।[১৭৯] ঈশ্বর পাঠশালায় ব্রতচারী নৃত্য প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন অধ্যাপক বদরুল হাসান। কামরুল হাসান প্রদর্শনীর প্রশংসা করেন। সাহিত্য অধিবেশনে অধ্যাপক কবীর চৌধুরী সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সুচরিত চৌধুরী রচিত ও পরিচালিত 'পার্কের কোণে' নাটক মঞ্চস্থ হয়। মুনীর চৌধুরী অভিনীত 'অরুণোদয়ের পথে' নাটকটি প্রশংসিত হয়। সম্মেলনে আরও ছিল ফুটবল প্রতিযোগিতা, শিক্ষা অধিবেশন, মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা।[১৮০] সম্মেলনে বই, সূচীশিল্প ও ডাক টিকিট প্রদর্শনী ও আমানুল হকের আলোকচিত্র প্রদর্শনী 'আমার দেশ' অন্তর্ভুক্ত ছিল। গীতিনাট্যে প্রথম হয়েছিলেন সুখেন্দু চক্রবর্তীর দল।[১৮১]

মূল সভাপতির ভাষণে আবদুর রহমান খান বলেন, 'আমি এই সম্মেলনকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ মনে করি কেননা জাতি বিশেষে উন্নতির মান তার সংস্কৃতি।' জাতির উন্নতির সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উপকরণ তার সাহিত্য। আমাদের দেশে অনেকের ভ্রান্ত ধারণা আছে যে বিজ্ঞান ধর্মবিরোধী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের কোন বিরোধ নেই।'[১৮২] 'সাহিত্যে কবিতায়, সঙ্গীতে নৃত্যে দেশব্যাপী এই সম্মেলনের স্বর্ণফসল নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করে।'[১৮৩]

সম্মেলনে চট্টগ্রামের শতাধিক শিল্পী-সাহিত্যিক নিয়ে মাহবুব উল আলম চৌধুরী যোগদান করেন এবং উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫৬ সালে চট্টগ্রাম কলেজে সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠিত আন্তঃকলেজ সাংস্কৃতিক সম্মেলনেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।[১৮৪]

কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন, টাঙ্গাইল ১৯৫৭

১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামীলীগের বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় টাঙ্গাইলের কাগমারিতে। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ছিলেন পূর্ব

পাকিস্তান আওয়ামীলীগের সভাপতি। 'সংগঠনের সভাপতি কর্তৃক নিজের দলেরই ক্ষমতাসীন নেতৃবৃন্দের অনুসৃত নীতি ও কার্যকলাপের বিরোধিতা ও সমালোচনার উদ্দেশ্যে এ ছিল এক বিরল আয়োজন।'[১৮৫] সম্মেলন ছিল দু'টি ভাগে বিভক্ত। একভাগে ছিল কাউন্সিল অধিবেশন– ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি; অপরভাগে সাংস্কৃতিক সম্মেলন– ৮, ৯, ১০ ফেব্রুয়ারি। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নাম দেয়া হয়েছিল 'পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন'। সম্মেলন উপলক্ষে মওলানা ভাসানীকে চেয়ারম্যান, আবু জাফর শামসুদ্দীনকে আহবায়ক এবং ইয়ার মোহাম্মদ খান ও সর্দার ইসপাহানীকে যুগ্ম আহবায়ক করে সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়।

সম্মেলন উদ্বোধন করেন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান; মূল সভাপতি ছিলেন কাজী মোতাহার হোসেন। স্বাগত ভাষণে মওলানা ভাসানী বলেন, 'পাকিস্তানের বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক ও পৃথিবীর রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সমঝোতার ভাব সৃষ্টিই সম্মেলনের মূল লক্ষ্য।' তিনি এদেশের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অবক্ষয়ের কারণ খুঁজে বের করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। পূর্ব পাকিস্তানের বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের প্রায় সকলেই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি তিনটি বড় অধিবেশন বসে। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যার পর ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

'কাগমারী সড়ক বিশ্বভ্রাতৃত্ব আর স্বাধীনতার সড়ক'– ভাসানীর এ প্রত্যয় পরবর্তীকালে সত্য প্রমাণিত হয়। এই সম্মেলনে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের 'আসসালামু আলায়কুম' বলে বিদায় জানিয়ে তিনি পূর্ববাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।

ঐতিহাসিক এই সম্মেলনে 'কৃষ্টি কেন্দ্র' ও চট্টগ্রামের শতাধিক শিল্পী-সাহিত্যিক তাঁর নেতৃত্বে যোগদান করেন।[১৮৬] পূর্বোক্ত সম্মেলনসমূহের অনুরূপ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেয় এবং চট্টগ্রামের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক ধারাকে জনসমক্ষে তুলে ধরে।

ইপ্সিত সংস্কৃতিধারা নির্মাণে মাহবুব উল আলম চৌধুরী চট্টগ্রামে গড়ে তুলেছিলেন আন্দোলন। রাজনৈতিক অভিঘাতে সৃষ্ট সামাজিক সমস্যা ও রাষ্ট্রীয় সঙ্কট এবং পাকিস্তানবাদী চিন্তার দীনতার বিপরীতে জীবনবাদী সংস্কৃতির ধারা পূর্ববাংলা জুড়ে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। সম্মেলনগুলিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তিনি গণতান্ত্রিক ও সমাজবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা কামনা করেছেন। সে রাষ্ট্রের সুস্থ জীবনব্যবস্থার জন্য ভেবেছেন উন্নত সংস্কৃতির কথা, যেখানে মনুষত্ত্বের বিজয় ঘোষিত হবে, গৌরব সাধিত হবে সত্য ও সাম্যের। ভেবেছিলেন রাজনীতির মূল কেন্দ্র হবে জনগণ, আর সংস্কৃতি হবে জনগণের মুক্তিলাভের উপায়। এজন্যে রাজনীতি ও সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছিলেন, মূলত চেয়েছিলেন মানবমুক্তি। লিখেছেন,

> রাজনীতি ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আমি আমার সহযোদ্ধাদের নিয়ে দেয়াল ভাঙার একটি কাজ হাতে নিয়েছিলাম। দেয়াল সম্পূর্ণ না ভাঙলেও চেষ্টার ত্রুটি ছিল না, আন্তরিকতার অভাব ছিল না। অভাব ছিল না সততার।.. যে সব দুঃসাহসিক কাজে আমরা ব্রতী হয়েছিলাম তার পেছনে কোনো লোভ-লালসা ছিল না,

> ইতিহাসে স্থান পাওয়ার আকাঙক্ষা ছিল না, যশ-খ্যাতির মোহ ছিল না। যা করেছি– অন্তরের তাগিদে করেছি, যুগের প্রয়োজনে করেছি, সাম্যের স্বদেশভূমি গড়ার স্বপ্ন নিয়ে করেছি।[১৮৭]

কতিপয় চরিত্রবৈশিষ্ট্য

মাহবুব উল আলম চৌধুরীর ব্যক্তিচরিত্রে ঘটেছিল নানা গুণের সমাহার। তিনি ছিলেন উদারনৈতিক, মানবতাবাদী, অসাম্প্রদায়িক, বন্ধুবৎসল, পরোপকারী– সর্বোপরি একজন রুচিস্নিগ্ধ স্বভাবের মানুষ। এই সব ব্যক্তিচরিত্র তিনি অর্জন করেছিলেন পারিবারিক ঐতিহ্য থেকে, রাজনৈতিক ভাবাদর্শ থেকে, সাংস্কৃতিক সাধনা থেকে– সর্বোপরি এই বসুধাকে সত্যিকার অর্থে মনুষ্য-উপযোগী করার মনোবাসনা থেকে। জীবনসংগ্রাম ও চিন্তাদর্শনের আলোকে তিনি বুঝে নিয়েছিলেন একজন মানুষকে সমাজে কী করে বাস করতে হয়, সমাজের মানুষের সঙ্গে কীভাবে চলতে হয়– কী করে একটি সুন্দর সমাজ নির্মাণ করা যায়। এই স্বপ্নকে যদি ফলপ্রসূ করতে হয় তা শুরু করতে হয় ব্যক্তি পর্যায়ে। কারণ ব্যক্তিমানসের প্রতিচ্ছবি হচ্ছে সমাজ, আর সমাজের প্রসারিত রূপ রাষ্ট্র ও সভ্যতা। সুতরাং ব্যক্তি যদি পরিশীলিত হয়ে ওঠে রাষ্ট্র পরিশীলিত হতে বাধ্য। সুদীর্ঘ সংগ্রামমুখর জীবন থেকে পাঠ নিয়ে তিনি এই আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন।

ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন অমায়িক প্রকৃতির। এর স্বরূপ তুলে ধরেছেন হাসনাত আবদুল হাই,

> বয়স নির্বিশেষে সবাইকে তিনি সম্মান করতেন। বয়োকনিষ্ঠদেরও তিনি 'ভাই' এবং 'আপনি' বলে সম্বোধন করতেন। সুখে-দুঃখে তিনি সবার পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন। তাঁর হাস্যোজ্জ্বল মুখ নিমিষেই পরিবেশ বদলে দিতো। সহজেই মন জয় করা, দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়ে দেওয়া তাঁর বিমল স্বর্গীয় হাসি যারা দেখেছে তারা কখনই তাঁকে ভুলতে পারবে না। দেব-শিশুর মুখে যে প্রশান্তি ও তৃপ্তি তাঁর চোখে-মুখে তা বিরাজ করতো সবসময়।[১৮৮]

তিনি ছিলেন সহৃদয় সত্তার অধিকারী। সহস্রজনের মাঝে তিনি মুক্তি খুঁজেছিলেন, মানুষের সঙ্গে মানুষের সৌহার্দ্যিক সম্পর্কে ছিলেন আস্থাশীল। আনিসুজ্জামান লিখেছেন,

> মানুষটাই ছিলেন হৃদয়বান, উদারতাই ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য, ভালোবাসাই ছিল তাঁর মন্ত্র। তাঁর স্মৃতিকথায় দেখা যায়, যখন তিনি বামপন্থী, তখন জওহরলাল নেহরুর প্রতি কী অসীম শ্রদ্ধা লালন করেছেন নিজের হৃদয়ে। নেহেরুর পাণ্ডিত্য, দেশপ্রেম ও ঔদার্য তাঁর এই শ্রদ্ধা জাগিয়েছিল। ভিন্নমতের মানুষের গুণ দেখলে তিনি তা অকৃপণভাবে স্বীকার করতেন। আর যাঁদের ভালোবাসতেন, তাঁদের প্রতি তাঁর অনুরাগ কোনো সীমা মানেনি।[১৮৯]

গুণগ্রাহিতা তাঁর চরিত্রের উজ্জ্বলতম দিক। অন্যের গুণপ্রশংসা শুধু নয়, বিপদে-আপদে এগিয়ে আসা, আবার সভ্যতা বিরোধী কাজের বিরোধিতা ছিল তাঁর অন্যতম চরিত্র বৈশিষ্ট্য। হাসনাত আবদুল হাইয়ের মতামত,

> সদা হাস্যময় তাঁর মুখশ্রী মানুষকে আপন করে নেয় নিমিষেই। পরিস্থিতি আর অভিজ্ঞতা যাই হোক তিনি সদানন্দ, চরম সঙ্কটকালেও তাঁকে হতাশা গ্রাস করতে পারে না, ম্লান করতে পারে না মুখের জ্যোতি। তাঁকে কখনো বিমর্ষ দেখেছে কেউ, একথা স্মরণ করতে গেলে ব্যর্থ হতে হবে। তিনি বন্ধুবৎসল, বয়স নির্বিচারে সদাশয় এবং বিপদে সঙ্কটে সাহায্য-সহায়তার অফুরন্ত উৎস। অজাতশত্রু বলতে যা বোঝায় তিনি তাঁর মূর্তিমান দৃষ্টান্ত। তিনি দেশপ্রেম, ভালোবাসা ও স্নেহের প্রতীক। যুদ্ধ, দাঙ্গা এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই এবং ঘৃণা আজীবন কালের।[১৯০]

অশুভশক্তির বিরোধিতা করতে গিয়ে তিনি সৌন্দর্যকে লোপ করেননি। বরং অসুরকে বধ করেছেন সুর দিয়ে, কুৎসিতকে পরাজিত করেছেন সৌন্দর্য দিয়ে। অর্থ্যাৎ পরিশীলিত রুচির মধ্য দিয়ে খুঁজে পেয়েছিলেন সুন্দরের, এজন্যে রফিকুল ইসলাম বলেন,

> তাঁর মত উদার, দিল দরাজ, বন্ধুবৎসল এবং অতিথিপরায়ণ মানুষ বর্তমান সময় বিরল। যে কোনো আসরে ছিলেন মধ্যমণি। তাঁর প্রাণখোলা হাসি, গভীর রসবোধ এবং বুদ্ধিদীপ্ত বাচন মানুষকে সহজেই আকর্ষণ করতো। এ কারণেই কখনও তাঁর বন্ধু বা ভক্তের অভাব ঘটেনি, যারা আজও তাঁর অভাব মর্মে মর্মে অনুভব করে থাকেন। বাস্তবিকই তাঁর মতো এমন বহুমাত্রিক সামাজিক মানুষ আজকের দিনে খুব একটা দেখা যায় না।[১৯১]

জীবনের বড় অর্জন শত সঙ্কটে অবিচল মনোভাব। অল্প বয়সেই তিনি এ গুণ অর্জন করেছিলেন। একুশের গুলিবর্ষণের খবরে তিনি অস্থির হননি, স্থিরচিত্তে অবিচলভাবে রচনা করেছিলেন সেই অমর কবিতা। শত সমস্যায় মুখে হাসি ফুটিয়ে বৈরীতাকে কার্যত অস্বীকার করেছিলেন। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর মনে করেন,

> আমার কাছে মাহবুব উল আলম চৌধুরী ছিলেন প্রসন্নতার প্রতীক। যখনই দেখা হয়েছে– হেসেছেন; এবং সেই হাসিটি ভুলবার মতো নয়। তাতে কোনো কৃত্রিমতা থাকতো না, উৎসারিত হতো একেবারে ভেতর থেকে। শেষ দিকেতো অসুস্থ ছিলেন, কঠিন দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছিল চোখ নিয়ে, কিন্তু তখনও টেলিফোনে যতবার কথা হয়েছে– গলার স্বর ও কথায় হাস্যোজ্জ্বল মনে হয়েছে তাঁকে।[১৯২]

মাহবুব উল আলম চৌধুরী চিন্তা ও কর্মে ছিলেন অভিন্ন। এর আলোকে তিনি জাতি ও সমাজ গঠনে প্রয়াসী ছিলেন– এ কথা উল্লেখ করে আবুল হাসনাত লিখেছেন,

> তাঁর চরিত্রের এক মাধুর্য আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করতো। তাঁর পঠনের ব্যাপ্তি ছিল। বিশেষ করে মার্কসবাদী সাহিত্যে তাঁর যে অনুরাগ জন্মেছিল আমৃত্যু তিনি তা লালন করেছেন। তাঁর ভেতর আমি মহৎ হৃদয়ের এক বাঙালিকে প্রত্যক্ষ করেছিলাম। প্রখর যুক্তির আলোকে যে মানুষটি সমাজকে নিরীক্ষণ করেছেন। এই যুক্তির আলোক সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন তিনি সমাজদেহে। ব্যথিত হয়েছেন তিনি রাষ্ট্রের দোলাচলে ও মানব অধিকারের অধঃপতনে।[১৯৩]

তাঁর চরিত্রের অন্যতম দিক সামাজিক যূথবদ্ধতা। তিনি বিশ্বাস করতেন ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছাড়া অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছা অসম্ভব। সব সময় জাতীয় সংকট ও দুর্দিনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়াস নিয়েছেন এবং ঐক্যের মাঝে খুঁজেছেন সমাধান– রাষ্ট্র ও সমাজের উৎকর্ষ ও বিকাশের। এ সম্পর্কে হাসনাত আবদুল হাইয়ের বক্তব্য,

> রাজনৈতিক থেকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক সব অঙ্গনেই তাঁর সমান আগ্রহ এবং পদচারণা ছিল এবং এখনো রয়েছে। রাজনীতিতে আগের মতো সক্রিয় নন, কিন্তু সমাজ প্রগতির জন্য, অপশক্তির বিরুদ্ধে প্রচারণায় ও কর্মকাণ্ডে এবং সাংস্কৃতিক জীবনের উৎকর্ষে অবদানের জন্য তাঁর আগ্রহ ও তৎপরতা এখনো প্রচণ্ড এবং বিশাল। সাংগঠনিক কার্যক্রমের অথবা সংগঠনের মাধ্যমে নিজের সামাজিক ভূমিকা পালনের পাশাপাশি তিনি প্রথম জীবনে যেমন, এখনো একইভাবে সাংস্কৃতিক জগতে সৃজনশীল কাজে নিবেদিত।[১৯৪]

এই সংগঠকসত্তা তাঁর রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যজীবনে লক্ষযোগ্য। তিনি গণমুখী, জনগণের সঙ্গে থেকে তাদের সঙ্কটমোচনে আন্তরিকভাবে প্রয়াসী। এই সত্তার সঙ্গে তাঁর অন্যান্য সত্তার ঘটেছে অপূর্ব সংমিশ্রণ। এ প্রসঙ্গে সেলিনা হোসেনের মতামত,

> একজন কবি ও একজন সম্পাদকের একক সত্তা এই একের ভেতর থেকে বহুত্বের বিকাশ মাহবুব উল আলম চৌধুরীর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তিনি ইতিহাস সচেতন। তাঁর মনন, চিন্তাশীলতা, সৃজনশীলতায় নিজের দেশ এবং মনুষ্যত্বের কল্যাণে তাঁর মানবিকবোধের সংযোগ ঘটিয়েছিলেন তরুণ বয়স থেকে। সেই বয়স থেকেই সমাজ এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে কোনো বিচ্ছিন্ন মানুষ ছিলেন না তিনি। দুটো ক্ষেত্রেই তাঁকে গভীরভাবে ভাবিয়েছে এবং সে অনুযায়ী তিনি সামাজিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রকে আলোকিত করার জন্য অবিরাম সক্রিয় ছিলেন।[১৯৫]

মাহবুব উল আলম চৌধুরী অল্পবয়সে মাতৃহারা হন। আত্মীয়-স্বজনের অপত্য স্নেহ সত্ত্বেও তিনি বলেছেন, সেখানে ঘাটতি ছিল। এজন্যে তিনি যখনি কারো কাছ থেকে একটু স্নেহ, একটু ভালবাসা, প্রীতি পেয়েছেন– আবেগ আপ্লুত হয়েছেন। যদি তিনি নারীকূলের হয়ে থাকেন তাঁকে বসিয়েছেন মাতৃাসনে, তাঁর মাঝে খুঁজে নিয়েছে নিজের মাকে। এই মাতৃঅন্বেষা হয়তো দেশমাতৃকার রূপরহস্য উন্মোচন ও সেবায় তাঁকে নিবেদিত রেখেছিল আজীবন। দেশের জল-হাওয়ায় মাতৃপ্রেমের ছোঁয়া পেয়েছেন, এই অনুভূতি তাঁকে দেশপ্রেমিক করে তোলেছে শতগুণে।

এভাবে তিনি হয়ে ওঠেন ঐতিহ্যপ্রেমী। এই ঐতিহ্য দেশের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও মানববিদ্যার ঐতিহ্য। তাঁর একুশের প্রথম কবিতাও ঐতিহ্যপ্রীতির পরিচয়বহ। তাঁর আত্মজীবনীতেও এই প্রবণতা লক্ষণীয়। তিনি পারিবারিক ঐতিহ্য অন্বেষণ করেছেন, বাঙালি সংস্কৃতির ভিত্তি রচনাকারীদের কথা আলোচনা করেছেন সশ্রদ্ধচিত্তে। আত্মানুসন্ধান করতে গিয়ে খুঁজে ফিরেন আত্মঐতিহ্যের ভিত, লিখেছেন,

> নদী যখন সমুদ্রে পড়ে তখন নিজস্ব কোনো গল্প থাকে না। তাই আমার নিজের কথা বলতে গিয়ে আমি বারবার আমাদের ঐতিহ্যের কথা বলছি। আমার পূর্ব-

পুরুষদের কথা বলছি। আমার সমকালের বিদগ্ধ মানুষের কথা বলছি।, তাদের সাধনার অন্তর্গত বিষয়গুলোর কথা বলছি। বাঙালি হিন্দু-মুসলমানদের যুক্ত-সাধনার কথা বলছি। যার ফলে তৈরি হয়েছিল আমাদের সংস্কৃতির মূলধারা।

বাঙালি সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝি বাঙালি জাতির জীবনযাত্রা, তার ঐতিহ্যের ধারায় নির্মিত বাস্তবিক ও মানসিক কীর্তি-কর্ম, জীবনযাত্রার আর্থিক সামাজিক রূপ, অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান; আর জীবনবোধে, আধ্যাত্মিক চিন্তা-ভাবনা, আবিষ্কার নানা শিল্পকর্ম ও সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে তার গভীরতর পরিচয়কে তুলে ধরা।[১৯৬]

গুণীজনের প্রতি মুগ্ধতা তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এসব মনীষীদের গুণে তিনি বিমুগ্ধ। দেশের জন্য তাদের আত্মত্যাগ, অবদান ও ভূমিকার কথা স্মরণ করে তাঁদের প্রতি অবনত মস্তকে শ্রদ্ধা জানান। তাদের সাধনা ও কৃতিত্বের নির্যাসে আত্মসমৃদ্ধি ঘটান। কয়েকটি উদাহরণ নিম্নরূপ–

১. আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ ছিলেন তপোবনে ধ্যানরত একজন ঋষির মতো। তাঁর মতো বিশাল হৃদয়ের অধিকারী লোক আমি জীবনে খুব কম দেখেছি। অসাম্প্রদায়িক, গভীর সাহিত্যপ্রেম এবং এতবড় মানবদরদী ব্যক্তির সংস্পর্শে এসে আমি অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হই। বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বাসে ও অঙ্গীকারে আবদ্ধ হই।[১৯৭]

২. তার মতো হিন্দু-মুসলমান মিলনের সেতু যদি সমাজে আরো কিছু জন্মাতো, তাহলে সব পেয়েছির দেশ না করতে পারলেও হিন্দু-মুসলমানের মিলিত একটি সুন্দর দেশ গড়ে তুলতে পারতাম। তার কাছেই শিখেছিলাম– হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, মনুষ্যত্বই মানুষের প্রথম পরিচয়।... হুমায়ুন কবির ছিলেন আমার রাজনৈতিক গুরু। এ রকম একজন শতাব্দী ফুলকে যদি আমরা জনসম্মুখে তুলে ধরতে পারি, তাঁর জীবনের এবং জ্ঞানের আলোকে আমাদের অন্ধকার সমাজে আলো ফুটবে বলে আমি আশা রাখি।[১৯৮]

৩. তিনি ছিলেন বিশাল জ্ঞানের অধিকারী, মার্কসবাদে দীক্ষিত একজন পণ্ডিত। এই বড়মাপের মানুষের সাক্ষাৎ প্রাপ্তি ছিল আমার জীবনের একটি বড় অর্জন।... মার্কসবাদে আগ্রহী কিশোর এবং তরুণদের জন্য তিনি সহজ ভাষায় 'ইতিহাসের ধারা' নামে একটি ইতিহাসগ্রন্থ লিখেছিলেন। এই নতুন গ্রন্থটি চল্লিশ দশকে শুধু তরুণদের কাছে নয়, বড়দের কাছেও অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করে।... ইতিহাস যে শুধু রাজ-রাজড়াদের যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং রাজা ও সম্রাটদের কীর্তি কাহিনী নয়– এই বই পড়ে সেটা প্রথম উপলব্ধি করি।[১৯৯] (সুশোভন সরকার)

সংস্কৃতির এই শেকড়-অন্বেষা তিনি লাভ করেছিলেন বহু মণীষীর কাছে থেকে– এর মধ্যে রয়েছেন আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, হুমায়ুন কবির, আবুল ফজল, পূর্ণেন্দু দস্তিদার,

মাহবুব উল আলম, আশুতোষ চৌধুরী প্রমুখ লেখক-বুদ্ধিজীবী। আরও রয়েছে চট্টগ্রামের নানা মতপথের রাজনীতিবিদ। তাঁদের চিন্তার সারৎসারকে স্বীয় চরিত্রে সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। স্বীকারোক্তি করেছেন,

> এসব জাতীয়তাবাদী ব্যক্তির সঙ্গে মিশে আমি ভালোবাসতে শিখেছি। অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী হতে চেষ্টা করেছি। আমি সাহিত্যপ্রেমী হয়েছি। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মূলধারার সঙ্গে সংযুক্ত হতে পেরেছি। বহুভাবে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছি, জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করার চেষ্টা করেছি। বড় মাপের মানুষের সঙ্গে পরিচিতি হওয়ার সুযোগ পেয়েছি। তারা সবাই ছিলেন ত্যাগী, সাহসী, মনে প্রাণে ইংরেজ বিদ্বেষী, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী,- পরোপকারী এবং দেশপ্রেমিক। সবাই যে সমাজবাদী ছিলেন তা নয়, কিন্তু দেশ স্বাধীন করার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ।[২০০]

মাতৃপ্রেম তাঁকে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করেছে। ছেলেবেলায় তাঁদের অধ্বস্তনদের ওপর নিপীড়ন দেখে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও পঞ্চাশের মন্বন্তর তাঁকে করে তোলে মানবতাবাদী ও উদারনৈতিক। ছেচল্লিশ ও পঞ্চাশের দাঙ্গা তার মননে তৈরি করে অসাম্প্রদায়িক বোধ। আর মহৎ সমাজগঠনের স্বপ্ন তাঁকে করে তোলে সংগ্রামী ও সমাজতন্ত্রী, অন্যায়ের প্রতিবাদকারী, অসুন্দরের শত্রু– সর্বোপরি আদর্শবাদী মহৎ মানুষ।

শেষজীবন ও মৃত্যু

নব্বইয়ের দশক থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়কে মাহবুব উল আলম চৌধুরীর শেষজীবন হিসেবে বিবেচ্য। এর পূর্বের সময়টি নিয়ে নানাজনের নানা জিজ্ঞাসা, যে, এই সময়টি তিনি কী করলেন। যিনি চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে সাহিত্য, রাজনীতি ও সংস্কৃতি অঙ্গনে ঐতিহাসিক অবদান রাখলেন কেন তিনি নিভৃতে চলে গেলেন। এর যথার্থ উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন আবুল মোমেন,

> মধ্য চল্লিশ থেকে মধ্য ষাট– যে দুই দশক জুড়ে মাহবুব উল আলম চৌধুরী সৃষ্টিতে ও সংগঠনে ব্যাপৃত ছিলেন তা ছিল নানা বিচিত্র ঘটনা বন্ধুর, অস্থির, অনিশ্চিত। যুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ, দেশত্যাগ, সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র ও রাজনীতির পাশাপাশি প্রগতিশীল, সাম্যবাদী রাজনীতির বিভাজন ও বিপর্যয় তাঁর স্বপ্ন ও উদ্যমকে তছনছ করে দেয়। তিনি রাজনীতি, কর্মজগৎ এমনকি লেখার জগৎ থেকেও নিজেকে গুটিয়ে নিলেন। এ তাঁর সন্ন্যাস নয়, অজ্ঞাতবাসও নয়, অভিমান ও ঔদাসীন্যের মিশ্রণ যেন।[২০১]

দীর্ঘদিনের নিশ্চুপতার পর তিনি নব্বইয়ের দশকে জেগে ওঠেছিলেন, সক্রিয় হয়ে ওঠেছিলেন সংস্কৃতি অঙ্গন ও সাহিত্যচর্চায়। সংস্কৃতি অঙ্গনের সবার জন্য এটি ছিল বিশেষ আনন্দের। তিনিও যেন এসব কাজে অশেষ স্ফূর্তি লাভ করেছিলেন। এর মধ্যে ছিল পুরোনো বন্ধু-সহযাত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ, নতুন ধারার সংস্কৃতি চর্চার সঙ্গে আত্মযোগ ও পরিচয়। শেষজীবনে লিখলেন আত্মজীবনী, কবিতা, কলাম, প্রবন্ধ-নিবন্ধ,

স্মৃতিকথা– বের করলেন তাঁর গর্বের ধন 'সীমান্ত' পত্রিকার যথাসম্ভব সংগ্রহের 'সীমান্ত সংগ্রহ'। ফলে বিশ শতকের চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের সাহিত্য ও সংস্কৃতি অঙ্গনে তিনি যে খ্যাতি লাভ করেছিলেন, উত্তরকালের দীর্ঘসময় এ নিয়ে তেমন না আলোচনা হলেও নব্বুইয়ের দশকে তাঁর আবির্ভাব নিয়ে এসেছিল নতুন মাত্রা– কী তাঁর ব্যক্তিজীবনে, কী বাঙালির বিদ্বৎ পরিমণ্ডলে।

এই সময় তাঁর সমুদয় কর্মকাণ্ডের মধ্যে শুধু বিগত অতীতের কথা বলেই ক্ষান্ত হননি। বরং বর্তমানের আলোকে অতীতকে মূল্যায়ন করেছেন এবং সমকালীন যেসব সমস্যা-সংকট জাতির সামনে উপস্থিত হয়েছে তিনি তা মোচনের দিকনির্দেশনা দিয়েছেন অর্থাৎ প্রাচীন হয়েও বর্তমানের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন, তাকিয়ে দেখেছেন ভবিতব্যের দিকে। এই জীবনবেদের পরিচয় তাঁর সাহিত্যকর্মে লক্ষণীয়। একুশে তিনি যেমন প্রতিবাদী সত্তা, একুশ শতকে এসেও কালসচেতন ব্যক্তি ও শিল্পী।

মাহবুব উল আলম চৌধুরীর শেষজীবনের তাৎপর্য ছিল বিপুল। এর স্বরূপ তুলে ধরেছেন আবুল মোমেন,

> দেশে যখন জঙ্গী মৌলবাদের উত্থান হয়েছে, যখন রাজনীতি দুর্নীতি ও মাস্তানির প্রভাবে নষ্ট হতে বসেছে, যখন সাংস্কৃতিক অঙ্গনে স্বৈরাচার-সাম্প্রদায়িকতার ছোবল চলছে তখন বাঙালির শাশ্বত মানবতার শিক্ষা ও বাণীতে সমৃদ্ধ সাহিত্য ও সংস্কৃতির উজ্জীবন ও প্রসার ঘটানো জরুরী হয়ে পড়ে। সেই কাজে মাহবুব উল আলম চৌধুরী বয়সকে অগ্রাহ্য করে আবার যুবকের উৎসাহ ও প্রেরণায় যুক্ত হচ্ছিলেন।[২০২]

তাঁর অন্তিম দিনগুলি সম্পর্কে হাসনাত আবদুল হাইয়ের অন্তর্দৃষ্টি,

> নব্বইয়ের দশক থেকে তাঁকে আবার সভা-সমিতিতে দেখা গেল। প্রৌঢ় বয়সে যুবকের তেজ ও উদ্দীপনা নিয়ে তিনি প্রগতিশীল সংস্কৃতির সপক্ষে বিভিন্ন সভায় বক্তৃতা দেওয়া এবং কবিতা পড়া শুরু করেন। নতুন করে আবার কবিতা লেখার উৎসাহ খুঁজে পান তিনি।... তিনি অজস্র কবিতা এবং পত্রিকায় কলাম লিখে তার প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেন। প্রায় হারিয়ে যাওয়া লেখক মাহবুব ভাই আবার লোকচক্ষুর সামনে চলে আসেন। নবীন ও যুবকদের পাশে তাকে দেখা যায় একই বলিষ্ঠস্বরে বক্তব্য রাখতে।[২০৩]

শেষজীবনে কিভাবে উত্তরপ্রজন্মকে উদীপ্ত করেছেন তার চিত্র পাই মুহাম্মদ সামাদের লেখায়,

> এই আশি বছর বয়সে তাঁর কবিতার সংগ্রামী সংকেত ও বিভিন্ন সভা-সমাবেশে তাঁর সাহসী উচ্চারণ আমাদের নিস্তেজ ধমণীতে রক্ত সঞ্চালন বাড়ায়। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চ কিংবা বিভিন্ন মিলনায়তনে তাঁর সঙ্গে বসে বা কথা বলে শির অবনত না করে পারি না। এখনো মানুষের মুক্তির মিছিলের অগ্রভাগে তাঁর উত্তেজিত মুখ আমাদের উদ্দীপিত করে প্রতি মুহূর্তে। কী তেজ, কী সাহস এবং কী অকুতোভয় দেশপ্রেমিক মানুষ এই একুশের প্রথম কবিতার কবি মাহবুব উল আলম চৌধুরী।[২০৪]

রামেন্দু মজুমদার লিখেছেন তাঁর সংস্কৃতিপ্রীতি ও দায়িত্ববোধের কথা,

> তিনি নিয়মিত আমাদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যথাসময়ে উপস্থিত থাকেন। যখনি আমরা তাঁকে কোনো সভায় বক্তৃতা করতে বলি, তিনি আমাদের বিমুখ করেন না। কর্মজীবন থেকে অবসর নেওয়ার পর এখন তিনি সুন্দর আরেকটি জীবনযাপন করছেন, যার মধ্যে কাব্যচর্চা একটা বড় জায়গা করে নিয়েছে।[২০৫]

শেষজীবনে তাঁর কর্তব্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন শফি আহমেদ,

> মনে পড়ছে, বছর কয়েক আগে আমাদের গণসঙ্গীতের অদ্বিতীয় শিল্পী আবদুল লতিফ চলে গেলেন। একটি পত্রিকায় লতিফ ভাই সম্বন্ধে একটি লেখা ছাপতে চাই। কাকে বলি, এই ভাবতে ভাবতে মাহবুব ভাইয়ের কথা মনে এল। টেলিফোনে অনুরোধ করলাম। আর মাহবুব ভাই নিজের প্রতিশ্রুত সময়ের আগেই একটি চমৎকার লেখা পাঠিয়ে দিলেন। নিজে নিজেই লজ্জায় অবনত হলাম। এই শিক্ষাটা আমরা কেন পাইনি?[২০৬]

কবীর চৌধুরী তুলে ধরেছেন শেষজীবনের অনুপম ছবি,

> মাহবুব চট্টগ্রাম ছেড়ে ঢাকায় চলে আসেন। স্বাধীন বাংলাদেশ, রাজধানীর শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতি অঙ্গনে তার পদচারণা ব্যাপকতা লাভ করে এবং অধিকতর দৃপ্ত হয়ে ওঠে। আমাকে যা বিশেষভাবে আনন্দ দেয়, তা এই ঢাকায় আসার পর তার লেখালেখি জগৎ প্রসারিত হয়েছে, সেখানে নতুন প্রাণের ছোঁয়া লাগছে। কবিতা, স্মৃতিচারণ, প্রবন্ধ, কলাম; সবই তার ছাপ পড়ে। আর বিভিন্ন সভা-সমিতিতে তার উদ্দীপনাময় ভাষণ, লিখিত বা মৌখিক, মৌলবাদ, স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর নির্যাতন এবং অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে শহীদ মিনার ও অন্যত্র তার সাহসী উচ্চারণ অনেকের সঙ্গে আমাকেও অনুপ্রাণিত করে।[২০৭]

শেষজীবনে তিনি সাহিত্যচর্চা নিয়ে ছিলেন শশব্যস্ত। কিন্তু এর মাঝেও রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতেন, নতুন কবিতা রচনার পর মুহূর্তে কাউকে শোনানোর জন্য উদগ্রীব হতেন। প্রাণখুলে অট্টহাসি দিতেন। এভাবেই চলছিলো তাঁর সৃষ্টিমুখর সময়। এ রকম কোনো একদিনের স্মৃতিচারণ করে কবিপত্নী লিখেছেন, 'আমাদের দোতলার বেলকনিতে দাঁড়িয়ে প্রায়ই বলতেন– এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবো? কোথায় যাবো? সাথে সাথে তিনি যেন গভীর বিষণ্নতায় ডুবে যেতেন। মনে হতো নিশ্চুপ হয়ে প্রকৃতি, আকাশের নীল, ফুল আর পাখীর কূজন অনুভব করতেন। কথা আর বলতেন না কারো সাথে কিছুক্ষণ। কিছুটা প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠলে তাকে বলতাম– জীবনে যা পেয়েছো, তা উপভোগ করাতেই অশেষ শান্তি। অশেষ আনন্দ। বাকহীন মাথা নেড়ে সমর্থন জানাতেন।'[২০৮]

ঠিক তখনি হয়তো ডায়েরিতে 'এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে' নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন। পরবর্তীকালে কবিপত্নী সেই কবিতাটিকে শিরোনাম কবিতা করে আরও কিছু কবিতা নিয়ে এ নামে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। মৃত্যুচিন্তা যে তাঁকে স্পর্শ করেছিল এ কবিতা তারই সাক্ষ্যবহ।[২০৯]

এরমধ্যে তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন।[২১০] বুকে ব্যথা অনুভূত হলে ২০ ডিসেম্বর, ২০০৭ তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ২৩ ডিসেম্বর ২০০৭ দুপুর একটা তিরিশ মিনিটে রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান (ইন্নালিল্লাহি.. রাজিউন)। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তাঁর মৃত্যুতে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে শোকের ছায়া নেমে আসে।

শোক প্রকাশ করেন আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জিল্লুর রহমান ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম। বিবৃতিতে তারা বলেন, তিনি শুধু ভাষাসৈনিক কবিই ছিলেন না, সব প্রগতিশীল আন্দোলন সংগ্রামের অগ্রসৈনিক।

বিএনপির মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন এক শোকবার্তায় মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বলেন, জাতি একজন শ্রেষ্ঠ সন্তানকে হারালো। বিবৃতিতে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়।

ভাষাসংগ্রামী আবদুল মতিন কবির মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করে বলেন, ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে তাঁর লেখা কবিতা 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি। এই কবিতার জন্য রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে ওঠেন তিনি; যা আমাদেরও আবেগাপ্লুত করেছিল। মাহবুব উল আলম চৌধুরী আমাদের মাঝে নেই একথা বলার অবকাশ নেই। কারণ তিনি তার কাজের মধ্য দিয়ে আমাদের মাঝে আজীবন থাকবেন। (দৈনিক সমকাল, ২৪ ডিসেম্বর ২০০৭)

২৪ ডিসেম্বর বেলা ১১টায় সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের উদ্যোগে কবির মরদেহ নেওয়া হয় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে। বন্ধু-সহপাঠী, স্বজন-শুভানুধ্যায়ী আর সাংস্কৃতিক অঙ্গনের মানুষদের অশ্রুসিক্ত নয়নে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় জানায়। এর মধ্যে ছিলেন ড. কামাল হোসেন, সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাইদুজ্জামান, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ফরাসউদ্দিন, আওয়ামী লীগ নেতা আবদুর রাজ্জাক, মতিয়া চৌধুরী, সাজেদা চৌধুরী, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, রাশেদ খান মেনন, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, রফিকুল ইসলাম, মফিদুল হক, শিল্পী এমদাদ হোসেন, কামাল লোহানী, হাশেম খান, মুনতাসীর মামুন, আসাদুজ্জামান নূর, দ্বিজেন শর্মা, কবরী সারোয়ার, সুলতানা কামাল, খুশী কবির প্রমুখ।

ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায় সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, বাসদ, উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদ, ক্রান্তি শিল্পীগোষ্ঠী, প্রজন্ম '৭১, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন, কণ্ঠশীলন, রাউজান সমিতিসহ অনেক সংগঠন। শেষে কবির স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

দুপুর সাড়ে ১২টায় ভাষাসৈনিকের মরদেহ নেয়া হয় বাংলা একাডেমী চত্ত্বরে, রাখা হয় নজরুল মঞ্চের সামনে। শিক্ষা ও সংস্কৃতি-বিষয়ক উপদেষ্টা আইয়ুব কাদরী, বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী ফুল দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান।

সেখান থেকে কবির মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে। জোহরের নামাজের পরে হয় জানাজা। জানাজায় সর্বস্তরের মানুষ শামিল

হন। সেখান থেকে বনানী কবরস্থানে নিয়ে কবির দাফন সম্পন্ন করা হয়। অশ্রু আর ফুলের শুভেচ্ছায় তাঁকে বিদায় জানায় ভক্ত-বন্ধু-স্বজন-সহকর্মীরা।

বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠন তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ছাড়াও সংগঠনের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, জাসদ, সিপিবি, ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ ছাত্রমৈত্রী, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বাংলাদেশ গণশিল্পী সংস্থা ইত্যাদি।

চট্টগ্রাম শহীদ মিনারে মাহবুব উল আলম চৌধুরীর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শহীদ মিনারের পাদদেশে কবি সাংবাদিক আবুল মোমেন সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ভারপ্রাপ্ত মেয়র এম মঞ্জুরুল আলম এবং বিভিন্ন সংগঠন তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে। (দৈনিক প্রথম আলো, ২৫ ডিসেম্বর ২০০৭)

শোক প্রকাশ করেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন এম সাইফুর রহমান ও ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব হাফিজউদ্দিন আহমদ, গণফোরামের সভাপতি ড. কামাল হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক সাইফউদ্দিন আহমদ। (ডেইলি স্টার, ২৫ ডিসেম্বর ২০০৭)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ মাহবুব উল আলম চৌধুরীর মৃত্যুতে ব্যক্তিগতভাবে এবং সরকারের পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ করে লিখেন, 'বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে মাহবুব উল আলম চৌধুরীর কবিতা সমগ্র জাতিকে উজ্জীবিত করেছে। মাতৃভাষার প্রতি তাঁর আবেগ, দেশপ্রেম ও সাহস তাঁকে জাতির কাছে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। তাঁর আদর্শ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।'

বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ শোকবাণীতে মাহবুব উল আলম চৌধুরীর জীবন ও কর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরে লিখেন, 'মাহবুব উল আলম চৌধুরীর মৃত্যুতে জাতি একজন বরেণ্য ব্যক্তিকে হারালো।'

ছায়ানটের সভাপতি সন্‌জীদা খাতুন ও সাধারণ সম্পাদক খায়রুল আনাম শাকিল শোকবার্তায় বলেন, চট্টগ্রামের সংস্কৃতি-সাধনায় তাঁর নিরন্তর সহযোগ বাঙালি সমাজকে জাতীয় ঐতিহ্যের সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর করেছে। শেষ জীবনে ঢাকাবাসী হয়েও তিনি বারংবার ছুটে গেছেন চট্টগ্রামের সংস্কৃতি জগতের আহ্বানে। ঢাকাতে ছায়ানট, জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলন পরিষদ, বাংলাদেশ ব্রতচারী সমিতি ছাড়াও অসংখ্য সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন। মানুষের আহ্বানে সর্বত্র ছুটে যেতেন আমাদের মাহবুব ভাই। ...বাংলা ভাষা-সংস্কৃতির দুশমনদের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী ছিল শাণিত তরবারি। এদেশের ইতিহাস বিষয়ে সচেতন এবং আজীবন সংস্কৃতিপথের অভিযাত্রী মাহবুব উল আলম চৌধুরী আমৃত্যু কলম নিয়ে যুদ্ধ করে গেছেন।

বেঙ্গল ফাউণ্ডেশনের মহাপরিচালক লুভা নাহিদ চৌধুরী শোকবার্তায় লিখেন, এ দেশের প্রগতিশীল আন্দোলন ও বাঙালি সংস্কৃতির চর্চাকে সঞ্জীবিত করার জন্য তিনি

পঞ্চাশের দশক থেকে আমৃত্যু নিরলস সাধনা করেছেন। তাঁর সম্পাদিত 'সীমান্ত' সাহিত্য ও সংস্কৃতি পত্রিকা এ দেশের সাহিত্যের বিবর্তনের ইতিহাসে এক মাইলফলক হয়ে আছে।'

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভানেত্রী হেনা দাস ও সাধারণ সম্পাদক আয়শা খানম শোকবার্তায় লিখেন, 'তিনি বাংলা ভাষার এক অপরাজেয় ইতিহাস হয়ে আমাদের মাঝে অমর অম্লান হয়ে থাকবেন চিরদিন।'

'কালি ও কলম' পত্রিকার সম্পাদক আবুল হাসনাত শোকবার্তায় বলেন, 'কবি, কালি ও কলম পত্রিকার সুহৃদ এবং বাংলাদেশের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব মাহবুব উল আলম চৌধুরীর মৃত্যুতে আমরা ব্যথিত। তাঁর মৃত্যুতে দেশের সাহিত্য জগতের অপূরণীয় ক্ষতি হলো। একুশে নিয়ে তাঁর অবিস্মরণীয় কবিতা ভাষা আন্দোলনে প্রাণ সঞ্চারিত করেছিল।'

সমকালীন প্রতিক্রিয়া

মাহবুব উল আলম চৌধুরী তাঁর কর্মদর্শনের মধ্য দিয়ে অল্পবয়সেই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। সাময়িকপত্র সম্পাদনা, রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা, সাংস্কৃতিক উদ্যোগ, সাহিত্যসাধনা প্রভৃতি কারণে তিনি ছিলেন আলোচনার বিষয়। একদিকে সময়োপযোগী উদ্যোগ ও যুগোপোযোগী প্রয়াস গ্রহণ করার জন্য তিনি সকলের যেমন প্রশংসা কাড়েন, তেমনি বিপরীত স্রোতের রাজনীতি ও সরকারেরও ছিলেন কোপানলে।

তিনি ১৯৫০ সালে দাঙ্গা-পরিস্থিতির সময় চট্টগ্রামে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্তকমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং সংস্কৃতিকে হাতিয়ার করে যে দাঙ্গা রুখা যায় মানুষের মনে সাহস সঞ্চার করে চট্টগ্রামে তা প্রমাণ করেন। সেই সময় বের করেন 'সীমান্ত' দাঙ্গা বিরোধী সংখ্যা। এই খবর কলকাতায় পৌঁছবার পর কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন উপদ্রুত অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা করার আমন্ত্রণ জানানো হয়। অম্বিকা চক্রবর্তী ও কমরেড চিত্ত বিশ্বাস তাঁকে বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবির এবং উপদ্রুত এলাকায় নিয়ে যান।

কমিউনিস্ট পার্টির সংস্কৃতি কেন্দ্রে, তাঁর একটি সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কমরেড মুজাফফর আহমদ, আবদুর রাজ্জাক, আবদুল হালিম, হীরেন্দ্রনাথ মুখার্জি, কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি গোলাম কুদ্দুস, সুশোভন সরকার, আবু সয়ীদ আইয়ুব, সলিল চৌধুরী, সুধী প্রধান, নরহরি কবিরাজ, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, বিমল চন্দ্র ঘোষ, উর্দু কবি শাহেদ শাহেদ পারভেজ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, রবিউদ্দীন, ভবানী সেন, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, তৃপ্তি মিত্র, সুচিত্রা মিত্র- প্রমুখ। মাহবুব উল আলম চৌধুরী লিখেছেন,

> সুচিত্রা-দি'র 'সার্থক জনম আমার' গানের পর কমরেড মুজাফফর আহমদ আমার হাতে ফুলের তোড়া তুলে দিয়েছিলেন।... বললেন, চট্টগ্রামে সবসময় মহৎ কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এসেছে। বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে সূর্য পুরুষ

> মাস্টারদা সূর্য সেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের যে বীজ বপন করে গেছেন, তিনি ও তার সহকর্মীদের পবিত্র রক্তধারায় সেই প্রবাহ কখনো স্তিমিত হয়নি। সেই বেগবান ধারার তোমরা উত্তরাধিকারী। সর্বক্ষেত্রে তোমাদের সাফল্য কামনা করি।
>
> ...আমি কতক্ষণ বক্তৃতা দিয়েছিলাম এবং বক্তৃতায় কী বলেছিলাম মনে করতে পারছি না। শুধু মনে পড়ছে বক্তৃতা দেয়ার এক পর্যায়ে আমি আবেগে কেঁদে ফেলেছিলাম।[২১১]

সমকালে 'সীমান্ত' পত্রিকা প্রকাশ করে সাড়া জাগাতে সক্ষম হন। পূর্ববাংলার অমন মানসম্পন্ন, উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও অসাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শের পত্রিকা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তারপর একুশের কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে তিনি খ্যাতির চূড়ায় উপনীত হন। বাস্তবিক হয়ে ওঠেন পূর্ববাংলার একজন খ্যাতিমান কবি, সাংস্কৃতিক সংগঠক ও সম্পাদক। এর প্রমাণ তিনি পেয়েছিলেন বায়ান্ন সালে কুমিল্লা সাংস্কৃতিক সম্মেলনে,

> কুমিল্লা রেলওয়ে স্টেশনের একটি ঘটনার কথা আমার মনে পড়ছে। বহু কিশোর-তরুণ আমাদের অটোগ্রাফ নেয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেছিলেন। ইতোমধ্যে আমি যে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি হয়ে উঠেছি তা উপলব্ধি করলাম অটোগ্রাফ শিকারির সংখ্যা দেখে।[২১২]

ষাট সত্তর, আশি দশকে তিনি সংস্কৃতি অঙ্গন সাহিত্যচর্চা থেকে অনেকটা নিভৃতে চলে যান। এ পর্বে তিনি অতটা আলোচিত ছিলেন না। কিন্তু যে অবদান তিনি রেখেছিলেন চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে, যে অবদানের ওপর বাঙালি জাতিসত্তার উদ্ভব, তা তো বিস্মৃত হবার নয়। সমকালীন বিদ্বৎসমাজের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অনেকটা ম্লান হলেও হয়তো বা তার ইচ্ছেকৃত, তাঁর সেই অবদান ও ভূমিকা কেউ বিস্মৃত হয়নি। সেই ইতিহাসকে ভুলে যাওয়ার অর্থ বাঙালির সংস্কৃতি সংগ্রামকে ভুলে যাওয়া। এজন্যে দেখা যায়, নব্বইয়ের দশকে তিনি যখন ক্রমে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে, সারস্বত সমাজে সক্রিয় হয়ে ওঠেন তখন সেই অমর দিনগুলির কথা, তার অমর অবদানের কথা সকলের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। অন্য অর্থে ইতিহাসই চিনিয়ে দিল সেই অমর কবিকে যিনি জাতির ক্রান্তিলগ্নে ঐতিহাসিক অবদান রেখেছিলেন, বাঙালি জাতিসত্তা গঠনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন, তিনি যেন আবার সবার প্রেরণাদায়ী ব্যক্তিত্বে পরিণত হলেন।

চট্টগ্রামের অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ১৯৯৭ সালে তাঁকে সংবর্ধনা প্রদান করে। এর স্বাগত ভাষণে জগত জ্যোতি বড়ুয়া বলেন,

> ঢাকার রাজপথে স্তব্ধ করতে চললো গুলি- সে গুলি ঝরালো তর-তাজা প্রাণ। সালাম-বরকতের প্রাণ ঝরা বুলেটে বিদ্ধ হলেন রোগশয্যায় শায়িত চট্টগ্রামের মাহবুব উল আলম। হৃৎপিণ্ড চিরে বের হলো রক্ত, টগবগে লাল রক্ত, উদাগারিত লাভার মতো। সে রক্ত জমাট বেঁধে কবিতা হলো- প্রতিবাদের, প্রতিশোধের। সেই কবিতা কৃপাণ হয়ে শত্রুর দুর্গ তছনছ করে দিলো। সেই কবিকে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণতি।[২১৩]

এ উপলক্ষে 'অভিনন্দন' শীর্ষক একটি সংবর্ধনা সংকলন বের হয়। ওখানে মাহবুব উল আলম চৌধুরীর জীবন, কর্ম ও সাধনা নিয়ে লিখেন ফণি বড়ুয়া, বিনোদ দাশগুপ্ত, ত্রিদিব দস্তিদার, সুফিয়া কামাল, শওকত ওসমান, শামসুর রাহমান, কবীর চৌধুরী, আনিসুজ্জামান, কলিম শরাফী, ওহীদুল আলম, রফিকুল ইসলাম, কল্পতরু সেনগুপ্ত, হাসনাত আবদুল হাই, ওয়াহিদুল হক, সনজীদা খাতুন, আমিনুল ইসলাম, এবনে গোলাম নবী, সৈয়দ নাজমুদ্দীন হাশেম, কামাল লোহানী, শামসুজ্জামান খান, মাহবুব হাসান প্রমুখ। সুফিয়া কামাল 'আশীর্বাণী'তে বলেন,

> বহুযুগের ওপার থেকে ভেসে আসা একটি সঙ্গীত ভেসে আসে, সেকালে মুসলিম সমাজে শিল্প সংস্কৃতি ও সাহিত্যচর্চার চরম দুর্দিন ছিল। সেই সময় কয়েকটি দুঃসাহসী তরুণ মিলে চট্টলভূমি থেকে সীমান্ত বলে একটি প্রগতিশীল সাহিত্যপত্র বের করল। আমরা বিস্মিত হয়ে দেখলাম যথার্থই সাহিত্য ও সমাজ প্রগতির সোচ্চার কণ্ঠ নিয়ে 'সীমান্ত' আত্মপ্রকাশ করেছে। সেই যুগের এই পত্রিকাটি সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছিল আমার পরম স্নেহভাজন তরুণ দেশকর্মী মাহবুব উল আলম চৌধুরী। সারাদেশে তখন সে বামপন্থী রূপে পরিচিত ছিল এবং দেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংকটের দিনে নির্ভয়ে দীর্ঘ কাল সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ধারাকে সমন্বিত করার জন্য সংগ্রাম করেছে।[২১৪]

শওকত ওসমান ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ করে দেশভাগের পর বৈরী পরিস্থিতিতে অসাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শের পত্রিকা, সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও কর্মপ্রয়াসের তাৎপর্য তুলে ধরে বলেন,

> অশেষ প্রাণ-শক্তিধর এই সতীর্থ অনুজ। দেশপ্রেম রূপী সঞ্জীবনী মন্ত্রের নিনাদে সদা-সচকিত, আসর জাঁকানো অভিনেতা সে। মাহবুবের Ventriloquist ভেন্টিলোকিষ্ট স্বর অনুকরণের দাপটও কম নয়। যেমন অপরের কণ্ঠস্বরে তেমনই অপরের মানস চত্বরে তার যাতায়াত স্বাভাবিক। নিজের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসার এই ক্ষমতাই মানুষকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। এমন পথই মনুষ্যত্ব অর্জনের পথ।[২১৫]

কবি ওহীদুল আলম লিখেন,

> তখন পরিচিত লেখক সাদৎ আলী আখন্দ-এর উদ্যোগে সাহিত্য মজলিশ নামে সাহিত্য সভার আয়োজন করতাম। মাহবুব উল আলম চৌধুরী সাহিত্য সভায় যোগ দিত, ভালো কবিতা রচনা করতো; তার চেয়েও তার কবিতা আবৃত্তি আমার কাছে বড় আকর্ষণীয় ছিল। তখনকার দিনে ছন্দবদ্ধ কবিতা মাহবুব উল আলম চৌধুরীর কণ্ঠে অপূর্ব মনে হতো। ১৯৪৭ সালের দিকে মাহবুব উল আলম চৌধুরী "সীমান্ত' সাহিত্য মাসিকী সম্পাদনায় আধুনিক পরিবেশ প্রতিফলিত করে।[২১৬]

কলিম শরাফী একুশের প্রথম কবিতা, সীমান্ত পত্রিকা, সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তাঁর ঐতিহাসিক গুরুত্ব তুলে ধরে লিখেছেন,

> যতদিন বাঙালি জাতি থাকবে, বাঙালি জাতির সংগ্রাম ও ইতিহাস থাকবে ততদিন এই কবিতাটিও আমাদের চোখের সামনে জ্বল-জ্বল করবে বাতিঘরের আলোর

> মতো। এর জন্যে এদেশের সকল সংগ্রামী মানুষ তার কাছে ঋণী। বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি অঙ্গনে প্রয়াত কবি হাসান হাফিজুর রহমানের পর যদি আর একটি নাম উচ্চারণ করি তবে মাহবুব উল আলম চৌধুরীই একটি উৎকৃষ্ট নাম।[২১৭]

সংবর্ধনার প্রতিভাষণে মাহবুব উল আলম চৌধুরী বলেছিলেন,

> অনোমা একটি নদীর নাম। আড়াই হাজার বছর আগে যুদ্ধ, অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে যে অহিংসা ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাণী উচ্চারণ করেছিলেন ভগবান তথাগত সেই মহামানবের চরণধন্য নদীর নামে আপনাদের সংস্থার নাম। অভিধানে এই নাম পাইনি, পেয়েছি ইতিহাসে। ...আপনারা আমাকে আপনাদের একজন মনে করে সম্মান দেখানোর যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তা আমার হৃদয় স্পর্শ করেছে।[২১৮]

শুধু চট্টগ্রাম নয়, তিনি ঢাকার সংস্কৃতিচর্চার মূলধারা সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন এবং সক্ষম হয়েছিলেন সবার অপার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জনে। সাহিত্য-সংস্কৃতি অঙ্গনে ফিরে এসে পত্র-পত্রিকায় কবিতা, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, কলাম ও স্মৃতিকথা লিখেছেন। বিভিন্ন পত্রিকায় সাক্ষাৎকার প্রদান করেছেন। সেসব সাক্ষাৎকারের মূল বিষয় একুশে কবিতার রচনার পটভূমি এবং পঞ্চাশের দশকের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিবৃত্ত। এভাবে তিনি গণমাধ্যমেরও মনোযোগের বিষয় হয়ে ওঠেন। লাভ করেন অনেক পুরস্কার, সংবর্ধনা ও সম্মাননা। এ থেকে তাঁর জনপ্রিয়তা, কর্মের মূল্যায়ন পরিধি অনুমান করা যায়।

পুরস্কার, সংবর্ধনা ও সম্মাননা

বাংলা একাডেমী ফেলোশীপ (১৯৮৬), ক্রান্তি শিল্পীগোষ্ঠী সংবর্ধনা (১৯৯০), অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী সংবর্ধনা (১৯৯৭), সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট সংবর্ধনা (২০০০, ২০০২), চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব সংবর্ধনা (২০০০), চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন একুশের পদক ও সংবর্ধনা (২০০১), বাংলাদেশ উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী সংবর্ধনা (২০০১), পদাতিক নাট্য সংসদ সংবর্ধনা (২০০২), ক্রান্তি পদক ও সংবর্ধনা (২০০২), চট্টগ্রাম লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র সংবর্ধনা ও স্বর্ণপদক (২০০৩), সম্মাননা পদক: চট্টগ্রাম সমিতি ঢাকা (২০০৩), সংবর্ধনা ও সম্মাননা পদক: চট্টগ্রাম বইমেলা (২০০৪), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আবৃত্তি মঞ্চ সংবর্ধনা ও একুশে পদক (২০০৫), ঋষিজ পদক ও সংবর্ধনা (২০০৬), বোধন আবৃত্তি পরিষদ- চট্টগ্রাম সম্মাননা (২০০৬), একুশে পদক (মরণোত্তর, ২০০৯), ওস্তাদ মোমতাজ আলী খান সঙ্গীত একাডেমী পদক (মরণোত্তর, ২০১০)[২১৯] ইত্যাদি।

সংস্কৃতি অঙ্গনে সক্রিয় হওয়ার ফলে তিনি নানামুখী কাজে সম্পৃক্ত ছিলেন। এর ফলে শুধু প্রবীণ নয়, নবীনদেরও শ্রদ্ধা অর্জন করতে সক্ষম হন। অর্থাৎ সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। তাঁকে ভালবেসে গ্রন্থ উৎসর্গ করেছেন অনেকে। সেখানেও তাঁর অবদানের মূল্যায়ন হয়েছে, প্রকাশ ঘটেছে তাঁর ব্যক্তি ও শিল্পীসত্তার।

উৎসর্গকৃত গ্রন্থ ও সঙ্কলন

১. শওকত ওসমান, কাঁকরমনি (নাটক), দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৫০, চট্টগ্রাম, উৎসর্গ: 'মাহবুব উল আলম চৌধুরী/ অনুজ-প্রতিমেষু/ একটি আকাশ কিনারে/ অপরটি পরিখার ধারে/ দুই সীমান্তের ছায়ে/ আমাদের যাত্রার সড়ক/ শিল্পী সৈনিক তুমি/ লেখনী বেয়নেট হোক।'

২. হাসনাত আবদুল হাই, নবীর নৌকা, ঢাকা: ইঙ্ক অ্যাণ্ড ইঙ্ক, ফেব্রুয়ারি ২০০১, উৎসর্গ: 'চট্টগ্রামের দুই কৃতি সন্তান, মাহবুব উল আলম চৌধুরী/ ড. কামাল এ খান'।

৩. চন্দন চৌধুরী, আমি সে মহত্তম, জননী ধর্ষক (প্রবন্ধ সংকলন), ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৬ —

৪. হামিদা বেগম, বাংলাদেশের উপন্যাসে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক জীবন, এম.ফিল অভিসন্দর্ভ, ঢাকা: পালক পাবলিশার্স, আগস্ট ২০০৭, উৎসর্গ: 'আমার প্রিয়তম বাবা/ মরহুম কে. বি. এম সিরাজউদ্দীন আহমেদ/ যাঁর প্রতীক্ষায় আমি প্রতিনিয়ত থাকি। প্রিয় দাদা ভাই কবি মাহবুব উল আলম চৌধুরী/ যিনি সতত আমাকে আলোকিত/হবার অনুপ্রেরণা যোগান'।

৫. রামশংকর দেবনাথ (সম্পা.) বিভাস, দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৭, ঢাকা। উৎসর্গ: 'একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম কবিতা রচনাকারী ভাষাসৈনিক কবি মাহবুব উল আলম চৌধুরীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে'।

৬. জাহিদ আনোয়ার (সম্পা.) অঞ্জলি লহ মোর (ষান্মাসিক সাহিত্য পত্রিকা), জানুয়ারি-জুন ২০০৮ সংখ্যা, উৎসর্গ: 'মাহবুব উল আলম চৌধুরী/ সাইফউদ্দিন আহমেদ মানিক/ বজলুর রহমান/ সেলিম আল দীন'।

৭. দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়, নহি নটী নই শুধু দাসী (নিবন্ধ সংকলন), ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০০৭, উৎসর্গ: 'কবি মাহবুব উল আলম চৌধুরী'।

৮. কবীর চৌধুরী (অনু.) আঁদ্রে জিদের ইসাবেল, ঢাকা: ফেব্রুয়ারি ২০০৮, উৎসর্গ: 'অনুজপ্রতিম প্রিয় বন্ধু মাহবুব উল আলম চৌধুরীর মৃত্যুঞ্জয়ী স্মৃতির উদ্দেশে'।

৯. তাহমিনা কোরাইশী, ফিরে কি আসা যায়, ঢাকা: পারিজাত প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০০৮, উৎসর্গ: 'আমার শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব/ ভাষাসৈনিক প্রয়াত কবি মাহবুব উল আলম চৌধুরী'।

১০. জেসমিন আরা সুলতানা সাথী, কবিতা সমগ্র, প্রথম খণ্ড, ঢাকা: গোর্কি পাবলিকেশন, ফেব্রুয়ারি ২০০৮, উৎসর্গ: 'ভাষাসৈনিক একুশের কবি/ মাহবুব উল আলম চৌধুরী/ যিনি আমার পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু কবিদা/ বেঁচে থাকতে যিনি আমারে ছন্দের বাঁধনে/ তাঁর প্রাণ বেঁধে প্রতিভা বিকাশের/অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন/ যাঁর তাগিদে শেষ পর্যন্ত বইটি আলোর মুখ দেখতে পেলো সেই তাঁকেই গভীর শ্রদ্ধাভরে।'

১১. রোদসী, ফেব্রুয়ারি ২০০৮ ঢাকা, ভাষাকবি মাহবুব উল আলম চৌধুরী সংখ্যা।

১২. Ikhtisad Ahmed, Cryptic Verses, Dhaka: Mati ar manush, 2009, Dedication: `To the late grate/ Mahbub Ul Alam Chowdury/ my grandfather, my friend,/ my teacher, my idol,/ my insparation'

১৩. বেগম মুশতারী শফী, একুশের গল্প, ঢাকা: ভূমিকা, ফেব্রুয়ারি ২০১২, উৎসর্গ: 'ভাষাসৈনিক অ্যাডভোকেট গাজীউল হক/ ও/ একুশের প্রথম কবিতার রচয়িতা–/কবি মাহবুব উল আলম চৌধুরী,/ যাদের অপার স্নেহে আমি প্রাণিত।'

পারিবারিকভাবে তাঁর জন্মদিন কয়েকবার উদযাপিত হয়েছে। ২০০৬ সালের ৮ নভেম্বর জাতীয় জাদুঘরে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের উদ্যোগে জাতীয় কমিটির উদ্যোগে উদযাপিত হয় তাঁর আশিতম জন্মবার্ষিকী। সে উপলক্ষে 'মাহবুব উল আলম চৌধুরী অবিস্মরণীয় কবিতার জনক' শীর্ষক বৃহৎ কলেবরের একটি সংবর্ধনগ্রন্থ বের হয়। গ্রন্থে 'আমাদের কথা'য় বলা হয়,

> 'সীমান্ত' পত্রিকা সম্পাদনা, একুশের প্রথম কবিতা রচনা, বিভিন্ন প্রগতিশীল সাহিত্য ও সংস্কৃতি আন্দোলন সংগঠনে যিনি পাকিস্তানি সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে অটল ছিলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরেও তিনি অবসর গ্রহণ করেননি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের ভাষা, সাহিত্যে, সংস্কৃতি ও জাতিসত্তার বিরুদ্ধে যে অবিরাম ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত চলেছে তিনি বিগত তিন দশক তার বিরুদ্ধে সোচ্চার। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে তিনি কখনো বিচ্যুত হননি। আজকের বাংলাদেশে চরম বিভ্রান্তির মধ্যেও তিনি অকুতোভয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনার শিখা প্রজ্বলিত রেখে সেই আলোতে এগিয়ে চলেছেন এবং সতীর্থ ও উত্তরসূরিদের সেই পথে চলার অনুপ্রেরণা জুগিয়ে যাচ্ছেন। সে জন্যেই তিনি আমাদের সকলের শ্রদ্ধার পাত্র।[২২০]

বৃহৎ কলেবরের গ্রন্থটিকে স্মৃতি, কবিতা অভিনন্দন লিখেন খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, জাহানারা ইমাম, সুচরিত চৌধুরী, অনুপম সেন, আতাউস সামাদ, আবদুল গাফফার চৌধুরী, আনিসুজ্জামান, আবদুল মান্নান সৈয়দ, আবুল মোমেন, আসাদ চৌধুরী, ওয়াহিদুল হক, কবীর চৌধুরী, জিয়া হায়দার, নওয়াজেশ আহমদ, নির্মলেন্দু গুণ, বদরুদ্দীন উমর, বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, মফিদুল হক, রফিকুল ইসলাম, রামেন্দু মজুমদার, শামসুজ্জামান খান, সনজীদা খাতুন, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, সেলিনা হোসেন, সুলতানা কামাল, বিনোদ বিহারী চৌধুরী, হাসনাত আবদুল হাই প্রমুখ।

বিনোদ বিহারী চৌধুরী তাঁর কৃতির মূল্যায়ন করে লিখেন,

> তাঁর প্রগতিশীল মননশীলতা, কুসংস্কার- কূপমন্ডূকতা- ধর্মান্ধতা এবং অনগ্রসরতার বিরুদ্ধে তিনি তাঁর তরুণ বয়সে সজাগ ছিলেন, সতর্ক ছিলেন এবং দেশে ১৯৪৭ সালের পরবর্তী একটি বীভৎস সময়ে তরুণদের দেশপ্রেম ও প্রগতির পথে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তিনি নানা বিপদের ঝুঁকি নিয়েছিলেন। কবি সুচরিত চৌধুরীর সহিত একত্রে 'সীমান্ত' পত্রিকা প্রকাশ করে দেশকে স্বাভাবিক পথে পরিচালনার জন্য তাঁর আপ্রাণ চেষ্টা প্রশংসনীয়। ভাষা আন্দোলনে, জাতীয়

> জাগরণে, দেশাত্মবোধ সৃষ্টির প্রাণপণ চেষ্টার ভূমিকায় তিনি অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।[২২১]

মাহবুব উল আলম চৌধুরীর ঐতিহাসিক অবদানের স্বীকৃতি দিয়ে অনুপম সেন লিখেন,

> যেই ব্যক্তি চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে বাংলাদেশের, বাঙালির মুক্তির সাধনায় এমন অসাধারণ অবদান রাখলেন, তিনি কেন পরবর্তী দুটি দশক এমনভাবে মূক হয়ে গেলেন। আমরা যারা এই সময়ে চট্টগ্রামে আমাদের যৌবন অতিক্রম করেছি, তারা বারবার মাহবুব উল আলম চৌধুরীর কথা ভেবেছি। মাহবুব উল আলম চৌধুরী যদি এই ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ দুটি দশকে সক্রিয় থাকতেন, তাঁর অবদান কি বিশাল হতো! যাই হোক, আমাদের সৌভাগ্য যে তিনি নতুন শতাব্দীতে আমাদের উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করতে আবার সংস্কৃতি অঙ্গনে ফিরে এসেছেন।[২২২]

আতিকুল হক চৌধুরী আশিতম জন্মদিনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন ভিন্ন প্রেক্ষিতে,

> আমাদের রাজপথে যেখানে দু'চারটে ভাঙাচোড়া জীর্ণ ঘোড়ার গাড়ি শীর্ণ কয়েকটি ঘোড়াকে কোনো রকমে টেনে নিচ্ছে, সেখানে এই ৮০ বছর বয়সেও তিনি আমাদের সমাজের নির্জন আস্তাবল থেকে বুট ছোলার উপঢৌকন এড়িয়ে লাগাম উঁচিয়ে তেজী ঘোড়সওয়ারের মতো হ্রেষা ধ্বনি করে বের হয়ে এসেছেন ও সবাইকে ডেকে বলছেন– এখনো যুদ্ধে যাবার সময় আছে, হাত-পা গুটিয়ে নিষ্ক্রিয় নিরপেক্ষ হয়ে তথাকথিত সুখময় গৃহকোণে বসার দিন নয়। বেরিয়ে আসার দিন। উজ্জ্বল সূর্যের দিকে এগিয়ে যাবার দিন।[২২৩]

বেলাল চৌধুরী তাঁর প্রতিবাদী ও নির্ভীকচিত্তকে চিহ্নিত করে লিখেছেন,

> আশিতে পা রেখেও অনিন্দ্যকান্তি যিনি সদা প্রফুল্ল হৃদয়বান, বন্ধুবৎসল তার চেয়েও বড় কথা সজীব তারুণ্যে প্রাণচাঞ্চল্যে এখনো রীতিমতো ঝলমলে। তাঁকে দেখে কে বলবে এই অশীতিতম বয়সেও কেমন প্রতিবাদী আপসহীন আর আগুন ঝরানো সব অক্ষর নির্ঝর। মুখের অনাবিল হাসিটি দেখে কে আঁচ করবে, ইনিই আমাদের অমর ভাষা আন্দোলনের সেই প্রথম গর্জে ওঠা কবিতা 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি'র রচয়িতা।[২২৪]

উক্ত গ্রন্থে নানাজনের রচনায় মাহবুব উল আলম চৌধুরীর জীবন, সাহিত্য, সংস্কৃতিসাধনা, সাংগঠনিক কাজ, প্রতিবাদী মন, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি বিষয়ে মূল্যায়ন উপস্থাপন করা হয়েছে। বস্তুতপক্ষে পাকিস্তান-সৃষ্টি প্রাক্কালে ও উত্তরকালে বাঙালি জাতিসত্তার সঠিক পথরেখা নির্ধারণে তাঁর যে অবদান ছিল বিশেষত সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এরূপ মানুষের ভালবাসা প্রাপ্তি ছিল স্বাভাবিক। আর মানুষের ভালবাসার জন্যই তাঁর সংস্কৃতি সাধনা। মানুষের এত ভালবাসা, প্রীতিসিক্ত হৃদয় তাঁর মনকে বিপুলভাবে আলোড়িত করেছিল। তিনি 'এত ভালবাসা রাখবো কোথায়' কবিতায় এর জবাব দিয়েছিলেন।[২২৫]

সম্পাদকীয় মূল্যায়ন

মৃত্যুর পর বিভিন্ন পত্রিকা ও স্মরণিকা তাঁর জীবন, কর্ম, সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা, সাহিত্যকর্ম ইত্যাদির মূল্যায়ন করে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সেখানে প্রকাশ

পেয়েছে তাঁর সম্পর্কে জাতির বিবেকী কণ্ঠস্বর। দৈনিক ইত্তেফাক (২৫ ডিসেম্বর ২০০৭) সম্পাদকীয় 'আমরা শোকাহত'-এ লিখে, 'তিনি তো সেই কবি, চেতনার স্তরে স্তরে যিনি লালন করিয়াছেন দেশ ও দশের মানুষের প্রতি প্রগাঢ়-গভীর ভালোবাসা। ১৯৫২ সালে মাতৃভাষার দাবীতে যখন অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ, দুঃশাসনের বুলেটে বিদ্ধ ছাত্র-জনতার রক্তে যখন রঞ্জিত রাজপথ, তখন তরুণ মাহবুব উল আলম চৌধুরীর কলমের ডগায় জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তীব্র প্রতিবাদের বহ্নিশিখা। তিনি রচনা করেন সেই তেজোদীপ্ত অমর কবিতা, 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি।' এই কবিতার শব্দে ও ছত্রে সেদিন তরুণ কবি বাঙময় করিয়া তোলেন গোটা বাংলাদেশের কোটি জনতার আবেগ ও বিক্ষোভ। ইহা তো সেই কবিতা, যাহা কখনই পুরাতন হইবে না, যাহা ভাষা সংগ্রামের মহিমাকে করিয়াছে আরও দীপ প্রখর।

এই কবির জীবন সাধনা বহুমাত্রিক হইলেও রক্তে রাঙানো বাহান্ন সালে রচিত তাঁর সেই অমর কবিতাটি বাঙালির শোনিতে জাগায় স্পন্দন। আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে এমন আলোড়ন জাগানিয়া কবিতার সংখ্যা খুব বেশী নাই। বলা হইয়া থাকে যে, মাহবুব উল আলম চৌধুরী যদি আর একটি কবিতাও না লিখতেন, তাহা হইলেও 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি'– এই কালজয়ী কবিতাই তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিতে যথেষ্ট ছিল।'

দৈনিক সমকাল (২৫ ডিসেম্বর ২০০৭) সম্পাদকীয় 'মাহবুব উল আলম চৌধুরী ইতিহাসের বরপুত্রকে শ্রদ্ধাঞ্জলি'-তে লিখে, 'বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ের সংগ্রামে অন্যতম অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী মাহবুব উল আলম চৌধুরীর সৃষ্টি প্রেরণা ছিল উত্তাল সময়ের সঞ্চারী শক্তি। চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে নিজের কাজের মাধ্যমে তিনি পূর্ব বাংলায় পরিচিতি লাভ করেন।

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস যতদিন থাকবে, ততদিন অম্লান হয়ে থাকবে তার সৃষ্টি এবং নাম। সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতাসহ যাবতীয় কূপমণ্ডুকতার বিরুদ্ধে আমৃত্যু সোচ্চার প্রয়াত এই কবির অবস্থান সর্বক্ষণ ছিল মানবতা, গণতন্ত্রের পক্ষে। যদিও তার প্রয়াণ ঘটেছে পরিণত বয়সেই, তবু তার শারীরিক অনুপস্থিতি জাতির জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। সদালাপী স্নিগ্ধ অমায়িক এই ব্যক্তিত্বকে জরাও তার কর্মের গণ্ডি থেকে সরাতে পারেনি। তার ঔজ্জ্বল্য এবং সৃজনশীলতা অনুকরণীয়।

সাহিত্য ছিল তার জীবনের ব্রত। সাহিত্য যে সমাজ পরিবর্তনের বড় অঙ্গীকার হয়ে উঠতে পারে– এসবই তার জীবনের মূর্ত হয়ে উঠেছিল। তাকে ঘিরে যে কিংবদন্তিতুল্য সুকীর্তির সুনাম গড়ে উঠেছে এর তাৎপর্য ব্যাপক। তার কৃতিত্ব তিনি জীবন সম্পর্কে মানুষেকে জিজ্ঞাসু করে তুলতে পেরেছিলেন। নিজেকে বপন করেছিলেন বীজের মতো, প্রবহমান রাখতে চেয়েছিলেন নদীর মতো। মাহবুব উল আলম চৌধুরী আছেন, থাকবেন বৃক্ষ ও নদীর মতোই।'

শোক ও স্মরণসভা

মাহবুব উল আলম চৌধুরী স্মরণে দেশে-বিদেশে অনেক শোক ও স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেসব সভায় নানাজনের স্মৃতিচারণ ও মূল্যায়নে তাঁর চিন্তাদর্শনের স্বরূপ ফুটে ওঠে। গণমুখী চিন্তার যে ঘরানায় তিনি বিশিষ্ট ছিলেন, গণমুক্তির কথা যে তিনি তাঁর কাজে প্রকাশ করেছেন তারই প্রতিধ্বনি ওঠেছিল সেসব সভায়।

২৯ ডিসেম্বর, ২০০৭ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট নাগরিক স্মরণসভার আয়োজন করে। জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর সভাপতিত্বে স্মরণসভায় বক্তারা বলেন, একুশের প্রথম কবিতার রচয়িতা মাহবুব উল আলম চৌধুরী আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে।

অধ্যাপক কবীর চৌধুরী বলেন, মাহবুব উল আলম চৌধুরী চিরদিন বাঙালির শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন। আমাদের শত্রুঘাঁটি মৌলবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে হবে। সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কামাল লোহানী বলেন, কবি মাহবুব উল আলম চৌধুরী ছিলেন বাংলাদেশের গণসংস্কৃতি আন্দোলনের অগ্রণী পুরুষ।

আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য আবদুর রাজ্জাক বলেন, তিনি ছিলেন বাঙালির বিবেক। আজ আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ওপর আঘাত এসেছে। এর মোকবেলায় তিনি আমদের প্রেরণা হয়ে থাকবেন।

সভায় আরও বক্তব্য রাখেন ভাষাসৈনিক এটিএম শামসুদ্দিন, মুর্শেদ আলী, ডা. কামরুল আহসান খান, কর্নেল (অব.) শওকত আলী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি নাসিরউদ্দীন ইউসুফ।

কবির কবিতা থেকে আবৃত্তি করেন আসাদুজ্জামান নূর, আহকাম উল্লাহ ও শাহাদাৎ হোসেন নিপু। মাহবুব উল আলম চৌধুরীকে লেখা কবি শামসুর রাহমানের একটি চিঠি থেকে আবৃত্তি করেন গোলাম সারোয়ার। 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি' কবিতার স্যামসন সরকার-সুরারোপকৃত গান পরিবেশন করে ক্রান্তি শিল্পীগোষ্ঠী। মাহবুব উল আলম চৌধুরীকে নিবেদিত কবিতা পাঠ করে তাঁর নাতি ইবতিসাম আহমেদ (দৈনিক সমকাল, ৩০ ডিসেম্বর ২০০৭)।

লন্ডনে ব্রাডলি হলে ৫ জানুয়ারি ২০০৮ নাগরিক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীসহ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি মাহবুব উল আলম চৌধুরীর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে বক্তব্য রাখেন।

ক্রান্তি শিল্পী গোষ্ঠী রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে মাহবুব উল আলম চৌধুরী স্মরণসভা এবং তাঁর সর্বশেষ রচিত 'গরাদভাঙার সংগ্রামীরা জাগো' কাব্যগ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সংগঠনের সভাপতি মাহবুবুল হায়দার মোহনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সৈয়দ শামসুল হক। বক্তৃতা করেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার, কবি বেলাল চৌধুরী, কবিপত্নী জওশন আরা রহমান, ঝুনা

চৌধুরী প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতেই কাব্যগ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন কবি বেলাল চৌধুরী। (দৈনিক ভোরের কাগজ, ১৯ জানুয়ারি ২০০৮)

বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতি পাবলিক লাইব্রেরিতে সমিতির সভাপতি অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এক স্মরণসভার আয়োজন করে। প্রধান অতিথির ভাষণে ভারতীয় হাইকমিশনের কাউন্সিলর অজিত গুপ্ত বলেন, 'কবি মাহবুব উল আলম চৌধুরী ছিলেন অসাধারণ প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের অধিকারী। আমি মনে করি, তরুণ ও বয়োজ্যেষ্ঠ কবিরা তাঁর স্বপ্নপূরণের পথে এগিয়ে আসবেন। কারণ, দুই বাংলার কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যেই আমি পদ-গদ্য, চিত্রকর্ম, সঙ্গীত-নৃত্য-এসবের প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ দেখেছি।' সভার শুরুতে কবির স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

সভায় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, মাহবুব উল আলম চৌধুরী ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির মিছিলে অসুস্থতার জন্য তিনি অংশ নিতে পারেননি। কিন্তু একুশের প্রথম প্রহরের কবিতা 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি' তাঁকে ভাষা আন্দোলনের একটি অধ্যায়ের সঙ্গে যুক্ত করেছে। যে আদর্শ তিনি দিয়ে গেছেন, তা ভবিষ্যতে আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে।

কবি আসাদ চৌধুরী বলেন, 'ভদ্রলোক বলতে আক্ষরিক অর্থে যে শিক্ষা ও রুচির সমন্বয় বোঝায়, সেটা আমি কবি মাহবুব উল আলমের মধ্যে পেয়েছি। মাত্র ১৯ কি ২০ বছর বয়সে তিনি 'সীমান্ত' পত্রিকাটি হাতে নেন। তিনি চট্টগ্রামে বসে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের প্রগতিশীল লেখকদের খুঁজে বের করতেন, তাঁদের লেখা ছাপতেন। সৈয়দ শামসুল হক বলেন, 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি' এই কবিতা তাঁকে যেমন খ্যাতি দিয়েছে, তেমনি তাঁর বেড়ে ওঠার অন্তরায় ছিল এই কবিতা। দাঙ্গাবিরোধী গল্পসহ বিভিন্ন চমৎকার প্রবন্ধ তিনি লিখেছেন, কিন্তু তা ঢাকা পড়ে গেছে ওই কবিতার আড়ালে।

নাট্যব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার বলেন, কৈশোর থেকে আদর্শের প্রতি তাঁর যে আনুগত্য ছিল সেটাই তিনি লালন করে গেছেন আজীবন। তিনি একটি কল্যাণকর রাষ্ট্র চেয়েছিলেন, যেখানে কোনো গরিব থাকবে না। সবাই অসাম্প্রদায়িকতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শ লালন করলে মাহবুব উল আলমের স্বপ্নপূরণ হবে। (দৈনিক প্রথম আলো, ৯ জানুয়ারি ২০০৮)

১০ জানুয়ারি ২০০৮ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রাঙ্গণে বাংলাদেশ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদ মাহবুব উল আলম চৌধুরী স্মরণে আলোচনা, তাঁর কবিতার আবৃত্তি ও তাঁর কবিতা গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসবের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে কবির জীবন ও সংগ্রাম নিয়ে আলোচনা করেন কবি নির্মলেন্দু গুণ, কবিপত্নী জওশন আরা রহমান ও সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক গোলাম কুদ্দুছ। কবির কবিতা আবৃত্তি করেন আবৃত্তি শিল্পী আসাদুজ্জামান নূর, শিমুল মোস্তফা, কাজী আরিফ, রবিশঙ্কর মৈত্রী, আহকামউল্লাহ, ফয়জুল আলম পাপ্পু, গোলাম সারোয়ার, রফিকুল ইসলাম, মাহিদুল ইসলাম, লায়লা আফরোজ, রেজিনা ওয়ালী লীনা প্রমুখ। (দৈনিক জনকণ্ঠ, ১১ জানুয়ারি ২০০৮)

২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ ডিসি হিলের একুশে মেলা মঞ্চে মাহবুব উল আলম চৌধুরীর নাগরিক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন। আলোচনায় অংশ নেন বিশিষ্ট সাংবাদিক কামাল লোহানী, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, কবি আসাদ চৌধুরী, ড. অনুপম সেন, লেখক-প্রকাশক মফিদুল হক, ভাষাসংগ্রামী আহমদুর রহমান আজমী, এ কে এম এমদাদুল ইসলাম, শহীদজায়া বেগম মুশতারী শফী, কবি ও সাংবাদিক আবুল মোমেন, সাংবাদিক নাসিরুদ্দিন চৌধুরী, হুসনুন নাহার চৌধুরী, সেবা চৌধুরী, কমরেড শাহ আলম, চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক রিয়াজ হায়দার চৌধুরী। স্মরণ অনুষ্ঠানে কবির প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন জেলা আইনজীবী সমিতির পক্ষে অ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত, খেলাঘরের পক্ষে সাংবাদিক মোহাম্মদ ইউসুফ ও রোজী সেন, সিপিবির পক্ষে মৃণাল চৌধুরী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে কবির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনার্থে এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন সংস্কৃতিকর্মী শিমুল বড়ুয়া। মঞ্চে রক্ষিত কবির প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক প্রদান করে বাসদ, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, উদীচী, বাংলাদেশ মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, মহিলা পরিষদ, অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, রেল শ্রমিক ইউনিয়ন, কেন্দ্রীয় যুবলীগ, চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতি, চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়ন। অনুষ্ঠানে শোকসঙ্গীত পরিবেশন করেন রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী আইরিন সাহা এবং 'ক্রান্তি শিল্পীগোষ্ঠী'।

চট্টগ্রাম সমিতি ঢাকার উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন এবং একুশের কবিতার প্রথম কবি ও ভাষাসৈনিক মাহবুব উল আলম চৌধুরী স্মরণে ২০ ফেব্রুয়ারি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির সভাপতি মো. জাহাঙ্গীর আলম খান সভাপতিত্বে সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, বিশেষ বক্তা ছিলেন সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, মাহবুব উল আলম চৌধুরীর স্ত্রী জওশন আরা রহমান। (দৈনিক চট্টগ্রাম মঞ্চ, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৮)

মাহবুব উল আলম চৌধুরীর মৃত্যু সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের জন্য ছিল অপূরণীয় ক্ষতি। নানাজনের স্মৃতিতর্পন ও মূল্যায়নে এ কথা পুনর্ব্যক্ত হয়েছে। তাদের মননধর্মে তিনি কিরূপে বিদ্যমান ছিলেন তার ছবি ভেসে ওঠেছে। তিনি প্রত্যক্ষভাবে না থাকলেও মানুষের মনে যে অম্লান থাকবেন– এই কথা উল্লেখ করেছেন বেগম মুশতারী শফী,

> তাঁর কর্ম ভরপুর গোটা জীবনের দিকে তাকালে বিস্ময় মানতে হয়, মানুষ যে সীমার মাঝে থেকেও কখনো সখনো সীমা অতিক্রম করে অসীমের পানে ধায়, সে কোন শক্তি বলে? শক্তি হলো তার মননে দেশপ্রেম এবং সুগভীর সমাজ চেতনা। এমন মানুষের তো কোনো মৃত্যু নেই, আছে জীবন। হয় তো তিনি 'নয়ন সমুখে নাই' কিন্তু আছেন তাঁর প্রিয়জনদের অনুরক্তদের অনুসারীদের স্মৃতিতে মননে আর হৃদয়ের অনুভবে চির অম্লান হয়ে।[২২৬]

কাজী আবু জাফর সিদ্দিকী তাঁর অমরত্বকে চিহ্নিত করেন বাংলা ভাষা ও প্রকৃতির মধ্যে,

> তাঁর স্মৃতি থাকবে চির ভাস্বর– যতদিন বাঙালি কথা বলবে মাতৃভাষা বাংলায়। যতদিন শাপলা ফুটবে বাংলার দীঘিতে সরোবরে। যতদিন দোয়েল শিষ দিয়ে ভোরের আলোকে করবে সুর মুখর। যতদিন পদ্মা-মেঘনা কর্ণফুলীর সুরমা ধলেশ্বরী মধুমতি, বুড়িগঙ্গা থাকবে জলধারায় বহমান– মাহবুব উল আলম চৌধুরী ততদিন বাঙালির প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে থাকবেন জাগরুক চেতনার সূর্যের মতো।[২২৭]

জীবনদর্শন ও সাহিত্যবৈশিষ্ট্য

মাহবুব উল আলম চৌধুরী ছিলেন আদর্শবাদী মানুষ। তাঁর বিশ্বাস ছিল উদার মানবতাবাদ, অসাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শ, ধর্মনিরপেক্ষতা, হিন্দ-মুসলিম সম্প্রীতি, বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং সমাজতন্ত্রে। এসব চেতনার সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর চরিত্র ও কর্মপ্রবাহে। এসব ভাবাদর্শ অর্জন করেছিলেন নিজের জীবন দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন, 'রক্তের অক্ষরে দেখিলাম আপনার রূপ/ আঘাতে আঘাতে চিনিলাম নিজেরে', তেমনি তিনিও সত্যমূল্য দিয়ে অর্জন করেছিলেন জীবনের এ মহত্তম দর্শন।

সম্পন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও বাল্যে হন মাতৃহারা, পিতা কর্মসূত্রে ছিলেন দূরে। বড় হয়েছেন নিকটাত্মীয়ের কাছে। অতত্রব জীবনের বাস্তববোধ শুরু হয় অল্পবয়সেই। তাদের ছিল অধ্বঃস্তন মানুষ। যারা বিনা পারিশ্রমিকে সেবা দান করতো। মনিবরা তাদের প্রতি অত্যাচার, নিপীড়ন ও শোষণ চালাতো। এসব বালক বয়সেই তাঁর মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করে। লিখেছেন, তিনি যে পরিণত জীবনে জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছেন এর প্রেরণা পেয়েছেন এই ঘটনা থেকে।

তিনি জন্মেছিলেন বিশ শতকের তিরিশের দশকের অন্তিমে। অতত্রব ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির শাসন নিশ্চয় তাঁকে স্পর্শ করে থাকবে। তিনি দেখেছেন পঞ্চাশের মম্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা– ছেচল্লিশে, পঞ্চাশে, কিছুটা ষাটে, দেখেছেন দেশভাগ– যেখানে হিন্দু সম্প্রদায় তাদের পূর্বপুরুষের ভিটামাটি ছেড়ে চলে গেছে ভিন্ন দেশে, মুসলিম সম্প্রদায় শুধু ধর্মের নামে নিজেদের পিতৃভূমি ছেড়ে এসেছে ভিনভূমিতে, বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম, সামরিক শাসন, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, বিশ্বশান্তি আন্দোলন। এসব ঘটনা ছাড়াও তাঁকে ছুঁয়ে গেছে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি, জীবনের সহজ-সরল ধারা, শ্রমজীবী মানুষ, সত্যকে আকঁড়ে ধরে থাকা অন্তজশ্রেণী– সর্বোপরি নীরবে প্রবহমান বিশাল মনুষ্যজীবন, নিরন্তর জীবনের আয়োজন। এসব জীবন ও ঘটনাধারা তাঁর জীবনে নিদারুণভাবে রেখাপাত করে। যেমন পঞ্চাশের মম্বন্তরের তিনি দেখেছেন অসহায় নিরন্ন মানুষ, শুধু ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে। তখন অর্থাভাবে তাঁর শিক্ষাজীবনেরও চ্যুতি ঘটেছিল। পরিবারের ভরণপোষণের জন্য খুলে বসেছিলেন মুদি দোকান ও রেস্টুরেন্ট। অতত্রব জীবনকে জানার বাস্তবতা ও সংজ্ঞা তিনি পুরোপুরি আত্মস্থ করেছিলেন প্রথম জীবনেই। আর এভাবেই নির্মিত হয় তাঁর জীবনদর্শন।

পারিবারিক ঐতিহ্য ও সমকালীন সংস্কৃতিও তাঁর জীবনদৃষ্টি তৈরিতে করেছে সহায়ক ভূমিকা। তাঁর মাতামহের কাছে পেয়েছেন আধুনিক শিক্ষার আলো, মাতামহীর কাছে মানবতাবাদ ও উদারতার আদর্শ। আর ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবার সঙ্গে সৌহার্দ্য ও সহমর্মিতা, সংস্পর্শ, ধর্মীয় গণ্ডির বাইরে তাঁকে এক সর্বজনীন মানুষে পরিণত করে। মাতুলের কাছে পেয়েছিলেন অসাম্প্রদায়িক বোধ, উদার সাংস্কৃতিক চৈতন্য। ফলে ভিতর-বাইরের মিথষ্ক্রিয়ায় তিনি পরিণত হন আদর্শবাদী চরিত্রে।

তাঁর চিন্তাদর্শনে কয়েকটি বিষয় বারবার এসেছে। তাহলো– বাংলার নবজাগরণ, হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি, অসাম্প্রদায়িকতা, জাতীয়তাবাদ, সর্বোপরি সমাজতন্ত্র তথা সাম্যবাদ। তাঁর মানসজগৎ এসব দিয়েই ঘেরা। তাঁর সাহিত্য, রাজনীতি, সংস্কৃতি সব এর মধ্যেই আবর্তিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনটি দৃষ্টান্ত দেয়া যাক–

১. যুগ যুগ ধরে হিন্দু-মুসলমান নানাভাবে মিলেছে, সামাজিক ক্ষেত্রে মিলেছে, মিলেছে কর্ম ক্ষেত্রে, মিলেছে ফসল ফলানোর মাঠে, মিলেছে রাজনীতিতে। তবে সবচেয়ে বেশি মিলনের জায়গা ছিল ভাষা-সাহিত্য, আচার ব্যবহার আর মনুষ্যত্বে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যারা গায়ে গা মিলিয়ে, পায়ে পা মিলিয়ে পাগড়ি-বদল ভাই হয়ে পরস্পরের হাতে রাখী বেঁধে এক সঙ্গে বাস করেছে, একদিন তারা হয়ে উঠল উন্মাদ– রক্তপাগল। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। তারপর চলল গড়িয়ে গড়িয়ে। তারপর বাঁধল জমাট। লিখে রেখে গেল এক কালো, মলিন অধ্যায়। বলে গেল এরা হিন্দু আর এরা মুসলমান।[২২৮]

২. বর্তমানে পৃথিবীর বড় বড় পণ্ডিত এবং বিজ্ঞজনেরা মনে করেন সোভিয়েট ইউনিয়নের পতন সমাজতন্ত্রের পতন নয়। সমাজতন্ত্রবাদ একটি বৈজ্ঞানিক সত্য, ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ যার ভিত্তি। বৈজ্ঞানিক সত্য অবস্থা সাপেক্ষে পরিবর্তিত হতে পারে কিন্তু কখনো মরে না। কারণ তার শিকড় মাটিতে। সোভিয়েট ইউনিয়ন সত্তর বছর জীবনে যা মানব সমাজকে দিয়েছিল এবং মানুষকে মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল তা পৃথিবীর ইতিহাসে মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠতম অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হবে।[২২৯]

৩. পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে বাঙালি মুসলমান তাদের ভবিষ্যৎ খুঁজে পায়নি। আটচল্লিশ সালেই পাকিস্তানের জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বাঙালি মুসলমানের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে উপেক্ষা করে তাদের কৃষ্টি, ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে সদম্ভে ঘোষণা করেন– একমাত্র উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে। এই তীব্র আঘাতে বাঙালি মুসলমানের বাঙালিত্ব জেগে ওঠে। স্বদেশ চেতনায় জাগ্রত হয়ে স্বগৃহে প্রবেশের যাত্রা শুরু হয়। তারই পরিণতি বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্টের বিজয়, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা, একাত্তরের রক্তস্নানের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন। বাঙালি জাতীয়তাবোধের চূড়ান্ত বিকাশ ধর্মনিরপেক্ষ, ভাষাভিত্তিক, সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন।[২৩০]

জীবনের সত্যোপলব্ধি দিয়ে বুঝেছিলেন মনুষ্যত্বই বড়। এজন্যে তার দু'টি প্রবন্ধের শিরোনাম 'হিন্দু নয়, মুসলমান নয়: মনুষ্যত্ব মানুষের প্রথম পরিচয়', 'সব মতের সেরা পথ– মানবধর্ম'। একটি গ্রন্থের নাম 'সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্তি'। মানুষকেই বড় করে দেখেছেন, কবির কণ্ঠে মিলিয়ে বলেছেন– সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই। সীমান্ত পত্রিকা যখন বের করেন তখন সামনে ছিল এই আদর্শ। আবার জিজ্ঞাসা রেখেছেন– কোন মানুষ? বলেছিলেন এর শ্রেণীগত ভিত্তি রয়েছে। অর্থ্যাৎ সেসব মানুষ, যারা অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত, ভাগ্যহত। তিনি তাদেরই জয়গান করতে চান।

এজন্যে সমাজতন্ত্রকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। জীবনের প্রথম দিকে যেমন, শেষপ্রান্তে এসেও তাঁর এই দৃষ্টি ক্ষয়ে যায়নি। মনে করতেন সমাজের বিকাশের জন্য সম্পদের সুষম বণ্টন এবং সমাজের সর্বস্তরের মানুষের বিকাশসাধন করা ব্যতীত সামাজিক বৈষম্য রোধ অসম্ভব। এর উপযুক্ত পথ হচ্ছে সমাজতন্ত্র, যেখানে মানুষের বিকাশের পথ হবে অবারিত, অর্থনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনা হবে রহিত। এই মনোভঙ্গি তিনি অর্জন করেছিলেন একদিকে সমাজ থেকে, অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক ধারার রাজনীতিতে আস্থা স্থাপন ও সক্রিয় সম্পৃক্ততার মাধ্যমে।

সমাজ ও জাতির বিকাশের জন্য জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। যদিও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তাঁর সহজাত। কিন্তু সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদে ছিল তাঁর অনাস্থা। এতদুদ্দেশ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের শেকড় সন্ধান করেছেন। এর সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করেছেন। তিনি ছিলেন বাঙালির সাংস্কৃতিক অখণ্ডে বিশ্বাসী। জাতীয়তার প্রশ্নে বলেছেন ধর্ম নয়, সংস্কৃতি হচ্ছে জাতীয়তার মুখ্য উপাদান, একে উপেক্ষা করলে জাতীয়তা মূল বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিকশিত হতে পারে না।

সমাজ হোক সমতাভিত্তিক, ধর্ম হোক ফসলের সুষম বণ্টন– তা-ই তিনি কামনা করেছিলেন। হাসনাত আবদুল হাই এ প্রসঙ্গে লিখেছেন,

> সমাজ পরিবর্তনের এবং সাম্যবাদের ভিত্তিতে প্রগতির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি তাঁর জীবনকে ভিন্নখাতে নিয়ে গিয়েছেন। হয়তো এই আদর্শবোধের জন্য প্রচলিত জীবনযাপন পদ্ধতির বিপরীতে তিনি এমন জীবনযাপন করেছেন যেখানে বিত্ত বা ক্ষমতার দাপট নয়, চিত্তের বিকাশ এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের লক্ষ্যই তাঁর জন্য ধ্রুবতারা হয়ে কাজ করেছে। শোষণহীন এবং সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজের প্রতি আকর্ষণের জন্যই তিনি সাধারণ জীবনযাপনে সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত।[২৩১]

এই বিশ্বাসের আলোকে বিশ শতকের চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশক কাজ করেছেন অবিশ্রান্ত ভাবে, অক্লান্ত কর্মী রূপে, ফলে, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর মনে করেন,

> তিনি নিজেকে সমৃদ্ধ করেছেন, সেই সঙ্গে সমৃদ্ধ করেছেন একটি প্রজন্মকে। ইতিহাস হারিয়ে যায় না, এক ধরনের মানুষের জীবন বৃত্তান্ত, কর্মধারা থেকে ঝিলিক দিয়ে ওঠে মানুষের বেঁচে থাকার ঐতিহ্য। মাহবুব উল আলম চৌধুরী বিভিন্ন অভিজ্ঞতার প্রান্তর ও উপত্যকা পেরিয়ে এসেছেন, আমাদের ভালোবেসে

> ফতুর হয়েছেন, বিশ্বাস করেছেন সমাজ রূপান্তরে। তার বিশ্বাস তার ইতিহাস বীক্ষা। সাম্যের মন্ত্র আমৃত্যু তার ঠোঁটে গুণগুণ করেছে।[২৩২]

তাঁর এই চিন্তাধারা ও ভাবাদর্শ বাস্তবিক শতসঙ্কট ও প্রতিকূলতার অভিঘাতে সৃষ্ট। রাজনৈতিক জীবনের জন্য তাঁর পরিবার হয়েছে বিপন্ন। সংস্কৃতিসাধনায়ও নানা ঝড়-ঝঞ্ঝার সম্মুখীন হন। কিন্তু একদিকে তাঁর প্রত্যয় ও প্রত্যাশা, অন্যদিকে সামাজিক প্রতিবন্ধক এ দুইয়ের দ্বন্দ্বে জয়ী হয়েছেন অবিশ্রান্তরূপে, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের মতে,

> তিনি কতকগুলো বিশ্বাস থেকে কখনো সরে আসেননি, যেমন মানুষকে ভালবাসা, অসাম্প্রদায়িকতার মধ্যে জীবনযাপান করা, গরিব ও নির্যাতিতের পক্ষে সব সময় থাকা। এই বিশ্বাসগুলো তিনি যন্ত্রের মতো মানেননি। সৃষ্টিশীলতার দিক থেকে তিনি এসব দেখেছেন, তার দরুন তিনি লড়াকু থেকেছেন সব সময়। ...তিনি যেমন কবি হওয়াকে বড় বলে ভেবেছেন, তেমনি কর্মী হওয়াকে জীবনের ব্রত বলে মনে করেছেন।[২৩৩]

মাহবুব উল আলম চৌধুরীর জীবনবেদে ঐক্য একটি মুখ্য প্রত্যয়। দেশ ও জাতির যে কোনো সমস্যা-সঙ্কটে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়াস নিয়েছেন, কী রাজনৈতিক অচলায়তন, কী সাংস্কৃতিক কূপমণ্ডুকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। মানুষের শক্তি তাঁর ব্যক্তিমানসের অন্তর্নিহিত হলেও তাকে প্রকাশের জন্য প্রয়োজন সামাজিক শক্তির। আর সামাজিক শক্তির বিকশিত রূপ হচ্ছে সত্যের শক্তি। এই প্রক্রিয়াকে অর্থবহ করতে প্রয়োজন ব্যক্তির যূথবদ্ধতা, নয়তো বৈরী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই কিংবা জয়ঢঙ্কা কে বাজাবে? তাই তিনি ঐক্যের মধ্যে মুক্তি খুঁজেছেন, মুক্তিকে নিশ্চিত করেছেন ঐক্যের প্রত্যয়ে। এজন্যে আতিকুল হক চৌধুরীর পর্যবেক্ষণ,

> একা যারা তারা তো নিঃসঙ্গ আর একত্রিত যারা, সক্রিয় যারা, সংগঠিত যারা, সংঘবদ্ধ যারা, গ্রহণযোগ্য সমাজ নির্মাণের সংগ্রামে তারাই আসলে শক্তিশালী। মাহবুব উল আলম চৌধুরী এই আদর্শের জন্য শুধু একত্রিত নয় একতাবদ্ধতা হওয়াতে বিশ্বাসী। এটাই তার প্রধান শক্তি ও বিশ্বাস আর এই বিশ্বাসকে আজ পর্যন্ত বুকের গভীরে লালন করে আছেন, এতটুকু তা নড়চড় হতে দেননি। এই বৈরী সময় ও প্রতিকূল পরিবেশেও ইস্পাত কঠিন সংকল্প নিয়ে যিনি আমাদের এই বিক্ষুব্ধ উত্তাল সমাজ সমুদ্রে ভেসে চলা একটি সাম্পানের সাম্পানওয়ালা– তারই নাম হচ্ছে মাহবুব উল আলম চৌধুরী।[২৩৪]

ঐক্যের মূল ভিত্তি আর্দশ। কারণ আদর্শহীন ঐক্য তো গুড়েবালি। তিনি ছিলেন আদর্শবাদী, জনমভর তাকেই শিরোধার্য রেখেছেন। আর শেষ পর্যন্ত আদর্শবাদী মাহবুব উল আলম চৌধুরীই মানুষের মনে জাগরূক থাকবেন– এই প্রত্যয় বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের,

> সাহিত্য যে ব্রত, সাহিত্য যে অনন্যকর্ম, সাহিত্য যে সমাজ পরিবর্তনের অঙ্গীকার, এসবই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাজে আমরা জেনেছি, তিনি এ পোড়া গরিব

> বাংলাদেশে এ উজ্জ্বল মশাল প্রথম থেকেই জ্বালিয়ে রেখেছেন। তিনি কখনো নতিস্বীকার করেননি অন্যায়ের কাছে, তিনি কখনো আপস করেননি সাম্প্রদায়িকতার কাছে, তিনি কখনো নিজেকে বিকিয়ে দেননি স্টাবলিশমেন্টের খুদ-কুঁড়োর লোভে। তিনি বেঁচেছেন শান্তির তরবারির মতো।[২৩৫]

তাঁর সাহিত্যভূবন যুগপৎ বৈচিত্র্যপূর্ণ ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। কবিতা দিয়ে সাহিত্যারম্ভ, মাঝে লিখেছিলেন নাটক, পরিণত জীবনে লিখেছেন প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও স্মৃতিকথা। যেসব সাহিত্য সমকালীন প্রেক্ষাপটে রচিত হলেও ছিল কালোত্তীর্ণ। বলা যায়, তাঁর প্রস্তুতি চলছিল সেসব রচনার মধ্য দিয়ে। কালকে তিনি ধারণ করেছিলেন, যুগের চাহিদা মিটিয়েছিলেন প্রগতিবাদী রাজনীতি ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ততার সূত্রে। তাই তাঁর সাহিত্যে গণমুখিতা মৌল বৈশিষ্ট্য। 'ভাঙন' নাটকটি লিখেছিলেন দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে, 'দারোগা' পুলিশি অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনার্থে, 'বিপ্লব' লিখেছিলেন কী করে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতা থেকে দেশকে মুক্ত করা যায় তার পথনির্দেশ করে। অমর একুশের প্রেক্ষাপটে রচিত 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি' সেই ধারাই সৃষ্টি। ঐতিহাসিক কারণে এই কবিতা পেয়েছে কিংবদন্তির মর্যাদা। তাঁর সাহিত্যাদর্শ সম্পর্কে আবুল মোমেনের মন্তব্য,

> মাহবুব উল আলম চৌধুরীর কর্মক্ষেত্র মূলত তিনটি– রাজনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি। রাজনীতি থেকেই তাঁর ঐতিহাসিক সাহিত্যকীর্তি কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি'– একুশের প্রথম কবিতা। কলাকৈবল্যবাদে তাঁর বিশ্বাস নেই, তিনি জীবনসম্পৃক্ত রাজনীতি সচেতন সাহিত্যসাধক। তাঁর সংস্কৃতি সাধনার পেছনেও এই রাজনীতি সচেতনতা ও রাজনৈতিক অঙ্গীকার কাজ করেছে।[২৩৬]

এই প্রত্যয় ও জিজ্ঞাসা তাঁর কবিতা, নাটক, স্মৃতিকথা ও প্রবন্ধ সাহিত্যে লক্ষ্যযোগ্য। অর্থ্যাৎ মানুষের জন্য সাহিত্য– এই অঙ্গীকার তার সাহিত্যকর্মে পরিলক্ষিত হয়। শুধু তাই নয়, সীমান্ত পত্রিকা, প্রান্তিক নব নাট্য সংঘ, সংস্কৃতি বৈঠকের ভাবাদর্শেও বলা হয়েছিল 'সবার ওপরে মানুষ সত্য' আদর্শকে ধারণ করতে। এই প্রত্যয়ে ছিল শ্রেণীগত ভিত্তি। এই চিন্তার প্রকাশ তাঁর সাহিত্যকর্মে প্রতিফলিত হয়েছে। জীবনের শেষদিনগুলিতে রচিত সাহিত্যেও এর ছাপ বিদ্যমান। কিন্তু এ গণমুখিতা তাঁর সাহিত্যকে স্লোগানে পরিণত করেনি। বরং শিল্পের সত্য মিটিয়ে নিয়ে এসেছেন সাহিত্যে মানবমুক্তির বাণী। এজন্যে আতিকুল হক চৌধুরী তাঁর সাহিত্যে প্রাণের সন্ধান পান, লক্ষ্য করেন সজীবতার বৈশিষ্ট্য,

> সীমান্ত থেকে শুরু করে মাহবুব উল আলম চৌধুরীর প্রতিটি রচনায় একটি পবিত্র নিরাসক্ত আবেগ আছে, পরিচ্ছন্নতা আছে, আছে সত্যের একটি সঠিক ঠিকানা। 'সীমান্ত সংগ্রহ' বইটি যৌবন চিত্ত প্রাণের উত্তাপ আছে, আলোকিত জীবনের উল্লাস আছে, উচ্ছ্বাস আছে, উৎসাহ আছে, উদ্দীপনা আছে, কিন্তু কোথাও নৈরাশ্য নেই, দীর্ঘশ্বাস নেই। তবে প্রতিটি লেখাতেই আছে একটি সুস্থ সমাজ গঠনে, শোষণহীন সমাজ গঠনে আপসহীন লড়াইয়ের সংবাদ।[২৩৭]

একুশে ফেব্রুয়ারির অমর কবিতাটি তাঁর শিল্পচৈতন্যের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। একই সঙ্গে ঐতিহ্য, আবেগ, প্রতিবাদ ও প্রত্যয়ের ছাপ পড়ে দীর্ঘ সেই কবিতায়। এই কবিতার পটভূমি ও তাৎপর্য সম্পর্কে মফিদুল হক লিখেছেন,

> কবিতার শুরু স্তবকে যেন কথা বলে চট্টলভূমি, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের অভিভাষণের অনুরণন যেন আমরা শুনতে পাই, প্রাণ উৎসর্গিত হয়েছে দেশের ও মাটির জন্য যেমন, তেমনি ঐতিহ্যের জন্য, পুঁথির জন্য, বাউল কীর্তন গজলের জন্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎসর্গিত-প্রাণ ছাত্রদের মধ্যে, আরো অনেক কিছুর সঙ্গে কবি যখন পান আরাগঁ-আইনস্টাইনের সাধনার ধারা, তখন অনুভব করা যায় বিশ্ব এসে কোথায় মিশেছে তাঁর মননে। পঞ্চাশ সালে যে শান্তি আন্দোলনের পুরোধা হয়ে উঠেছিলেন মাহবুব উল আলম চৌধুরী তাঁর প্রতিফলন মেলে এখানে। আরাগঁ যখন হয়ে ওঠেন শান্তি আন্দোলনের প্রধান সংগঠক, আইনস্টাইন সূচনা করেন পাগওয়াশ মুভমেন্টের। একই সঙ্গে তিনি ধ্বনিত করেন সাধারণ মানুষের জয়গান, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত কৃষক মজুরের পরিবার থেকে উঠে আসা তরুণদের জন্য অন্তরের হাহাকার ফুটে ওঠে কবিতার ছত্রে।[২৩৮]

কবিতাটি শুধু কালিক কারণে বিশিষ্টতা লাভ করেনি। এর যে অন্তর্গত বয়ন ও বক্তব্য, শিল্পসুষমা ও নৈপুণ্য– এর জন্যই কবিতাটি ঐতিহাসিক মর্যাদার দাবিদার। এ সম্পর্কে সনৎ কুমার সাহার পর্যবেক্ষণ,

> শিল্পের ইতিহাসই বলে, শিল্পগুণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে নির্জন কোটরের খোঁজ করে না, মানুষকে তা কাছে টানতে চায়। নির্মাণকলায় সার্থক সুমিতিও ওই কাছে টানার লক্ষ্যেই। নইলে আন্তরিকতা যতোই থাক, এলোমেলো বিশৃঙ্খলায় তার অনিবার্য অনর্থক অবসান। এই কবিতাটিতেও অবাক হয়ে যাই, ওই অসম্ভব উত্তেজনার মুহূর্তেও কোনো আতিশয্য ঢোকেনি। সংহত ক্ষোভ গুণটানা ধনুকের ছিলায় টানটান হয়ে থাকে। স্বপ্নস্মৃতি মায়ায় মানুষের সার্বিক উত্থানে দায়বদ্ধ যাত্রা ও বাস্তবের আকস্মিক আঘাতে স্বপ্নভঙ্গের বেদনা পরস্পরের আবেগে মিশে একাকার হয়ে যায়, কিন্তু আবেগই স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে না। তাকে নিয়ন্ত্রণ করে, সুশৃঙ্খল বিন্যাসে ধ্রুপদী মর্যাদায় উন্নীত করে, জাগ্রত চৈতন্যের এক তরুণ প্রাণ।[২৩৯]

মাহবুব উল আলম চৌধুরীর আক্ষেপ ছিল যে, একুশের কবিতার খ্যাতির জন্য তাঁর অন্যান্য সাহিত্যকৃতি চাপা পড়ে গেছে। এ সম্পর্কে রফিকুল ইসলাম লিখেছেন,

> এখানে নজরুলের উপমা টানা যেতে পারে, নজরুল 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনার আগে ও পরে অনেক উল্লেখযোগ্য কবিতা রচনা করলেও যেমন 'বিদ্রোহী' কবি রূপে খ্যাত, মাহবুব উল আলম চৌধুরী তেমনি 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি' রচনার আগে ও পরে অনেক কবিতা লিখলেও ওই একটি কবিতার জন্যই তিনি খ্যাত।[২৪০]

আনিসুজ্জামান তাঁর কাব্যবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লিখেছেন, 'সেই কৈশোর বয়সে এবং তারপরেও যেসব কবিতা তিনি লিখেছিলেন, তাতে ধরা পড়েছে চল্লিশের দশকে যাকে

প্রগতিশীল কবিতার ধারা বলা হতো, তার দাগ। মাহবুব উল আলম চৌধুরীর কবিতার বিষয় মুখ্যতঃ স্বদেশ, গৌনতঃ প্রেম। প্রেমের কবিতা কখনো কখনো স্বদেশের কবিতা হয়ে উঠে; স্বদেশ বিষয়ক কবিতা প্রায়ই সারা পৃথিবীর নির্যাতিত মানুষের কথায় পরিণত হয়।' তাই রফিকুল ইসলামের মতামত,

> মাহবুব উল আলম চৌধুরী একজন সমাজ সচেতন কবি। সুতরাং কবিতায় তাঁর অভিজ্ঞতার জগৎ বিধৃত হয়েছে ফলে আমাদের কালে এ অঞ্চলে গত ছয় দশক যে সব ঘটনা দেশ কাল সমাজ ও জীবনকে আলোড়িত এবং উন্মথিত করেছে আলোচ্য কবির কবিতায় তার ছাপ পড়েছে। কিন্তু তিনি শুধু সমকালীন আবেগকে তাঁর কবিতা ও ছড়ায় রূপায়িত করেননি সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত স্মৃতির অনুষঙ্গ তাঁর কবিতাকে হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন।[২৪১]

তাঁর শেষজীবনের কবিতায় ঐ প্রত্যয় অটুট ছিল। তাঁর একটি কবিতার শিরোনাম 'আমি যদি চলে যাই বন্ধ করো না লড়াই।' আরেকটি কাব্যগ্রন্থের নাম 'গরাদভাঙার সংগ্রামীরা জাগো'। ফলে উপলব্ধি করা যায়, সাহিত্যজীবনের ঊষালগ্নে যে সমাজ সচেতনতা, শ্রেণীচেতনা কাজ করেছে আমৃত্যু তা অক্ষুণ্ন ছিল।

তাঁর সাহিত্যকর্মের মধ্যে ছড়াও একই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। সেখানেও তিনি সামাজিক বৈষম্য, অন্যায়-অসঙ্গতি তুলে ধরেছেন, সৃষ্টি করেছেন আনন্দ ও রম্যরস। রাশেদ রউফ তাঁর ছড়ার মূল্যায়ন করে লিখেছেন,

> বিষয় ও প্রকাশভঙ্গির সামঞ্জস্য তাঁর ছড়ার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। যুৎসই অন্ত্যমিলের ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও শৈথিল্য থাকলেও তাঁর ছড়ায় রয়েছে ধ্বনির উৎফুল্ল অনুরণন। তিনি একদিকে যেমন ছোটদের আকর্ষণ করেছেন এবং আনন্দ দিয়েছেন, তেমনই স্বদেশ, সমাজ, ভাষা ও সামাজিকতা সম্পর্কে তাদের সচেতন করে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন।[২৪২]

তাঁর সাহিত্যকর্মে ইতিহাস ও ঐতিহ্যপ্রীতি অনিবার্য উপকরণ। ইতিহাসের ওপর তিনি দাঁড় হতে চান, নতুন ইতিহাস নির্মাণ করতে চান ঐতিহ্যের আলোকে। তাই স্মৃতিকথা 'স্মৃতির সন্ধানে' নিজের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন ঐতিহ্যের কথা। বারবার ইতিহাস ও ঐতিহ্য থেকে রস সিঞ্চন করেছেন, সঞ্জীবিত হয়েছেন। তাঁর নিজের কথায়,

> মানুষ চিরকাল আপন উৎসে যেতে চায়। শেকড়ের সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। তার পূর্বপুরুষের কথা জানতে চায়। তাদের কীর্তি-মহিমা, কৃতকর্ম, কাহিনী-গল্প, কৃষ্টি-সংস্কৃতি এবং সভ্যতার কথা জানতে চায়। এসব জানতে গিয়ে তারা অতীতবিহারী হয়। অতীতের আলোকে নিজেদের সমৃদ্ধ করে, গৌরববোধ করে। যে জাতির সভ্যতা যত পুরনো সে জাতি বিশ্বের দরবারে তত বেশি গৌরবের অধিকারী হয়। আমি আমার স্মৃতিকথায় অতীত সন্ধানী হয়েছি, যে অতীত আমাদের গৌরবের বস্তু, আমাদের অহঙ্কার।[২৪৩]

মহৎ কিছু কবিতার কথা স্মরণে রেখেও বলতে হয়, তাঁর শ্রেষ্ঠ কাজ 'স্মৃতির সন্ধানে'। জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা তিনি প্রকাশ করেছিলেন উত্তরকালের সমীপে। স্মৃতি মানেই

তো সহস্র মানুষ ও ঘটনার সংমিশ্রন। এর পরিশীলিত রূপ প্রকাশের জন্য প্রয়োজন পরিমিতিবোধ। আত্মকথার অন্তিমাংশে এ সম্পর্কে লিখেছেন,

> এই বয়সে স্মৃতিকথা লেখা কঠিন কাজ। সে দুঃসাহসী কাজে ব্রতী হয়ে দেখছি স্মৃতি লাফিয়ে চলছে। ঝর্ণার উৎসমুখ একবার খুলে গেলে সে যেমন তীব্র গতিতে লাফিয়ে উঠে– নিয়ন্ত্রণ মানে না, এও তেমনি। তাই বর্ষক্রম মেনে চলা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই যেমনভাবে আসছে, তেমনভাবে লিখে চলেছি। স্মৃতিতে কোনো মুখ যখন ভেসে ওঠে– নাম মনে আসে না, নামের জন্য অপেক্ষা করতে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলি। টানা লিখতে পারি না।[২৪৪]

আত্মজীবনীতে নিজের কথা বলতে গিয়ে ইতিহাসের কথা বলেছেন, ঐতিহ্যের কথা বলেছেন। এই সভ্যতা নির্মাণে যারা ঘাম ঝরিয়েছেন তাদের কথা বলেছেন– চট্টগ্রামের স্থানীয় ইতিহাস, কিংবদন্তি তুলে ধরেছেন– খাতুনগঞ্জের কাহিনী, রেয়াজুদ্দীন বাজারের ইতিহাস, চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ধারার ইতিবৃত্ত, পারিবারিক ঐতিহ্য, নিজ গ্রাম ও সন্নিহিত অঞ্চলের গুণীজনের পরিচয়, গুণীজনের জীবনী, লোকজীবনের পরিচয় ইত্যাদি। অর্থ্যাৎ তাঁর সমকালীন সমাজ এবং সে-সমাজের গৌরব গাঁথা তুলে ধরেছেন সযত্নে। বইটি সম্পর্কে আবুল হাসনাতের পর্যবেক্ষণ,

> বাল্য ও কৈশোরের কথা যেমন বলেছেন, তেমনি তিরিশ ও চল্লিশের দশকের সমাজ ও রাজনীতি, দুর্ভিক্ষ, মহামারি ও দাঙ্গার কথাও লিখেছেন। পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট হয়ে ওঠা ও অঙ্গীকারের চেতনাও লগ্ন হয়ে আছে। তিনি সমাজকে প্রত্যক্ষ করেছেন বিনির্মাণের আলোকে, মানুষকে দেখেছেন কোনো ক্ষুদ্র দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নয়। তাঁর হৃদয়ের ঔদার্য, প্রত্যক্ষণের দৃষ্টি যে কোনো পাঠকের ভাবনার বৃত্তকে সম্প্রসারিত করবে।... বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ও সমাজ বিকাশের ইতিহাস রচনায় এই গ্রন্থটি একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে।[২৪৫]

মাহবুব উল আলম চৌধুরীর সারা জীবনের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতির একটি অনবদ্য দলিল এই গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তাঁর দেশপ্রেম, সংগ্রামশীলতা, অসাম্প্রদায়িক চরিত্র, মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, রাজনৈতিক চড়াই-উৎরাই, শ্রেণী দ্বন্দ্ব ইত্যাদি বাঙ্ময় হয়ে ওঠেছে। নানা গুণীজনের স্মৃতি, বহু মণীষীর কৃতির মূল্যায়ন এ গ্রন্থে সুলভ। সব কিছু ছাপিয়ে ফুটে ওঠে তাঁর ব্যক্তিমানসের রূপ, অন্তর্জগতের ছবি ও সংস্কৃতিমানসের বৈশিষ্ট্য।

তাঁর গদ্যভাষা গতিশীল ও যুক্তিধর্মী, নির্মেদ ও ঋজু। যে কথা বলতে চান অপেক্ষাকৃত অল্প পরিসরে তা প্রকাশক্ষম। এ তাঁর পরিমিতবোধ ও শিল্পচৈতন্যের পরিচয়বহ। দীর্ঘ লেখার মধ্যেও পারম্পর্যতা থাকে অক্ষুণ্ন, লক্ষ্য থাকে স্থির। কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যাক,

১. রাষ্ট্র আমাদের নতুন—দেশ আমাদের নতুন নয়। এদেশের একটি সুপ্রাচীন ইতিহাস আছে। এই ইতিহাসের সবটাই সুখের নয়। এই ইতিহাসে বাঙালি মুসলমানদের ক্ষুব্ধ হওয়ার ছিল কিছু কিছু উপকরণ। দুই প্রধান সম্প্রদায়ের অসম উন্নতিকে কেন্দ্র করে এক সময়

সাম্প্রদায়িকতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেছিল। তাই আমাদের সংগ্রাম ছিল সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আর সামন্তবাদের বিরুদ্ধে। যেই সামন্তবাদ সাম্রাজ্যবাদ বিভেদের বীজ বুনে এবং সাম্প্রদায়িকতার জন্ম দেয়– তার বিরুদ্ধে। কেননা দুই সম্প্রদায়ের অসম উন্নতির কারণ ধর্ম নয়– শ্রেণী স্বার্থ।[২৪৬]

২. রবীন্দ্রনাথ বাঙালি জাতীয়তাবাদের শ্রেষ্ঠ রূপকার। আমাদের রুচি ও সৌন্দর্যবোধের নির্মাতা। বাঙালি মাত্রই তাঁর মানস সন্তান। বাংলার মাঠ-ঘাট, আকাশ-বাতাস, বনভূমি, নদী, সমুদ্র, পাহাড়-পর্বত আর তাঁর তামাটে নর-নারী জীবনকে তিনি আবিষ্কার করেছেন। অনবদ্য সৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। প্রকৃতিতে যে মানবিক অনুভূতি, রূপ, রস ও রঙের প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই, সেই কালাতীত সৌন্দর্যপ্রিয়তা রবীন্দ্রনাথই আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন। তিনি তাঁর লেখায় বাংলার অপরূপ সৌন্দর্যকে আমাদের চোখের সামনে তুলে না ধরলে আমরা হয়তো নান্দনিক দৃষ্টি দিয়ে স্বদেশকে উপলব্ধি করতে পারতাম না।[২৪৭]

৩. জাতীয়তাবাদ গঠনে ধর্মের ভূমিকা মুখ্য নয়। একটি জাতির মধ্যে একাধিক ধর্মের মানুষ থাকতে পারে, থাকেও। কিন্তু একটি ধর্মের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ থাকতে পারে না। যে বোধ বিভিন্ন ধর্ম, গোত্র ও শ্রেণীকে ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভৌগোলিক ঐক্য, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতে এবং সর্বোপরি ভাষাকে কেন্দ্র করে একত্রিত করে তারই নাম জাতীয়তাবাদ। এই বোধ থেকেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের উদ্ভব।[২৪৮]

চল্লিশের দশক থেকে যে বাঙালি সংস্কৃতিতে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী ধারা সৃষ্টি হয়েছিল তাতে তাঁর ছিল অনাস্থা। কারণ স্বভূমির ইতিহাস-ঐতিহ্য ছেড়ে মধ্যপ্রাচ্যের গৌরবময় ঐতিহ্যে আগ্রহী হওয়ার কথা নয়– হনওনি। তাঁর মতে,

> এ দেশের মাটিতে জন্ম নিয়ে, এ দেশের হাওয়া-বাতাসে নিঃশ্বাস টেনে, এ দেশের অন্নে পরিপুষ্ট হয়ে– এ দেশের মাটিতে ফুটে ওঠা ফুলের দিকে না তাকিয়ে বসরার গোলাপকে পূজা করা ছিল এক ধরনের ভ্রান্তি।..পাকিস্তানের তমসায় কোনোদিন আচ্ছন্ন হইনি। জীবনে ঐতিহ্যের মূলধারা থেকে কখনো বিচ্যুত হইনি। মধ্যপ্রাচ্যের বীরদের দিকে না তাকিয়ে আমি দেশের জাতীয় বীরদের প্রতি সারাজীবন শ্রদ্ধা পোষণ করেছি। সিরাজ-উদ-দৌলা, টিপু সুলতান, ঝাঁসির রাণী, তিতুমীর, ভগৎ সিং, প্রফুল্ল চাকী, বাঘা যতীন, মাস্টারদা সূর্যসেন, প্রীতিলতা– যারা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন, তারাই ছিলেন আমার দেশপ্রেমের উৎস।[২৪৯]

আর এই চেতনার প্রকাশ ঘটে ভাষা আন্দোলনে, তারই শিল্পমণ্ডিত ও নান্দনিক প্রকাশ একুশের অমর কবিতা। উনিশ শতকের রেঁনেসা নিয়ে তিনি ভেবেছেন। বাংলার

জাগরণের ইতিবাচকতাকে চিহ্নিত করেও এর ঊনতা সম্পর্কে ছিলেন সমানভাবে সজাগ। এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য,

> নবজাগরণের প্রধান লক্ষণ যুক্তিধর্মিতা ও বিজ্ঞানমনস্কতা। উদার মানবিক মূল্যবোধ ও মুক্তবুদ্ধির প্রসার। কিন্তু কোলকাতাকেন্দ্রিক এই নবজারণ একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও সকল সম্প্রদায়কে স্পর্শ করে সর্বত্রগামী হয় নাই। এর সঙ্গে প্রয়োগধর্মী বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির বলিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়নি। ধর্মনিরপেক্ষ ভিত্তিক নীতিবোধও তেমন গড়ে উঠেনি। উপমহাদেশের প্রধান স্বাধীনতা সংগ্রামী রাজনৈতিক দল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস মূলত ধর্মনিরপেক্ষ হলেও অসাম্প্রদায়িক চেতনার সুদৃঢ় ভিত রচনায় ব্যর্থ হয়। এটা এই নবজাগরণের প্রধান দুর্বলতা। জাতীয় জীবনে এই ট্রাজেডির জন্য বাঙালি মুসলমানদের গৃহে প্রত্যাবর্তন দীর্ঘায়িত হয়।[২৫০]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে উনিশ শতকে যে মধ্যশ্রেণীর সৃষ্টি তারা ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। ওই শ্রেণী উনিশ শতকে এসে বিকাশের চূড়ান্ত স্তরে উপনীত হয়, তাদের মধ্যে দেশপ্রেম প্রগাঢ় হয়, এবং দেশকে স্বাধীন করার জন্য তারা স্বপ্ন দেখতে থাকেন। কিন্তু শোচনীয় ব্যাপার হলো এই যে, এর সঙ্গে হিন্দু ঐতিহ্যগর্ব সংমিশ্রিত হলো। প্রকৃতপক্ষে জনগণের মধ্যে ব্যাপক ঐক্যসৃষ্টির লক্ষ্যে কিছুটা বিশ্বাস থেকে এটি হয়েছিল।

এদিকে মহাবিদ্রোহের পর থেকে মুসলিম সমাজ যখন ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে আত্মবিকাশ মাত্র শুরু করেছে, সৃষ্টি হয়েছে উঠতি মধ্যবিত্ত। তখনও তারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রাম করা মতো মানসিক শক্তি অর্জন করেনি। হিন্দু ঐতিহ্যগর্বের প্রবণতার জন্য মুসলিম সমাজ সে আন্দোলনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। ফলে বিভেদ জটিল আকার ধারণ করে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তার চূড়ান্ত পরিণতি। উনিশ শতকের কৃষকসংগ্রাম থেকে যে চেতনা নিয়ে রাজনৈতিক ভাবাদর্শ তৈরি হতে পারতো– সেখানে হয়েছিল ধর্ম নিয়ে। এজন্য হিন্দু-মুসলিম বিরোধ দেখা দেয়। এর ছাপ পড়ে বিশ শতকের রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে।

এজন্যে উনিশ শতকের শেষ দিকের মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী ধারাকে মাহবুব উল আলম চৌধুরী দায়ী করলেও এ কথা স্মরণ রাখতে হবে, তখন মুসলিম সমাজের বিকাশ শুরু হয়েছে মাত্র। যেমন মহাবিদ্রোহকে হিন্দু মধ্যশ্রেণী সমর্থন করেনি একই শ্রেণীভিত্তি থেকে। স্বদেশী ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন হিন্দু মধ্যবিত্ত করতে পেরেছিল এ কারণে যে ততদিনে তাদের বিকাশ সাধন সম্পন্ন হয়েছে। তারা ব্রিটিশকে চিহ্নিত করতে পেরেছিল সাম্রাজবাদী শক্তি হিসেবে। কিন্তু এই যাত্রায় তারা মুসলমানদের কাছে টানতে পারেনি। উনিশ শতকের জাগরণের বড় ত্রুটি হচ্ছে এটি। মাহবুব উল আলম চৌধুরী এই ঊনতা নির্দেশ করে নিজেই জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়েছেন– যা ইতিহাসের চূড়ান্ত সত্য হিসেবে বিবেচিত– অর্থনৈতিক বৈষম্য ও সম্পদের অসম বণ্টন ছিল এই সঙ্কটের মূল কারণ। লিখেছেন,

> আসলে হিন্দু-মুসলমানের প্রকৃত দ্বন্দ্ব ধর্মীয় নয় এবং সামাজিক নয়, এ দ্বন্দ্ব অর্থনৈতিক। পাশ্চাত্য শিক্ষায় পশ্চাৎপদ মুসলমান সম্প্রদায় শিক্ষিত হয়ে ওঠার পর দেখে তাদের এগিয়ে চলার সমস্ত পথ রুদ্ধ। রুটি-রুজি এবং মর্যাদা সমস্ত পদ অধিকার করে আছে হিন্দু সম্প্রদায়। তাছাড়া তারা ছিল হিন্দু জমিদারদের অত্যাচারে নিষ্পেষিত। কংগ্রেস অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী সংগঠন হলেও মুসলমানদের এই সমস্যা বুঝতে চায়নি।[২৫১]

রচনা-পরিচয়

মাহবুব উল আলম চৌধুরীর গ্রন্থ সংখ্যা চব্বিশ। এর মধ্যে রয়েছে কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ, ছড়া ও আত্মজীবনী। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থগুলি মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকবাহিনী জ্বালিয়ে দেয়। সেসব আর উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এগুলির মধ্যে রয়েছে কাব্যগ্রন্থ: আবেগধারা (১৯৪৪), ইস্পাত (১৯৪৫), অঙ্গীকার (১৯৪৬), নাটক: ভাঙন (১৯৪৩), দারোগা (১৯৪৪), আগামীকাল (১৯৫৩), উপন্যাস: বিষের নেশা (১৯৪৬), পুস্তিকা: বিপ্লব (১৯৪৬, বাজেয়াপ্ত), মিশরের মুক্তিযুদ্ধ (১৯৫৬)।

বাকী তেরটি গ্রন্থের মধ্যে তাঁর জীবৎকালে বের হয় সাতটি, ২০০৭ সালে মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় ছয়টি। তাঁর অন্তিমেচ্ছায় বাকী বইগুলি প্রকাশ করা হয়। গ্রন্থসমূহের পরিচয় প্রকাশের কালানুক্রমে বিবৃত হলো–

১.

কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি। ঢাকা: সুবর্ণ, ১৫০ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম; প্রথম প্রকাশ ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮, দ্বিতীয় প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০২; প্রচ্ছদ কাইয়ূম চৌধুরী, মূল্য পঞ্চাশ টাকা, পৃষ্ঠা ৬০। উৎসর্গ: 'আমার প্রয়াত মামা/ আহমদ কবির চৌধুরী/ আহমদ সাগীর চৌধুরী/ ও/ লুৎফে আহমদ চৌধুরীর/ পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে।

সূচিপত্র: নজরুলের উদ্দেশ্যে, আমি এক দূরন্ত সৈনিক, ভাল লাগে, মালবিকা, সূর্যদিন, মাটির গান, স্বাধীনতা, জাপানিরা হিরোহিতোর জন্য হারিকিরি করে, তোমার চুল, কল্পনার মুহূর্ত, হে পৃথিবী, উড়ে চলে গেছে পাখী, প্রিয়তমাসু, কুকুরের কান্না, রবীন্দ্রনাথের প্রতি, পঁচিশে বৈশাখ, জন্ম যন্ত্রণা, অবাঞ্ছিত, কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি, হতাশার গান, নস্ট্যালজিয়া, বুদ্ধিজীবী, পালাই পালাই, কুয়াশার বীজ, পরিক্রমা, জীবনের সফলতা, দিয়ে যাই বলি, একুশ: ১৯৭০, দুঃসময়:১৯৭১, অঙ্গীকার, একুশ: ১৯৭২, জারজেরা সব শোন, একটি নদীর নাম, স্বাধীনতা: ১৯৮৪ ভয় লাগানো গোঁফ, জসিমুদ্দীনের মৃত্যুতে, ওরা দুইজন, এ.বি.সি, ছড়া

গ্রন্থের 'ভূমিকা' লিখেছেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। পুরো ভূমিকা নিম্নরূপ,

> মাহবুব উল আলম চৌধুরী (জ. ১৯২৭) এককালে চট্টগ্রাম থেকে 'সীমান্ত' নামে একটি মর্যাদাবান মাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করতেন (১৯৪৭–৫২)। চট্টগ্রামের ছাত্র-আন্দোলন, রাজনৈতিক উদ্যোগ ও সাংস্কৃতিক কর্মধারার সঙ্গে

তিনি খুব ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি কবিতা, ছোটগল্প, প্রবন্ধ ও নাটক লিখতেন, তার মধ্যে বেশ কিছু রচনা সমঝদারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু তাঁর বিশেষ একটি কবিতা রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল, সরকারী আদেশে বাজেয়াপ্ত হয়েছিল এবং মাহবুব উল আলম চৌধুরীর খ্যাতি বিস্তৃততর ক্ষেত্রে পরিব্যপ্ত হয়েছিল।

কবিতাটির নাম "কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি"। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে ঢাকায় গুলিবর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে লেখা এটিই ছিল প্রথম কবিতা। মাহবুব উল আলম চৌধুরী সে-সময় চট্টগ্রাম জেলা রাষ্ট্রভাষা-সংগ্রাম-পরিষদের আহবায়ক ছিলেন। একুশে ফেব্রুয়ারীর ঠিক আগে আগেই তিনি আকস্মিকভাবে জলবসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। ঢাকার ছাত্রহত্যার খবর পেয়ে একুশে রাতেই রোগশয্যায় শুয়ে এই দীর্ঘ কবিতাটি তিনি রচনা করেন। রাতেই সেটি মুদ্রিত হয় এবং পরদিন প্রচারিত ও চট্টগ্রামের প্রতিবাদ সভায় পঠিত হয়। এই ঘটনার বিবরণ দিয়ে খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস লিখেছেন:

> জলবসন্তে আক্রান্ত সুশ্রী মাহবুব আল আলম চৌধুরীর সুদীপ্ত দুটি চোখে ঝরছিল আগুন। তাঁর কলম দিয়ে বেরিয়ে আসে আগ্নেয়গিরির লাভার মতো জ্বলন্ত এক দীর্ঘ কবিতা, "কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি" আন্দরকিল্লায় অবস্থিত একটি প্রেস কবিতাটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশের দায়িত্ব পড়ে আমার উপর। ব্যবস্থা হয় সারা রাত প্রেসে কাজ চালিয়ে পরদিন সকাল বেলার মধ্যে গোপনে প্রকাশ করতে হবে অমর একুশের প্রথম সাহিত্য সৃষ্টি, প্রথম সাহিত্য সংকলন।
>
> রাতের শেষ প্রহরে কম্পোজ ও প্রুফের কাজ যখন সমাপ্ত প্রায়, হঠাৎ একদল সশস্ত্র পুলিশ হামলা করে উক্ত ছাপাখানায়। প্রেসের সংগ্রামী কর্মচারীদের উপস্থিত বুদ্ধি ও ক্ষিপ্ততার মধ্যে দ্রুত লুকিয়ে ফেলা হয় আমাকে সহ সম্পূর্ণ কম্পোজ ম্যাটার। তন্নতন্ন করে খোঁজাখুজির পর পুলিশ যখন খালি হাতে ফিরে চলে যায় শ্রমিক কর্মচারীরা পুনরায় শুরু করেন তাদের অসমাপ্ত কাজ। শ্রমিক শ্রেণী যে ভাষায় যে দেশে যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, তার সংগ্রামী চেতনা যে অসাধারণ তার প্রমাণ সেদিন হাতে হাতে পেয়েছিলাম চট্টগ্রামে। দুপুরের মধ্যে মুদ্রিত ও বাঁধাই হয়ে প্রকাশিত হয় "কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি"। ....
>
> অপরাহ্নের লালদীঘির ময়দানের জনসমুদ্রে সভাপতির আসন অলংকৃত করলেন চট্টগ্রামের মুসলিম লীগ নেতা জনাব রফিউদ্দিন সিদ্দিকী। সভার কর্মসূচীর এক পর্যায়ে ছিল মাহবুব উল আলম চৌধুরীর রচিত "কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি" পাঠ। কবিতার যেমন ভাষা, তেমনি তার ভাব, তেমনি ছন্দ। শ্রোতাবৃন্দ একেকবার উত্তেজিত হয়ে ফেটে পড়ছেন আর আওয়াজ তুলছেন 'চল চল ঢাকা চল'।

দেশের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার সৌভাগ্য হয় না সকল সাহিত্যকর্মের। এই কবিতাটি তা হয়েছিল। বাজেয়াপ্ত হলেও হাতে হাতে কবিতাটি পূর্ব বাংলার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে গিয়েছিল।

পাদটীকা স্বরূপ একটি কথা বলা দরকার। এই কবিতায় একুশে ফেব্রুয়ারির চল্লিশজন শহীদের উল্লেখ করা হয়েছে। তথ্য হিসেবে এটি অতি রঞ্জিত মনে হতে পারে। কিন্তু তখন আমাদের এমনই ধারণা হয়েছিল। হাসান হাফিজুর রহমানের সুবিখ্যাত "অমর একুশে" কবিতায় পঞ্চাশজন শহীদের কথা বলা হয়েছে। তিনিও তো ভাষা আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন।

একুশের প্রথম কবিতা যে মাহবুব উল আলম চৌধুরী লিখলেন, তা হয়তো এক আকস্মিক ঐতিহাসিক ঘটনা। কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারি নিয়ে কবিতা তাকে লিখতেই হতো– তার সমগ্র জীবনাচরণ ও সাহিত্যচর্চার ধারায় তা ছিল অনিবার্য। নিতান্ত অল্প বয়স থেহে রাজনীতি ও সংস্কৃতিকে তিনি মিলিয়েছেন একই স্রোতে।

সেই কিশোর বয়সে এবং তার পরেও যেসব কবিতা তিনি লিখেছিলেন, তাতে ধরা পড়েছে চল্লিশের দশকে যাকে প্রগতিশীল কবিতার ধারা বলা হতো, তার ছাপ। তাঁর ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন সম্ভবতঃ প্রায় সমবয়সী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য এং কিছুটা সুভাষ মুখোপাধ্যায়। "প্রিয়তমাসু" ও "রবীন্দ্রনাথের প্রতি" শিরোনামের কবিতা তো সুকান্তই লিখেছিলেন; "একটি মোরগের কাহিনী" হয়তো "কুকুরের কান্না"র প্রেরণাস্থল; ভাব, ভাষা ও ভঙ্গিতে সুকান্তের প্রেরণা আরো আছে। "অঙ্গীকার"– কবিতাটি-বিশেষ করে তার প্রথম স্তবক-মনে করিয়ে দেয় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের "মে-দিনের কবিতা"কে। মাহবুব উল আলম চৌধুরী এঁদের রাজনৈতিক বিশ্বাসের অংশীদার ছিলেন এবং এ-বিশ্বাসকে কবিতায় সমর্পণ করার অঙ্গীকার তিনি করেছিলেন, আর কারো কাছে নাহোক, নিজের কাছে।

মাহবুব উল আলম চৌধুরীর কবিতার বিষয় মুখ্যতঃ স্বদেশ, গৌনতঃ প্রেম। প্রেমের কবিতা কখনো কখনো স্বদেশের কবিতা হয়ে উঠে; স্বদেশবিষয়ক কবিতা প্রায়ই সারা পৃথিবীর নির্যাতিত মানুষের কথায় পরিণত হয়। তিনি বলছেন:

কামনা করিনি কভু উষ্ণবক্ষ প্রেয়সীর গাঢ় আলিঙ্গন
কাঁঠালিচাপার গন্ধ মুক্তপক্ষ পাখিদের গান
চাঁদের রূপালি আলো সমুদ্রের স্নান
একখানি ছোটঘর ছবির মতন
কমলকলির মতো আকাঙ্খারা পথ-উন্মীলন
আমি বুঝি চাই নাই প্রিয়ার চুলের ছায়া বুকের বিশ্রাম
প্রতিদিন ঘরে এসে কর্মশেষ মুহূর্তের দাম

(প্রিয়তমাসু)

কিন্তু নিষ্ঠুর বাস্তব এই স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাকে সত্য বা চরিতার্থ হতে দেয়নি। তাই তাঁর প্রতিজ্ঞা শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করবেন।

তাঁর বেদনাবোধ কখনো কখনো সরাসরি প্রকাশ পেয়েছে, কখনো তা রূপান্তরিত হয়েছে ক্রোধে, কখনো বা চাপা বিদ্রুপেঃ

আমরা এদেশের নিরক্ষর মানুষ
রাজা আর রাষ্ট্রপতির তফাৎ বুঝি না,
আমরা আপনাদের রাজা বলেই জানি
হলেনই বা রাজা তবু স্বদেশী তো,
রাজা হিরোহিতোর সন্মানের জন্য
জাপানীরা এখনও হারিকিরি করে,
আপনাদের সম্মানের জন্য
আমরা কি উপোস থাকার মতো
ত্যাগও স্বীকার করতে পারবো না?

(জাপানীরা হিরোহিতোর জন্য হারিকিরি করে)

কবিতা রচনা, জীবনগঠন আর বিপ্লবপ্রয়াস তাঁর কাছে হয়ে ওঠে একই বিষয়ঃ

তাই আমার মনের এই ভাললাগাটাকে
খুব সযত্নে পাহারা দিয়ে আমি চলছি
উদ্দাম জনযাত্রার মিছিলের সাথে সাথে
যেখানে নির্দেশ পেয়েছি আরও একটি কবিতা রচনার।
যে কবিতা তোমার আমার সকলের একান্ত আপনার।

(ভাল লাগা)

এমন কি, এক পর্যায়ে তিনি ভাবছেন একুশের কবিতাও রচনা করবেন নাঃ

সাম্যের স্বদেশভূমি গড়ার শপথ নিয়ে
যারা আজ নেমে গেছে দুরন্ত সংগ্রামে
আসাদের রক্তমাখ ছেঁড়া সার্ট বুকে চেপে
চলে গেছে দুরান্তের গ্রামে
তাহাদের সাথে আমি হাঁটিতেছি পথ
যেখানে কাস্তের মুখে।
কিষাণের তীব্রতর ঘৃণা
দেখিতেছি সেইখানে
সালামের গুলিবিদ্ধ কলজেটা খুঁজে পাই কিনা।

(একুশ ১৯৭০)

এই বই মাহবুব উল আলম চৌধুরীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। ১৯৪৬ থেকে ১৯৮৪ সালের মধ্যে তাঁর উনিশ থেকে সাতান্ন বছর বয়সের মধ্যে লেখা কবিতা এতে সংকলিত হয়েছে। এ-সময়ে বিশ্বে ঘটেছে অভাবিত পরিবর্তন দেশে দেশে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটেছে, সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে; যুদ্ধপ্রয়াস

চলেছে যেমন তেমনি চলেছে শান্তির আন্দোলন। আমরা সাম্রাজ্যবাদী শাসন থেকে মুক্ত হয়েও আরেক ধরনের ঔপনিবেশিক শাসনে পরিণত হয়েছি, তার থেকে মুক্তি লাভের জন্যে যুদ্ধ করেছি। তারপরেও শোষণ ও বঞ্চনার শেষ হয়নি, শেষ হয়নি ষড়যন্ত্রের। মাহবুব উল আলম চৌধুরীর কবিতায় প্রায় চল্লিশ বছরের এসব ঘটনার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর অনেক কবিতার বিষয় এক অর্থে সাময়িক; কিন্তু সময়ের বদলে যেহেতু আমাদের ভাগ্য পরিবর্তন হয় না, তাই সেই সাময়িক পেয়ে যায় চিরন্তনের আসন:

রাজারে রাজা এ কেমন সাজা
উঠতে গেলে বসতে বলিস
বসলে গেলে ছুটতে।
হরিণ হয়ে ছুটি যদি
বলিস তখন উড়তে।
হাতে পায়ে শিকল দিলি
কেমন করে উড়বো।
বুকে জ্বালা মুখে তালা
কেমনে মুখ খুলবো। ...
ভাই মেরেছিস বোন মেরেছিস
কেমন করে হাসবো
বজ্র হয়ে আসবো।

(ছড়া)

ভাগ্যিস ছড়ার শেষে রচনাকাল দেওয়া আছে ১৯৬০ নইলে কী ভুলইনা বুঝতে পারতাম!

'কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি' বইতে ধরা পড়েছে ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এবং একজন সংবেদনশীল মানুষের অন্তরঙ্গ অনুভূতি। আর তা যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে তাতে মাহবুব উল আলম চৌধুরীর স্বভাবটি আমাদের কাছে উন্মোচিত হয়; তিনি কবি, তিনি সমাজপরিবর্তন প্রয়াসী সৈনিক।

তৃতীয় প্রকাশ ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৫, ঢাকা: পালক পাবলিশার্স, ৮/২ নর্থ সাউথ রোড, পুরানা পল্টন, মূল্য পঁচাত্তর টাকা। অন্যান্য তথ্য পূর্ব সংস্করণের অনুরূপ।

২

ছড়ায় ছড়ায়, ঢাকা: সীমান্ত প্রকাশন, প্রকাশকাল ১৫ ডিসেম্বর ২০০৪, প্রচ্ছদ রফিকুন নবী, মূল্য একশত টাকা, পৃষ্ঠা ৩২। উৎসর্গ: 'আমার প্রিয় নাতি/ ইখতিসাদ আহমেদ/ ইবতিসাম আহমেদ-কে'।

সূচিপত্র: আমাদের গর্ব, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, বজ্র হয়ে আসবো, রাঙামাটি লাল নয়, খবর, নদীর ধারে হাট বসেছে, গল্প এনেছি, কেন, ভুতুম করে খাই খাই, এ কোন সোনার

দেশ, সুমন, উল্টো দেশ, কলম দিলাম উড়িয়ে, নাচতে যাবো না, উড়ে ঠাকুর, দেশের সুদিন আসবে, গবু রাজা, সবই ভালো, আমীর আলী ডাক্তার, আজব দেশ, ডলফিন

৩
সূর্যাস্তের রক্তরাগ, ঢাকা: সীমান্ত প্রকাশন, প্রকাশকাল ১৫ ডিসেম্বর ২০০৪, প্রচ্ছদ কাইয়ূম চৌধুরী, মূল্য দেড়শত টাকা, পৃষ্ঠা ১৬০। উৎসর্গ: 'জওশন আর রহমান-কে/ যে আমারে দেখিবারে পায়/ অসীম ক্ষমায়/ ভালমন্দ মিলায়ে সকলি।'

সূচিপত্র: সূর্যাস্তের রক্তরাগ, হে আকাশ একটু কাছে এসো, স্বাধীনতা তুমি কার স্বাধীনতা, সকল ভোরে ফুল ফোটেনা, ইয়াসির আরাফাতের মৃত্যুতে, আবার এসেছি, তুমি এসেছ তবু তুমি আস নাই, তুমি কী কাঁদো, কুসুম, পঞ্চশিখা, যদিও কঠিন, সূর্যতরু, তোমরা নেই, তুমি নেই, আমার মৃত্যুতে, স্বর্গে কি চাঁদ ওঠে, পথ চলাতেই আনন্দ, আজ রাখী বন্ধনের দিন, কাজী নজরুল ইসলাম, আমি যাকে ভালবাসি, আইভী রহমানের মৃত্যুতে, আমার কিশোরী মা, ভুলে যাও, ফুল আর রাষ্ট্র, কার সাথে কথা বলবো, তাই ভালো, আমার ইচ্ছা, জেগে আছি, একবার কনে হতে চাই, দীননাথের চিঠি পেয়ে, আলোর লড়াই চালিয়ে যাও, সে আসে নাই, কোন এক ভাবীকে, ভালবাসার দিন, কেন এল, তোমাকে, শুধু তোমাকে মনে পড়ে, সে, আমার মৃত্যু হলে, একদা আমরা, তোমার মুখ, বজন কি এতই সহজ, অনেক দিন পর দেখা হলো, এসো অন্তরে, ঠিকানা, বুলবুল স্ত্রী পরমাকে, আমরা ঘুমাবো না, কখন পড়েছি, লাইলীবুর জন্য, নির্জন কবর, আমার জন্মদিনে, যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, সামাদ ভাইকে, তখন তুমি এসো, যখন সে হেঁটে যায়, তুমি বলেছিলে, কোন খেদ নেই, জননীঃ কবি সুফিয়া কামালের প্রতি, দরজাটা খুলে দিতে চাই,. কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে, শামসুর রাহমান, স্থপতি, সাহস ফুরিয়ে গেলে, প্রার্থনা, হে ঈশ্বর, সময়ের স্মৃতি, আজ আর নাই, প্রিয় বন্ধু, টুলুর হাসি, তোমার প্রশ্রয় পেলে, ফাহমিদা খাতুন লীনুকে, এখনো গেলনা আঁধার, মুনীর চৌধুরী, তোমার চুল, রবীন্দ্রনাথ, এত ভালবাসা রাখবো কোথায়, এইতো সময়, রাধা, মহামানব, যেতে হবে অনেক দূর, বনস্পতির কান্না, ক্ষত কণ্ঠের গান, বুকে নিতে পারি, লেনিন, শবেবরাত, কবিতা, পেটে ভাত না থাকলে, বলা হয় নাই, যেখানে আমি লড়াই করছি, গান, জোনাকীর আলো, মুন্নির জন্মদিনে, রক্তঋণ, মোহ, প্রসঙ্গ: একুশের প্রথম কবিতা, কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি।

৪
সংস্কৃতি: জাতীয় মুখশ্রী, ঢাকা: পালক পাবলিশার্স, প্রকাশকাল ৩০ জুলাই ২০০৬, প্রচ্ছদ আমিনুল ইসলাম, মূল্য তিনশত পঞ্চাশ টাকা, পৃষ্ঠা ৪৩২। উৎসর্গ: 'অগ্রজপ্রতিম কবীর চৌধুরী/ ভ্রাতৃপ্রতিম আনিসুজ্জামান/ শিল্পী বন্ধু আমিনুল ইসলাম।'

সূচিপত্র: প্রবন্ধ– সংস্কৃতি: জাতীয় মুখশ্রী, উত্তাল পঞ্চাশ, বাংলার র‍্যানেশাঁস ও বাঙালি মুসলিম সমাজ, দেশাত্মবোধক গানের ধারা, রবীন্দ্রনাথ: আমাদের ঠিকানা, রবীন্দ্রনাথের জীবনে শোকের অধ্যায়, নজরুল এবং আমার কিছু স্মৃতি, সংস্কৃতির কথা, সব মতের সেরা পথ মানুষ-ধর্ম, বঙ্গবন্ধুর কাছে খোলা চিঠি, জাতি সমস্যা ও শিল্প-

সাহিত্য প্রসঙ্গে লেনিন, বাঙলা দু'বার ভাগ হলো, ১৯৪৭ সালে কোন পরিস্থিতিতে কী উদ্দেশ্য নিয়ে 'সীমান্ত' বের করি, অমর একুশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, আমার স্মৃতিতে ভাষা আন্দোলন, গুলির খবর শুনেই লিখে ফেলি কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি, একুশের চেতনা, মিসরের মুক্তিযুদ্ধঃ ১৯৫৬ সালে সুয়েজখাল জাতীয়করণ, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট, মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ প্রসঙ্গে, শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন, বাংলাদেশঃ জাতীয় সংহতি, বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক, ভারত কি আমাদের শত্রু, ২০০০ঃ সূর্যোদয়ের প্রত্যাশা, গণতন্ত্রের ট্রাজেডি, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসঙ্গে, ছাত্র রাজনীতিঃ শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' ত্যাগের উদ্বোধন, সাঈদা কামালের শিল্প প্রদর্শনীঃ কাছে-দূরে, ফিরে দেখা।

কতিপয় প্রিয় মানুষের রেখাচিত্র; আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, আমার রাজনৈতিক গুরু হুমায়ুন কবির, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, মুহম্মদ হবিবুল্লাহ বাহার, আবুল ফজল, জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, শিল্পী-যোদ্ধা কলিম শরাফী, বদরুদ্দীন উমর, গান ও সুরের রাজা ওস্তাদ মোমতাজ আলী খান, কথাশিল্পী হাসনাত আবদুল হাই, কমল দাশগুপ্ত স্মরণে, ফিরোজা বেগম, কণ্ঠশিল্পী আবদুল লতিফ, মুস্তাফিজুর রহমান খান, প্রাজ্ঞজনের স্নেহধন্যাঃ সেলিনা বাহার জামান, কামাল লোহানী, ক্রোধী কবি ত্রিদিব দস্তিদার, হাসান আজিজুল হককে শুভেচ্ছা, অজাতশত্রু আজিজুস সামাদ, আমার সহযোদ্ধা ইমাদুল্লাহ, বুলবুল মহলানবীশ, তারুণ্যের প্রতীক কবি আসলাম সানী

সাক্ষাৎকারঃ দৈনিক বাংলা, দৈনিক আজাদী, সুপ্রভাত বাংলাদেশ, দৈনিক পূর্বকোণ, আজকের কাগজ, দৈনিক স্বাধীনতা, রেডিও বাংলাদেশ, দৈনিক পূর্বকোণ, সাপ্তাহিক সিনেমা, বইমেলা বুলেটিন, অন্যদিন।

অভিভাষণঃ চট্টগ্রামের নাট্যোৎসবে উদ্বোধনী ভাষণ, চট্টল পুরাণঃ উদ্বোধনী ভাষণ, অনোমার সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণ, চট্টগ্রাম সঙ্গীত পরিষদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে লেখা পত্র, ক্রান্তির সংবর্ধনায় প্রদত্ত ভাষণ, 'হামদর্দ সন্ধ্যা'য় প্রদত্ত ভাষণ।

৫

সূর্যের ভোর, ঢাকাঃ পালক পাবলিশার্স, প্রকাশকাল ১৫ অক্টোবর ২০০৬, প্রচ্ছদ মোমিন উদ্দীন খালেদ, মূল্য একশত টাকা, পৃষ্ঠা ৯৬। উৎসর্গঃ 'সনৎ কুমার সাহা, ফাহমিদা খাতুন/উভয়ে পেশার ক্ষেত্রে অভিন্ন/উভয়ে বরেণ্য শিক্ষাবিদ/একটি বিশেষ ক্ষেত্রে উভয়ের গভীর মিল।/দুজনই রবীন্দ্র-প্রেমী।/একজন রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী/ অপরজন অর্থনীতিবিদ হয়েও রবীন্দ্র-সমুদ্রে ডুব দিয়ে/মুক্তা আহরণে সচেষ্ট।'

সূচিপত্রঃ সূর্যের ভোর, প্রিয়সখা কবি শামসুর রাহমান, নাসরীনের হাসি, প্রিয়ভাজন সনৎ সাহাকে, আমার জন্মদিনে, ছেলেবেলার কথা, দিন এসে গেছে ভাইরে নতুন করে পৃথিবীতে আলো জ্বালাবার, কেউ কবিতা শোনেনা আর, সবুজ মাটির টানে, এতো মৃত্যু কখনো দেখেনি কেউ, একটি লাল গোলাপ অলি আহাদকে, তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ, লক্ষ্মীটি এমন করো না আর, কোলকাতা, মাঘোৎসবের চাঁদ তুমি কেমন আছো, অঙ্গীকার, পূজো ভালোবাসা, আমার চেতনার কুঁড়ি, আমাকে এখন ডেকো না,

ভালোবাসা, আগুন থেকে হাত সরিয়ে নিতে বলো না, প্রেমের প্রচণ্ড শক্তি, আমার যে ভাই যেতেই হবে, হৃদপিন্ড যদি হৃদয় না হতো, একটি প্রদীপ গর্জে উঠলে, স্মৃতিটুকু রেখে, তুমি তুমি শুধু তুমি, একদিন ভোর হবে, ঠিকানা, প্রেমের অভিযাত্রা, একা, রাজকন্যার মতো মুখশ্রী যার, পেরেস্ত্রোইকা আর গাস্টনাস্ট, যদি কাছে না এলে, ব্যাংকক-২০০৫, ক্যামেলিয়া, ব্রতচারী, ধন্যি মেয়ে সুদীপ্তাকে, তোমার কবিতা, ছড়া, মনোলীনা, তুমি আমার, মোহনা, এর বেশি কিছু চাহি নাই, কার জন্য সন্ত্রাসী যারা সংসদ ছাড়ো, আমি নাই তুমি নাই, ওস্তাদ মোমতাজ আলী খান স্মরণে, স্নেহভাজন, আমার তুমি, লায়লা তোমার জন্য, এখানে বোমা ওখানে বোমা, স্নিগ্ধা তোমাকে, ঈশ্বরকে দেখিনি আমি, ছোটবোন বিলকিসকে, আমি দেখেছি, তোমাকে, সর্ণা তুমি আসবে কি, ওরা কেন আসে, কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি।

৬

গণতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র স্বৈরতান্ত্রিক গণতন্ত্র, ঢাকা: পালক পাবলিশার্স, প্রকাশকাল ২০ অক্টোবর ২০০৬, প্রচ্ছদ মোক্তাদুল হক, মূল্য দুইশত টাকা, পৃষ্ঠা ১৯২। উৎসর্গ: 'এ জেড এম আবদুল আলী/ মহিউদ্দিন আহমদ'।

সূচিপত্র: বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক, তদন্তের নামে কালক্ষেপণ নয়, দেশ কোন পথে, যে কোনো সমস্যা গণতান্ত্রিক উপায়ে সমাধান করা যায়, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা প্রসঙ্গে, গণতন্ত্রের ট্র্যাজেডি, বিচারে বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে, এ কী বললেন জাতীয় অধ্যাপক! মুক্তিযোদ্ধারা দুস্কৃতিকারী!, অবশেষে অরিন্দম কহিল বিষাদে, জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন, উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়ে জঙ্গিবাদকে উৎসাহিত করা হচ্ছে, বিরোধী দলের সম্মতিক্রমে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন গঠন করা হোক, আমার কথা: আমাদের ভাষার কথা, একুশ: তুমি কী কেবলই ছবি, শুধু পটে লিখা, বাতাসে এখনো লাশের গন্ধ, সংকটের বিপন্নতায় গোটা দেশ, প্রকাশ্য আদালতে অভিযুক্তদের বিচার করা হোক, ছাত্র রাজনীতি: শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, কর্নেল অলির সাহসী উচ্চারণ, অনৈতিক প্রচার কৌশল, আমেরিকার ভারত বিজয়, চলুন এখনই শুরু করি ঘরে-বাইরে গণতন্ত্র চর্চা, সংকটে শঙ্কায় বাংলাদেশ, টাটার বিনিয়োগ: জাতীয় স্বার্থ সর্বাগ্রে, বাংলাদেশ–ভারত বাণিজ্যিক সম্পর্ক, নাসরীন হকের মৃত্যু দুর্ঘটনা না হত্যা? গণতন্ত্র এখন প্রশ্নের সম্মুখীন, গার্মেন্টস সেক্টরে স্থায়ী শান্তির উদ্যোগ নিন, বিএনপির অভ্যন্তরে ভাঙনের সুর, সাংবাদিকরা কতটা স্বাধীন ও নিরাপদ, রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, সাংবিধানিক সংকট ও সিইসি, পুলিশ কি জনগণের প্রতিপক্ষ, এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল এবং.., নির্বাচন ঘিরে নানা মেরুকরণ, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে বিপর্যস্ত জনজীবন, বিনিয়োগ নিয়ে রাজনীতি, লেবানন থেকে হাত গুটাও, ইতিহাসের খলনায়ক মহানায়ক হতে চায়, বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রেক্ষাপট, জোট ও ভোটের রাজনীতি।

৭

গরাদভাঙার সংগ্রামীরা জাগো, ঢাকা: পালক পাবলিশার্স, প্রকাশকাল ৭ নভেম্বর ২০০৭, প্রচ্ছদ মোমিন উদ্দীন খালেদ, মূল্য একশত পঞ্চাশ টাকা, পৃষ্ঠা ১১২। উৎসর্গ: 'কবরী

সারোয়ার/ কী মধুর আলোকিত/ লাবণ্যময় কবরীর মুখ/ গভীর আবেগে ভরা/ মায়াময় চোখ, হাসি তার হাসি নয়/ যেন সুন্দরের আনন্দ বিস্তার/ এ পৃথিবী পায় তাকে শুধু একবার/ পায় না বারংবার।

আসাদুজ্জামান নূর/ আলোর নামে নাম/ আমার অতি প্রিয় নূর/ যার ধমনীতে বাজে/ সত্য শুভ কল্যাণের সুর/ ভুবনজোড়া তার শুদ্ধতার হাসি/ প্রসারিত করে সুন্দরের পথ/ নিরন্তর মানুষকে ভালোবাসি।'

সূচিপত্র: গরাগভাঙার সংগ্রামীরা জাগো, আমি যদি চলে যাই বন্ধ করো না লড়াই, ধরণীর ধূলায় বেঁচে থাকতে চাই, অঙ্গীকার, বিশাল গর্তটি অতিক্রম করতেই হবে, শান্তি র গান সৃষ্টির গান, সকল ভোরে ফুল ফোটে না, লড়াই, এখন-ই সময়, স্বদেশ, সাহসিকা জননী, আমাদের দক্ষিণপাড়া, স্বদেশ আমার কাঁদছে, স্বাধীনতা তুমি কার স্বাধীনতা, প্রশ্ন, হারিয়েছি মুক্তির স্বপ্ন, যুদ্ধের কবিতা, আতঙ্ক, ক্রোধ থেকে দাবানল, হীনতাই আমার যোগ্যতা, প্রথম সূর্যোদয়, মুক্ত মানুষের গান, একুশ মানে, আমরা ঘুমাবো না, রাজনীতির খেলা, আমি তিথির কাছে যাবো, যখনি দেখেছি তাঁকে, কৃষ্ণকলি, বাঁশির কান্না, বন্ধু ক্ষমা করে দিও আমার বন্ধুকে, নিজের কাছে ফিরে যেতে চাই, দীপ্তিময় উজ্জ্বল একটি মুখ, আলোকিত কারো মঙ্গললোকে, কথাশিল্পী সেলিনা হোসেনের জন্মদিনে, রাত্রি এখন রাত্রিময়, আবার এসেছি, কল্পনা চাকমাকে, পরিচয়, মণি আমাদের শোণিতে আবার আগুন ধরিয়ে দাও, তুমি কি আসবে, আমার স্বপ্ন, জন্মদিনে, এইতো নদীর খেলা, ফিরে এসো, বর্ষার গান, ভোরের প্রতীক্ষায়, প্রার্থনা, স্বাধীনতা, স্বাধীনতা: ১৯৮৪, তোমাদের পাশে দাঁড়াব, মৃত্যু, গুচ্ছ কবিতা, কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি।

৮

এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে, ঢাকা: পালক পাবলিশার্স, প্রকাশকাল পঞ্চম আন্তর্জাতিক বইমেলা ২০০৮, প্রচ্ছদ কাইয়ূম চৌধুরীর আঁকা পোট্রেট অবলম্বনে মোকতাদুল হক, মূল্য একশত ত্রিশ টাকা, পৃষ্ঠা ৭৫। উৎসর্গ: 'কবির ইচ্ছা অনুযায়ী বইটি/ তাঁর স্নেহাস্পদ রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী/ মালেকা আজীম/ এবং/ জাহানারা ইসলামকে/ উৎসর্গ করা হলো।'

সূচিপত্র: এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে, আকাশের সব তারা, আমি কবি হয়ে উঠি, প্রদীপ্ত সূর্যের আলো, তোমার আবেগের নদী, তোমার আসার আশায়, হয়তো এসেছে কেউ, সব দেবো, এই প্রত্যাশা, এ-তো চিঠি নয়, রক্তকমল, বহু অনুক্রম শেষে, ভীরু হরিণী, সাদা বেলি ফুল, বেদনার বিপন্নতায়, তুমি হয়ে যাই, তুমি কি বোঝ না, তোমার চুলের অবাধ্যতা, পৃথিবীর বুক থেকে, একবার ফিরে এসো, তবু ভালোবাসবো, তবু চলে এসো, তোমার আকাশে, তোমাকে দেখার আগেই, অটোগ্রাফ, অন্য কিছু– আরো কিছু, লাভ লোকসান, একজন শ্রোতা চাই, হৃদয়ের অভ্যন্তরে, এতদিন কোথায় ছিলে তুমি, তুমি নাই, জীবন যখন শুকিয়ে থাকে, সুখী হও, সুখী করো, শুধু আমি থাকবো না, আমি তো ভালোই ছিলাম, মেঘ কাঁদে, আমার জন্য, তোমার কথা মনে পড়ে, গুচ্ছ কবিতা, কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি।

৯

ক্লান্ত বাঁশির সুর, ঢাকা: পালক পাবলিশার্স, প্রকাশকাল পঞ্চম আন্তর্জাতিক ঢাকা বইমেলা ২০০৮, প্রচ্ছদ ইবতিসাম আহমেদ, মূল্য একশত ত্রিশ টাকা, পৃষ্ঠা ৮৭

সূচিপত্র: তুমি কি বোঝ: ক্লান্ত বাঁশির সুর, বর্ষপঞ্জী, বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা আজ জেগেছে সেই জনতা, সাবধানে পার হয়ো, একটি মণিকুন্তলা, ওয়াহিদুল হকের মৃত্যুতে, আনো আলো আরো আলো, স্বর্গ কোথায় স্বর্গ কোথায়, ধরা যাক দু-চারটি ইঁদুর এবার, আঘাত করলে, সুখের সরোবরে, অনেক খুঁজেছি তাকে, ব্যাংকক তোমাকে বিদায়, কিষাণ-শ্রমিক, বন্যায় ভাসলো দেশ, নীলা, প্রস্তরে নির্মিত অন্তর, ক্ষমা নেই ক্ষমা নেই, কী কথা তার সাথে, তারা পাবে না নিস্তার, মৃত্যুর আগে, বিশটি বছর হারিয়ে গেছে, শহীদ মিনার, গর্বিত হলাম, ভুলো না সেই কালোরাত্রি, কেন এমন হয়, আগুনের ফুল, উনি আসলেন, দেখলেন মনে মনে জয় করলেন, সেখানে কেন যাবো, আমার মৃত্যু হলে, স্মৃতিপাঠ, তোমার প্রতিটি সৃষ্টিতে, আবার জেগে উঠেছি, দ্বার খুলে দাও, রক্তের ভেতর মৌমাছির গুঞ্জরণ, শক্ত মাটিতে পা থাকলে, এখন কী করে ঘরে বসে থাকি, স্মরণ করো, স্বপ্নকে সাজাতে হবে, আলোকিত মানুষের সঙ্গে, কে তুমি, আমার প্রিয় শহীদ মিনার, আমাকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়ো না, কালের অমর সাক্ষী, যাবার আগে নিস্নে কেড়ে, দুরন্ত সৈনিক, জীবন হতো নদী, নেই কোনো ভাবনা, ক্লান্ত পথিক আমি, আমাকে রুখবে কে, হৃদয়ে হৃদয়ে, তাদের স্মরণ করি, যুদ্ধবাজ, গুচ্ছ কবিতা, কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি।

১০

স্মৃতির সন্ধানে, ঢাকা: পালক পাবলিশার্স, প্রকাশকাল এপ্রিল ২০০৮, প্রচ্ছদ কাইয়ূম চৌধুরী, মূল্য সাতশত পঞ্চাশ টাকা, পৃষ্ঠা ৫৭৬। উৎসর্গ: 'অসাম্প্রদায়িক আন্দোলনের অগ্রপথিক সুফিয়া কামালকে/ এবং/ আমাকে অশেষ প্রেরণা যোগাবার জন্য/ আমার স্ত্রী জওশন আর রহমান/ একমাত্র কন্যা সাফিনা আহমেদ/ অপুত্রক পিতার একমাত্র পুত্র ইশতিয়াক আহমেদ/ প্রাণপ্রিয় দুই দৌহিত্র ইখতিসাদ ও ইবতিসামকে।'

সূচিপত্র: প্রারম্ভ, ছেলেবেলার কথা, আমার হাতেখড়ি, ছোটবেলার কিছু ঘটনা, জিন, পরি এবং ভূতের আরো কিছু ঘটনা, আমার ছোটবেলার খেলার সাথী, গহিরা হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং আমার নানা ও মামাদের কথা, নানীর কাছে শোনা ধর্মীয় গল্প, ছেলেবেলার বন্ধু জালালের সঙ্গে বাল্যপ্রেম এবং আমার কাব্যশক্তির উন্মেষ, সুপ্পনির মা, কালামিয়া বদ্দা ও জোহরা, আমার জেঠাইমার উদারতা, উপমহাদেশের প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব: মরহুম আবদুল বারী চৌধুরী ও আমার পিতা, চট্টগ্রাম শহরে আমার প্রথম দু'বছরের স্মৃতি: আমার শিক্ষক খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ এম আবদুস সামাদ, নজরুলকে নিয়ে আমার কিছু স্মৃতি, কবি আশুতোষ চৌধুরী ও আমর বন্ধু সুচরিত, সাহিত্য বিশারদ, আমাদের জীবনের ধ্রুবতারা, চট্টগ্রামে আমার রাজনৈতিক গুরু হুমায়ুন কবির, আমি আমাদের ঐতিহ্যের কথা বলছি, বাঙালির গৌরব শরচ্চন্দ্র দাশ, কীর্তিমান হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, হিন্দু নয় মুসলমান নয়: মনুষ্যত্বই মানুষের প্রথম পরিচয়, হিন্দু-মুসলমানের রাখিবন্ধন, আমার সমাজবাদে

দীক্ষা, জওহরলাল নেহরুর চট্টগ্রাম আগমন, আবার শহরে ফিরে এলাম, খাতুনগঞ্জের উপাখ্যান, রেয়াজুদ্দিন বাজারের জন্মকথা, শাহজাদী বাইজী, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং বাংলার বুকে দারুন হাহাকার, যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের খণ্ডচিত্র, এক নৃত্যশিল্পীর প্রেম এবং কিছু ঘটনা, চট্টগ্রামে প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলন ও কাহারপাড়ার ঘটনা, পাকিস্তান আন্দোলনে আজাদ পত্রিকার ভূমিকা, নিখিল ভারত কৃষক সম্মেলন, তেভাগার লড়াই: ফজলুল হকের ঋণ সালিশি বোর্ড, নাচোল বিদ্রোহ ও ইলামিত্র, আমার প্রথম প্রেম, অতীতের দিকে, চলচ্চিত্রের ছায়ায় আমরা দু'জন, শেষ বিদায়ের মতো একটি মর্মস্পর্শী বিদায়, চট্টগ্রামকে ছেড়ে থাকতে পারলাম না: শেকড়ের টানে দেশে ফিরে এলাম, বাস্তুত্যাগের হিড়িকের মধ্যে শিখারাও দেশ ছাড়লো, স্মৃতিময় কলকাতা, কলকাতায় মামার মৃত্যু, কমরেড অম্বিকা চক্রবর্তীর ডাকে কলকাতার দাঙ্গা উপদ্রুত এলাকা পরিদর্শন, কলকাতার কতিপয় বন্ধু-বান্ধবের স্মৃতি, নেতাদের আপসকামিতার জন্য আন্দোলন বিপ্লবের রূপ নিল না: পরিণতিতে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হলো, দু'বার বিদীর্ণ হলো বাঙলা, ১৯৪৭ সালে কোন পরিস্থিতিতে, কী উদ্দেশ্য নিয়ে সীমান্ত বের করি, বিশ্বশান্তির ডাকে স্বাক্ষর দিন, 'সীমান্ত' এবং ডা. প্রফুল চন্দ্র ঘোষ, 'সীমান্ত' প্রকাশের প্রথম দিন, প্রিয়সখা কবি শামসুর রাহমানকে নিয়ে কিছু স্মৃতি, আমার কলেজ জীবনের দিনগুলো, কমিউনিস্ট পার্টির আত্মঘাতী নীতি: ভারত ও পাকিস্তানে মুক্ত এলাকা গড়ে তোলার ব্যর্থ প্রয়াস, গৃহভৃত্য থেকে পার্টি-নেতা দেবেন সিকদারের গোপন জীবনের বিস্ময়কর কাহিনী, মিসরের মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৫৬ সালে সুয়েজ খাল জাতীয়করণ: চট্টগ্রামে বিশাল মিছিল, ব্রিটিশ বেনিয়াদের মিসর প্রবেশ, স্বাধীনতা আন্দোলনের শুরু, মুক্তি আন্দোলনের নতুন অধ্যায়, জঘন্য সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ– দুনিয়াজোড়া তুমুল বিক্ষোভ, আমেরিকা, ইঙ্গ-ফরাসি হানাদারদের সাহায্যকারী, মিসরের লড়াই– আমাদের লড়াই, উত্তাল পঞ্চাশ: বীর চট্টগ্রাম, চট্টগ্রামের সংস্কৃতি সম্মেলন: নাম বিভ্রাট, অমর একুশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, আমার স্মৃতিতে ভাষা আন্দোলন, খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াসের জবানিতে পরের ঘটনা, কুমিল্লায় পূর্ব পকিস্তানের দ্বিতীয় মানবতাবাদী সংস্কৃতি সম্মেলন, নানা ছবি নানা গান, রমেশ শীলের কথা, আমার পাসপোর্ট আটকের কাহিনী ও ফকা চৌধুরীর 'শ্যুকয্যা কডে', পোপাদিয়ার নিবারণ ঠাকুর হত্যা, অন্যান্য প্রসঙ্গ, চট্টগ্রামের সংস্কৃতি বৈঠক ও প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ, আমাদের রাজনীতির উর্বরক্ষেত্র, সীতাকুণ্ডের জনসভা, মুক্তিযুদ্ধের রাজনীতির উর্বরক্ষেত্র, মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট, মির্জাপুরের ভারতেশ্বরী হোমস, আমার কিছু প্রাসঙ্গিক বক্তব্য।

১১

অদর্শনা, ঢাকা: পালক পাবলিশার্স, প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি ২০০৮, প্রচ্ছদ মোমিন উদ্দীন খালেদ, মূল্য একশত ষাট টাকা, পৃষ্ঠা ১২৪। উৎসর্গ: তিথি দেববর্মণ আগরতলা, ত্রিপুরা, ভারত/ তোমার যোগ্য গান বিরচিব বলে/ অনেক দিনের তোমার যে গান/ বারে বারে তোমার কাছে ফিরে আসে/ তার অমৃত চরণ দিয়ে/ পারিজাতের মালা গেঁথেছি/ তবু মনে হয়/ হয় নাই হয় নাই/ তরণী বাওয়া/ মনের মতো মালা নিয়ে/ তোমার কাছে যাওয়া।

নিশাত জাহান রানা/ তুমি হৃদয়ে আছো বলে/এখনো পূর্বদিকে সূর্য ওঠে/শ্রাবণে কদম ফোটে/ তুমি হৃদয়ে আছো বলে/একই বেদনার সাথী হয়ে/ তোমার হাত ধরে/ প্রভাতফেরীতে শহীদ মিনারে যাই/ গানে কবিতায় জীবনের সর্বক্ষেত্রে/ তোমাকে খুঁজে পাই।

অপুত্রক পিতার একমাত্র পুত্র/ ইসতিয়াক আহমদ/ একমাত্র কন্যা/ সাফিনা আহমেদ/ তোমাদের শ্রমে প্রেমে চেষ্টায়/ তোমাদের শুভ্র পবিত্র চিত্তের/ অন্তরতম তৃষিত প্রার্থনায়/ মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসে/ দেখেছি তোমাদের/ সমুজ্জ্বল মুখ/ তাতেই পেয়েছি তৃপ্তি/ বেদনার মাঝে সুখ।'

সূচিপত্র: অদর্শনা, সুদর্শনা, একটি প্রেমের কবিতা, বিশ্বাসের গান, বাংলার মুখশ্রী, কখন হারাই, কখন হারাই, সেই সব মুখ, আমার নামটি লিখো, জীবনের ধ্রুবতারা, অশেষ রবীন্দ্রনাথ, তিথির জন্য কবিতা, ভালোবাসার গান বেদনার গান, নরকের শিখা, লীনুর কণ্ঠসুধা অমৃত গান, ইচ্ছা, অহল্যা, কুসুম, মমতাময়ী অপালা, আসার সময় কখন হবে, দীপান্বিতা, অধরা, তুমি আর আমি ছাড়া..., ইচ্ছা হয়, তুমি কী কাঁদো, একা একা ঘরে বসে থাকা, জানিনা তার নাম, পথ-পরিক্রমা, কোমল গান্ধার, সকল কথা গান হয়ে যায়, নবীনের চোখে প্রবীণের চোখ রেখে, খাঁচার ভেতর অচিন পাখি, তোমার হাতের স্পর্শে, শেষ যুদ্ধে সৈনিক হতে চাই, প্রেম ভালোবাসি বলে, নর-নারী, তোমাকে পাওয়ার জন্য, যখন তুমি হারিয়ে গেলে, তাও দেবো, প্রিয়তম, আমি আসছি, আর কী কখনো তুমি আগের মতো হাসবেনা, কেঁদো না, বসে আছি তোমার প্রতীক্ষায়, আমি চাঁদের কাছে হাসতে শিখেছি, আমরা এখন, সুখ, পথের মাঝে একা, কথা দিয়েছিলে, রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী তিথি দেববর্মণ-কে, তোমাকে আমার চাই, ভাবের কলস, সোনালী ফসলের আশায়, দীর্ঘ পথ হাঁটা, তাড়াতাড়ি এসো, তুমি এখন, চোখের আলো, শিখার জন্য, যে মেয়ে আকাশের রঙ চেনে, তোমার চুল, তোমাকে দেখবো বলে, আমার ঠিকানা, পরাজিত, জ্যোতির্ময়ী, কাঁদালে তুমি মোরে, এ মণিহার আমার নাহি সাজে, তোমার কণ্ঠে আমার কিশোরী মা, বাঁচিতে হয়না আর সাধ, মৃত্যু, যদি ডাকো, আবার আসবো ফিরে, এখনো এই দেশে, গুচ্ছ কবিতা, কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি।

১২

সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্তি, ঢাকা: পালক পাবলিশার্স, প্রকাশকাল আগস্ট ২০০৮, প্রচ্ছদ মোকতাদুল হক, মূল্য দুইশত টাকা, পৃষ্ঠা ১৪৪। উৎসর্গ: 'কবির ইচ্ছা অনুযায়ী বইটি/ তাঁর স্নেহাস্পদ কথাশিল্পী/ হাসনাত আবদুল হাইকে/ উৎসর্গ করা হলো।'

সূচিপত্র: আজি হতে শতবর্ষ আগে, বাংলার নবজাগরণের পথিকৃৎ: ভারতপথিক রাজা রামমোহন রায়, ইউনূসের নোবেল প্রাপ্তি: বাংলাদেশে প্রথম সূর্যোদয়, সাংস্কৃতিক আন্দোলনে চট্টগ্রাম, বাঙালির সংস্কৃতি ভাবনা, তাই পবিত্র যা একান্ত ব্যক্তিগত, সমস্ত অর্জন আজ মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন: সমাজতন্ত্রের পতন নয়,

হুইটম্যানের দেশে মানবতার জয়গান, প্রিয় বন্ধু শামসুর রাহমান, অসাম্প্রদায়িক সাংবাদিকতার অগ্রপথিক আহমদুল কবির, জয় হোক সত্যের: জয় হোক দৈনিক সংবাদের, ওয়াহিদুল হক: বাংলা সংস্কৃতির ক্লান্তিহীন পরিব্রাজক, সিরাজুল ইসলাম সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক কথা, আবদুল গাফফার চৌধুরীর জন্মদিনে শুভেচ্ছা, সাহসী নাট্যকার আতিকুল হক চৌধুরীর মতো আমরা সবাই এখন অবরুদ্ধ, ফুলের নামে নাম– শিমূল, সোহরাব হাসানের কাছে লেখা চিঠি, স্মৃতির আলোয় ঈদ

ভাষণ ও শুভেচ্ছা বাণী: জাতীয়ভাবে উদ্‌যাপিত কবির ৮০তম জন্মদিন উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণ, স্বরচিত কবিতার সিডির মোড়ক উন্মোচন উপলক্ষে কবির ভাষণ, অনন্যা সঙ্গীত একাডেমীর যুগপূর্তি উপলক্ষে কবির ভাষণ, ক্রান্তির নতুন নির্বাহী কমিটিকে শুভেচ্ছা, ওস্তাদ আজিজুল ইসলামের বাঁশি সন্ধ্যায় শুভেচ্ছা বাণী, নিবেদন'র ১৬তম বার্ষিকীতে শুভেচ্ছা, আই-ই-ফাল্গুন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংসদ কর্তৃক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা।

সাক্ষাৎকার: সাহিত্য কখনো সমাজবিচ্ছিন্ন আকাশের কবিতা হতে পারে না, বঙ্গজ; নিজের কাছে ফিরে যেতে চাই, ডেসটিনি; যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাই, একুশে পত্রিকা।

১৩

আলোর সন্ধানে দেশ, ঢাকা: পালক পাবলিশার্স, প্রকাশকাল আগস্ট ২০০৮, প্রচ্ছদ মোকতাদুল হক, মূল্য একশত নব্বই টাকা, পৃষ্ঠা ১২৮

সূচিপত্র: জরুরি ভিত্তিতে শিক্ষকদের সমস্যার সমাধান চাই, ব্যর্থতার এই দায়ভার সরকারকেই নিতে হবে, দলীয় লোক দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন গণবিরোধী, পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে কতিপয় পরামর্শ, স্বস্তি ফিরে আসুক, দেশ যাচ্ছে কোন দিকে?, গণজাগরণ ও বজ্রাহত দৈত্য, একতরফা নির্বাচনের পরিণাম হবে ভয়াবহ, বিজয় মাসের ভাবনা, ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ কখনো জাতীয় ঐক্যের সেতুবন্ধ নয়, বিজয়ের জন্য গণজাগরণকে অব্যাহত রাখতে হবে, ইয়াজউদ্দিনের পদত্যাগই একমাত্র বিকল্প, আত্মসম্মান বিসর্জন, সাদ্দামের ফাঁসি প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া, জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন, বিলম্ব হোক তবুও স্বচ্ছতা চাই, ঘোড়া আগে না গাড়ি আগে, দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং সামাজিক আন্দোলন জনপ্রত্যাশা পূরণের এখনই সময়, সাহসী জননীর কাছে বুড়ো সন্তানের আকিঞ্চন, ছাত্র রাজনীত: ফিরে আসুক পরীক্ষিত ভূমিকায়, আলোর সন্ধানে দেশ, চাঁদা, চাঁদাবাজি বনাম সংস্কার, সাইফুদ্দিন খানের মৃত্যুতে, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হোক, আজও কাঁদে শহীদের আত্মা।

সংবাদপত্রের মন্তব্য: জনগণ বিপন্নবোধ করছে, ভাঙনের সুর বাজছে, তিনি দেশের জন্যই প্রাণ দিয়েছেন, গ্রামীণ ব্যাংক একটি মতাদর্শ, দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে, আশু বাস্তবায়ন চাই, চবি নাট্যকলা বন্ধের প্রচেষ্টা অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ, দুর্গত এলাকার নিঃস্ব ও অসহায় মানুষ কিস্তি শোধ করবে কিভাবে?

সঙ্কলন ও স্মারকগ্রন্থে গ্রন্থিত রচনাপঞ্জি

১. সাংস্কৃতিক আন্দোলনে চট্টগ্রাম (প্রবন্ধ)
চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রগতিশীল ধারা, চট্টগ্রাম: স্মরণিক, জানুয়ারি ১৯৯১
সম্পাদক: মাহবুব হাসান।

২. কামাল লোহানীর জন্মদিনে অভিনন্দন (প্রবন্ধ)
কামাল লোহানী সময়ের সাহস, ঢাকা: সূচিপত্র, জুন ২০০৪
সম্পাদনা পরিষদ: আবুল বারক আলভী, সাগর লোহানী, বন্যা লোহানী, অনন্য রায়হান।

৩. ওস্তাদ মোমতাজ আলী স্মরণে (কবিতা)
ওস্তাদ মোমতাজ আলী খান স্মারকগ্রন্থ, ঢাকা: ওস্তাদ মোমতাজ আলী খান সঙ্গীত একাডেমী, আগস্ট, ২০০৫
সম্পাদক: রূপু খান।

৪. এ সঙ্কটে যদি তব দেখা পাই (স্মৃতিচারণ)
মুস্তাফিজুর রহমান খান স্মারকগ্রন্থ, ঢাকা: স্মারকগ্রন্থ প্রকাশনা কমিটি, ডিসেম্বর ২০০৫
সম্পাদনা পরিষদ: আনিসুজ্জামান, মোফাবেজা খান, মাহফুজা খানম, সালেহ মুস্তাফা কামাল, সালেহ মুস্তাফা খালেদ, মফিদুল হক, জাহানারা নওশিন।

৫. আমার সহযোদ্ধা ইমাদুল্লাহ (স্মৃতিচারণ)
কমরেড মোহাম্মদ ইমাদুল্লাহ স্মারকগ্রন্থ, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, এপ্রিল ২০০৬
সম্পাদক: এম এম আকাশ, নূরজাহান বেগম, সফিউর রহমান লিটু।

৬. মোতাহের হোসেন চৌধুরীর কিছু স্মৃতি কিছু কথা (স্মৃতিকথা)
সংস্কৃতি-সাধক মোতাহের হোসেন চৌধুরী, ঢাকা: কথা প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৭
সম্পাদক: মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম।

৭. নাসরিনের হাসি (কবিতা)
আন্দোলনের নাসরীন নাসরীনের আন্দোলন, ঢাকা: নারীপক্ষ, এপ্রিল ২০০৭
সম্পাদনা: রানী রায়, শিরীন হক, রীনা সেনগুপ্ত, ফিরদৌস আজীম, মাহবুবা মাহমুদ।

৮. যখন দেখেছি তাঁকে (কবিতা)
নূরজাহান মুরশিদ স্মারকগ্রন্থ, ঢাকা: অন্য প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৮
সম্পাদনা পরিষদ: আনিসুজ্জামান, কামাল হোসেন, সরদার ফজলুল করিম, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, সেলিনা হোসেন।

৯. হুমায়ুন কবিরকে জন্মশতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি (প্রবন্ধ)
হুমায়ুন কবির জন্মশতবর্ষ স্মরণ, ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০১০
সম্পাদক: আবুল আহসান চৌধুরী, মাসুদ রহমান

১০. আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ: বাঙালি সংস্কৃতির ধ্রুবতারা (প্রবন্ধ)
আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ: ঐতিহ্য অন্বেষার প্রাজ্ঞ পুরুষ, ঢাকা: শোভা প্রকাশ, ২০১১

সম্পাদক: আবুল আহসান চৌধুরী

১১. জননী (কবিতা)
সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ, ঢাকা: বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ডিসেম্বর ২০১১
সম্পাদনা পরিষদ: আনিসুজ্জামান, আয়েশা খানম, সুলতানা কামাল, মফিদুল হক।

মাহবুব উল আলম চৌধুরী সওগাত, সোনার বাংলা, পরিচয়, নতুন সাহিত্য, দৈনিক সত্যযুগ, অগ্রণী, ডাক, ইস্পাত, পরিচিতি, পূর্ব্বাশা, নওবেলাল, সাপ্তাহিক আওয়াজ, উদয়ন ও প্রগতি প্রভৃতি পত্রিকায় গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখতেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক হানাদার বাহিনী তাঁর অন্যান্য কাগজপত্রের সঙ্গে সব জ্বালিয়ে দেয়। তাই সেসবের বিবরণ আর পাওয়া সম্ভব নয়। তাঁর সাহিত্যসাধনার দ্বিতীয় পর্বে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যেসব লেখা লিখেছেন সেসব তাঁর শেষজীবনের গ্রন্থগুলিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পত্র-পত্রিকার মধ্যে রয়েছে যুগান্তর, সমকাল, জনকণ্ঠ, ভোরের কাগজ, সংবাদ, ইত্তেফাক, পূর্বকোণ, আজাদী প্রভৃতি।

তাঁর লিখিত ভূমিকা-সংবলিত গ্রন্থ

১. জাহিদ আনোয়ার, জীবনের ধ্রুবতারা (প্রবন্ধ), নওগাঁ: বিদ্যাসুন্দর, এপ্রিল ২০০৫

২. বুলবুল মহলানবীশ, মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব প্রস্তুতি ও স্মৃতি '৭১, ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৬

৩. মামুন সিদ্দিকী, গৌরী (গল্পগ্রন্থ), ঢাকা: প্রত্ন, ফেব্রুয়ারি ২০০৬

৪. রুপু খান, এ কোন মানব তুমি, ঢাকা: জোনাকী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০০৬

৫. সৈয়দা নাজমুন নাহার (সম্পা.), বাংলাদেশের প্রতিবাদ কবিতা, ঢাকা: আলপনা প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০০৭

৬. ফজলুল হক ঋপন, স্মৃতিসত্তাকণা, ঢাকা: পালক পাবলিশার্স, মার্চ ২০০৭

৭. সিরাজুল ইসলাম, গল্পসমগ্র, ঢাকা: সূচীপত্র, ফেব্রুয়ারি ২০০৮

৮. Dr. Jasim Uddin Ahmed, Random verses, Dhaka: Palak publishers, February 2006

রচনা নিদর্শন

কাঁদতে আসিনি–

ফাঁসীর দাবী নিয়ে এসেছি

ওরা চল্লিশজন কিংবা আরো বেশী
যারা প্রাণ দিয়েছে ওখানে– রমনার রৌদ্রদগ্ধ কৃষ্ণচূড়ার গাছের তলায়
ভাষার জন্য, মাতৃভাষার জন্য– বাংলার জন্য ।
যারা প্রাণ দিয়েছে ওখানে
একটি দেশের মহান সংস্কৃতির মর্য্যাদার জন্য
আলাওলের ঐতিহ্য
কায়কোবাদ, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের
সাহিত্য ও কবিতার জন্য–
যারা প্রাণ দিয়েছে ওখানে
পলাশ পুরের মকবুল আহমদের
পুঁথির জন্য–
রমেশ শীলের গাঁথার জন্য,
জসীম উদ্দিনের 'সোজন বাদীয়ার ঘাটের' জন্য ।
যারা প্রাণ দিয়েছে
ভাটীয়ালি, বাউল, কীর্ত্তন, গজল
নজরুলের "খাঁটী সোনার চেয়ে খাঁটি
আমার দেশের মাটি ।
এ দুটি লাইনের জন্য
দেশের মাটির জন্য,
রমনার মাঠের সেই মাটিতে
কৃষ্ণচূড়ার অসংখ্য ঝরা পাপড়ির মতো
চল্লিশটী তাজা প্রাণ আর
অঙ্কুরিত বীজের খোসার মধ্যে
আমি দেখতে পাচ্ছি তাদের অসংখ্য বুকের রক্ত ।
রামেশ্বর, আবদুস সালামের কচি বুকের রক্ত
বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে সেরা কোন ছেলের বুকের রক্ত
আমি দেখতে পাচ্ছি তাদের প্রতিটী রক্ত কণা
রমনার সবুজ ঘাসের উপর

আগুনের মতো জ্বলছে, জ্বলছে আর জ্বলছে।
এক একটি হীরের টুকরোর মতো
বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছেলে চল্লিশটী রত্ন
বেঁচে থাকলে যারা হতো
পাকিস্তানের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ
যাদের মধ্যে লিংকন, রক্‌ফেলার,
আরাগঁ, আইন-ষ্টাইন আশ্রয় পেয়েছিল
যাদের মধ্যে আশ্রয় পেয়েছিল
শতাব্দীর সভ্যতার
সবচেয়ে প্রগতিশীল কয়েকটী মতবাদ,
সেই চল্লিশটী রত্ন যেখানে প্রাণ দিয়েছে
আমরা সেখানে কাঁদতে আসিনি।
যারা গুলি ভরতি রাইফেল নিয়ে এসেছিল ওখানে
যারা এসেছিল নির্দ্দয় ভাবে হত্যা করার আদেশ নিয়ে
আমরা তাদের কাছে
ভাষার জন্য আবেদন জানাতেও আসিনি আজ।
আমরা এসেছি খুনী জালিমের ফাঁসীর দাবী নিয়ে।

আমরা জানি ওদের হত্যা করা হয়েছে
নির্দ্দয় ভাবে ওদের গুলি করা হয়েছে
ওদের কারো নাম তোমারি মতো ওসমান
কারো বাবা তোমারি বাবার মতো
হয়তো কেরাণী, কিম্বা পূর্ব্ব বাংলার
নিভৃত কোন গাঁয়ে কারো বাবা
মাটির বুক থেকে সোনা ফলায়
হয়তো কারো বাবা কোন
সরকারী চাকুরে।
তোমারি আমারি মতো
যারা হয়তো আজকেও বেঁচে থাকতে
পারতো,
আমারি মতো তাদের কোন একজনের
হয়তো বিয়ের দিনটী পর্য্যন্ত ধার্য্য হয়ে গিয়েছিল,
তোমারি মতো তাদের কোন একজন হয়তো
মায়ের সদ্যপ্রাপ্ত চিঠি খানা এসে পড়বার আশায়
টেবিলে রেখে মিছিলে যোগ দিতে গিয়েছিল।
এমন এক একটি মুর্ত্তিমান স্বপ্নকে বুকে চেপে
জালিমের গুলিতে যারা প্রাণ দিল

সেই সব মৃতদের নামে
আমি ফাঁসী দাবী করছি।

যারা আমার মাতৃভাষাকে নির্ব্বাসন দিতে চেয়েছে তাদের জন্যে
আমি ফাঁসী দাবী করছি
যাদের আদেশে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে তাদের জন্যে
ফাঁসী দাবী করছি
যারা এই মৃতদেহের উপর দিয়ে
ক্ষমতার আসনে আরোহণ করেছে
সেই বিশ্বাসঘাতকদের জন্যে।
আমি তাদের বিচার দেখতে চাই।
খোলা ময়দানে সেই নির্দ্দিষ্ট জায়গাতে
শাস্তি প্রাপ্তদের গুলিবিদ্ধ অবস্থায়
আমার দেশের মানুষ দেখতে চায়।

পকিস্তানের প্রথম শহীদ
এই চল্লিশটী রত্ন,
দেশের চল্লিশ জন সেরা ছেলে
মা, বাবা, নতুন বৌ, আর ছেলে মেয়ে নিয়ে
এই পৃথিবীর কোলে এক একটি
সংসার গড়ে তোলা যাদের
স্বপ্ন ছিল–
যাদের স্বপ্ন ছিল আইনষ্টাইনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে
আরো গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করার,
যাদের স্বপ্ন ছিল আনবিক শক্তিকে
কি ভাবে মানুষের কাজে লাগনো যায়
তার সাধনা করার,
যাদের স্বপ্ন ছিল– রবীন্দ্রনাথের
'বাঁশীওয়ালার' চেয়েও সুন্দর
একটি কবিতা রচনা করার,
সেই সব শহীদ ভাইয়েরা আমার যেখানে তোমরা প্রাণ দিয়েছ
যেখানে হাজার বছর পরেও
সেই মাটি থেকে তোমাদের রক্তাক্ত চিহ্ন
মুছে দিতে পারবে না সভ্যতার কোন পদক্ষেপ।

যদিও অগণন অস্পষ্ট স্বর নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করবে
তবুও বিশ্ব বিদ্যালয়ের সেই ঘণ্টা ধ্বনি

প্রতিদিন তোমাদের ঐতিহাসিক মৃত্যুক্ষণ
ঘোষণা করবে।
যদিও ঝঞ্জা-বৃষ্টিপাতে-বিশ্ব বিদ্যালয়ের
ভিত্তি পর্য্যন্ত নাড়িয়ে দিতে পারে
তবু তোমাদের শহীদ নামের ঔজ্জ্বল্য
কিছুতেই মুছে যাবে না।

খুনী জালিমের নিপীড়নকারী কঠিন হাত
কোন দিনও চেপে দিতে পারবে না
তোমাদের সেই লক্ষ্যদিনের আশাকে,
যেদিন আমরা লড়াই করে জিতে নেব
ন্যায় নীতির দিন
হে আমার মৃত ভাইরা
সেই দিন নিস্তব্ধতার মধ্য থেকে
তোমাদের কণ্ঠস্বর
স্বাধীনতার বলিষ্ঠ চীৎকারে
ভেসে আসবে
সেই দিন আমার দেশের জনতা
খুনী জালিমকে ফাঁসির কাষ্ঠে
ঝুলাবেই ঝুলাবে।
তোমাদের আশা অগ্নিশিখার মতো জ্বলবে
প্রতিশোধ এবং বিজয়ের আনন্দে।

তোমার চুল

একদিন তোমার ক্লান্ত দেহের ভার
রেখেছিলে শরীরে আমার
সেদিন তোমার অবিন্যস্ত কিছু এলোমেলো চুল
আমার হৃদয়ের কাছে চেয়েছিল
একগুচ্ছ আরক্তিম ফুল।

তুমি তা জানো না। কেউ তা জানে না।
নারীর অবাধ্য চুল কোনদিন শাসন মানে না।
চুল তার চিরকাল অবাধ্য স্বাধীন
হাওয়ায় প্রশ্রয় পেল উড়ে যায় মেঘের মতোন
বিচার করে না কিছু মাঘ কি আশ্বিন।
(১৯৪৮)

উড়ে চলে গেছে পাখী

উড়ে চলে গেছে পাখী
রেখে গেছে হাওয়ার সমুদ্রে ঢেউ
পাতা নড়ে, ঘাস কাঁপে
শিশুর দোলনার মতো
দুলে উঠে আমাদের নরম হৃদয়ে

সময়ের মাঠে মাঠে
পঙ্গ পালের মতো ঘুরিতেছে
আমাদের ক্ষুধাতুর বোধ
ফসল ফুরায়ে গেছে
পড়ে আছে শুকনো খড়, মরা গরু
সাপের খোলস
শূন্য মাঠে চরিতেছে চোখ

কখনও কোথাও যদি দেখি
দুর্লভ সোনার মতো
পড়ে আছে বিপন্ন বিবরে
কোন এক বাঞ্ছিত রতন
তখন
নির্বাণ বুদ্ধির স্বপ্নে
ডানা মেলে অকস্মাৎ
উড়ে চলে মন
আরেক নীল নক্ষত্রের ভীড়ে
(১৯৪৯)

কুয়াশার বীজ

কুয়শায় বীজ বুনে চলে গেছে চাষা
আমাদের প্রপিতামহেরা প্রাণপণে ঢেলে গেছে জল
আমরা বেড়েছি তাতে শতাব্দীর অন্তিম ফসল।
আমাদের মস্তিষ্কের জটিল কোটরে
অন্তহীন দুঃস্বপ্নের নিরক্ষর ব্যর্থ ব্যাকুলতা
মৃত শিশিরের কাছে প্রতিদিন খুঁজিতেছে কথা।
আমরা জীবিত তবু মৃত এই শকুনের ভোজে
কী যন্ত্রণায় তুলি প্রত্যহ বিকট নাভিশ্বাস
বিদীর্ণ কালে যাত্রা ব্যর্থ করে অগ্রজের অটল বিশ্বাস।
(১৯৫৫)

বাঙালির সংস্কৃতি ভাবনা

সংস্কৃতি বলতে সাধারণত আমরা বুঝি সাহিত্য, সঙ্গীত, চারুকলা, নৃত্য এবং জীবনাচরণ। সে কারণে আমরা গানের আসরকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বলে অভিহিত করি। কিন্তু সংস্কৃতি বলতে বোঝায় মানুষের আচার-ব্যবহার, খাদ্যাভাস, বাস্তব ও মানসিক কীর্তি এবং কর্ম। তার জীবনযাত্রার আর্থিক সামাজিক রূপ, অনুষ্ঠান, উৎসব এমনকি ধর্মীয় প্রথা ও আধ্যাত্মিক চিন্তা ভাবনা– যা মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। দুর্বলের সংস্কৃতি ধর্ম। আর সজ্জনের ধর্ম সংস্কৃতি।

ইংরেজি কালচার শব্দটির প্রভাবে সুদীর্ঘকাল ধরে আমাদের ভাষা এবং সাহিত্যে সংস্কৃতি ধারণাটি প্রচার ও প্রসার লাভ করে।

উনিশ শতকে হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে দেশজ, ধর্মীয় এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমন্বয় সাধনের ফলে বাঙালি সংস্কৃতি অনেক সমৃদ্ধ এবং বিচিত্র রূপ লাভ করে। এই ধারাটি বহু চড়াই উৎরাই পার হয়ে বাঙালি সংস্কৃতির মূলধারায় পরিণত হয়। উনিশ এবং বিশ শতকে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সংঘাত এত তীব্র হয়ে ওঠে যে, মুসলমানরা এই মূল সংস্কৃতি থেকে ক্ষিপ্রগতিতে সরে আসে। এই সরে আসার কারণ লিখতে গেলে লেখাটি দীর্ঘ হয়ে যাবে। আমি শুধু এই বিভেদের কারণটুকু সংক্ষিপ্তভাবে বিশ্লেষণ করব।

ইংরেজ আগমনের পূর্বে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে এরূপ সংঘাতপূর্ণ সম্পর্ক ছিল না। এই সেদিনও বাংলার মুসলমানরা হিন্দুদের মতো ধুতি, ফতুয়া, চাদর ব্যবহার করতেন। তাদের নামের আগে হিন্দু প্রতিবেশীর মতো 'শ্রী' শব্দ ব্যবহার করতেন। উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষিত লোকেরা নামের আগে 'মুন্সি' শব্দটি ব্যবহার করতেন। হিন্দু-মুসলমান উভয়েই পাঁচ পীরের নামে, সত্য পীরের নামে, আলবদর পীরের নামে দরগাহ এবং মন্দিরের শিন্নি দিতেন। তাদের অভাব এবং সমস্যার কথা মনে মনে চিন্তা করে মন্দির এবং দরগাহর নিকটস্থ গাছের মনোবাঞ্ছা পূরণের উদ্দেশ্যে লালতাগা বেঁধে দিতেন। বিপদসংকুল নদী পথে যাত্রার আগে সংকট থেকে উদ্ধারের জন্য মানিক পীরের গান করতেন। উভয় সম্প্রদায়ের বিবাহ উৎসবে কলাগাছ দিয়ে মঞ্চ তৈরি করতেন। সেখানে মঙ্গলঘট বসিয়ে তার ওপর ডাব এবং আম্রপাতা দিয়ে সুশোভিত করতেন। গায়ে হলুদ মেখে গান গেয়ে গেয়ে সাত পুকুর থেকে পানি সংগ্রহ করে বর এবং কনেকে গোসল করাতেন। বরকে গোসল করাবার দায়িত্ব ছিল নাপিতের ওপর। বিবাহ উৎসবে মেয়েরা 'হল্যা' গান করত, নৃত্য পরিবেশন করত। উভয় সম্প্রদায়ের উৎসবে রামায়ণ, মহাভারত কথকতা, কীর্তন, পাঁচালি গান, কবির গান, যাত্রা, গম্ভীরা, বাউল, ঝুমুর গান, ভাষার গান, গাজীর গান, জারি গান এবং লাইলি মজনু, পদ্মাবতী, সোহরাব রুস্তম, আমির হামজা, কারবালা প্রভৃতি পুঁথি সুর করে পাঠ করা হতো। মুসলমানদের মতো হিন্দুরাও হাতের পাতায় মেহেদী এবং পায়ে আলতা মাখত, রিঠা দিয়ে চুল শ্যাম্পু করত।

উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা মাথায় পাগড়ি কিংবা গামছা বাঁধতেন। খোলা মাথায় কেউ বাইরে যেতেন না। সম্প্রীতির নিদর্শন স্বরুপ প্রতিবছর উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে গামছা বদল, পাগরি বদল হতো। রাখী বন্ধনও প্রচলিত ছিল।

মেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদও ছিল প্রায় একই রকমের। তারা গঙ্গাজলী মেঘডম্বুর, শাড়ি, চুড়িদার ইজার, লম্বা কোর্তা ও কাবাইসহ মাথার ওপর ওড়ান পড়ত। উভয় সম্প্রদায়ের দরিদ্র ঘরের মেয়েরা তাতের তৈরি গামছা পরে বুকে কাঁচুলি বেঁধে গায়ে গামছা দিয়ে জীবন কাটাত। উভয় সম্প্রদায়ের অলঙ্কার সামগ্রীও ছিল একই ধরনের পায়ের দশ ঘুন্টি দেওয়া দশটি আংটি না হলে মেয়েদের চলতই না।

মাথায় সিঁথিপাঠ ও ফেচুয়া, গলায় হাসুলি, সাতনরি হার, মাধুলি ও স্বর্ণ মোহরের ছাড়, নাকে নথ, নাকফুল নাকচাবি ও বোলাক; কানে কানফুল, ঝুমকা ও বলি; হাতে বাজুবন্ধ, তাড়, বাছ, পেচি, গাটিয়া, তাগা, তোড়ল ও খাড়ু; কোমরে চন্দ্রহার, সূর্যহার; পায়ে পাজব, নূপুর, মল, গোল খাড়ু প্রভৃতি অলঙ্কার পরতেন।

হিন্দুদের বিয়েতে মুসলমান মেয়েরা ঘটা করে পিঠা, পুলি, পাক্কন, বাতাসা নিয়ে পালকি চড়ে নাইওর যেতেন। তেমনি মুসলমানদের বিয়েতেও হিন্দু মেয়েরা অপরুপ সাজে সজ্জিত হয়ে পিঠা, পুলি, পাক্কন, মিষ্টি, জিলাপি, বাতাসা নিয়ে নাইওর যেতেন। সম্ভ্রান্ত পরিবারে এদের থাকা ও খাওয়ার জন্য মূল গৃহ সংলগ্ন আলাদা বাড়ি ছিল।

মোগল, রাজপুত এবং লোকজ সাংস্কৃতিক সংমিশ্রনে তৈরি হয়েছিল এই সংস্কৃতির ধারা। স্থাপত্যকর্মেও দেখা যায় মোগল এবং ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের বৈচিত্র্যময় সম্মিলন। আটচালা ঘর, গম্বুজ মিনার প্রভৃতি।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও জ্ঞানগুরু ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মধ্যে নানা বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে একবার 'বাংলার বৈশিষ্ট্যের' কথা ওঠে। আচার্য ব্রজেন্দ্রাথ জিজ্ঞাসা করেন: 'আপনার মতে বাংলার বৈশিষ্ট্য কী?' রবীন্দ্রনাথ বললেন: বৈচিত্রের মধ্যেই ঐক্যের যোগদৃষ্টি ও ঐক্যের যোগসাধনই বাংলার বিশেষ ধর্ম। আমার 'ভারতের ইতিহাসের ধারাতে' আমি একথা ভালো করেই বলেছি। এ দেশে উঁচু নীচু বহু ধর্ম ও সংস্কৃতিই পাশাপাশি রয়েছে। কেউ কাউকে নিঃশেষ করতে চায়নি। এইটি আর কোথায় কী দেখা যায়? আর সব দেশেই প্রবল ধর্ম ও সংস্কৃতি দুর্বলকে পিষে মেরে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। ভারতে কিন্তু সেটি কখনোই ঘটেনি। এই বৈচিত্র্যের মধ্যে সুরসঙ্গতির সাধনাই (Harmony) হলো আমাদের বিশেষ সাধনা।

সমাজ-গত রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ছাড়াও বাংলাদেশের উভয় সম্প্রদায়ের কৃষকরা একই উৎপাদন যন্ত্র (লাঙ্গল, ফলা, বলদ) দিয়ে চাষাবাদ করে। দুপুরে খাওয়ার জন্য নিজ নিজ বাড়ি থেকে পান্তা ভাত, পোঁড়া মরিচ পাঠানো হয়। ভালো তরকারি হলে তারা পরস্পর পরস্পরের মধ্যে ভাগ করে নেয়। হুক্কা, ডাবায় উভয়ে ধূমপান করে। পরবর্তীকালের মতো এমন বাছ বিচার ছিল না।

কামার, কুমার, তাঁতি, নাপিত, ধোপা, জেলে, ঢুলি, ঝাড়ুদার, কলু প্রভৃতি সম্প্রদায় গ্রামের প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটাত। প্রতিটি গ্রাম ছিল প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। এ কারণেই বলা

হতো গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, মাছভরা পুকুর ছিল বাঙালি উভয় সম্প্রদায়ের সম্পদ। তাদের অন্ন বস্ত্রের অভাব ছিল না। বারো মাসে তের পার্বণ, উৎসব আনন্দে বাঙালির জীবন কাটত। পহেলা বৈশাখ, হালখাতা, মাঘী পূর্নিমা, চৈত্র সংক্রান্তি, নবান্ন, ঈদ, মহররম, পূজার আনন্দ, হোলি, রাসলীলা, দেওয়ালী, ভাইফোটা, রাখীবন্ধন, রথযাত্রা প্রভৃতি উৎসবগুলোর মধ্যে কিছু কিছু উৎসবে ধর্মীয় ছাপ থাকলেও তা ছিল সৌভ্রাতৃত্বমূলক, অসাম্প্রদায়িক। এই উৎসবগুলোতে উভয় সম্প্রদায় পরস্পরের সঙ্গে কোলাকুলি করে শুভেচ্ছা বিনিময় করত। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ঋতু উৎসব প্রচলনের মধ্য দিয়ে বাঙালির এই উৎসবকে আরো বৈচিত্র্যময় করে তোলেন। উভয় সম্প্রদায় একত্রে এসব উৎসবে অংশগ্রহণ করত। এসব উৎসবকে কেন্দ্র কেরে মেলা বসতো। তাতে ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা তাদের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রি করে দু পয়সা রোজগার করত।

সেই সমাজব্যবস্থায় দারিদ্র্য যে ছিল না তা নয়। মাঝে মাঝে দুর্ভিক্ষে বহুলোক মারা যেত। তখনো আধুনিক চিকিৎসার প্রবর্তন হয়নি। কবিরাজি, হাকিমী এবং মঘা শাস্ত্রীয় ওষুধ ছিল একমাত্র চিকিৎসা। কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বরে গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যেত। গো-কোরবানি কিংবা মসজিদের সামনে বাদ্য বাজনা নিয়ে কোনো দাঙ্গা হাঙ্গামা হতো না। যতটা হতো জমি দখল নিয়ে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে।

সুলতানি আমলে এবং আরাকান রাজসভায় মুসলমানরা সাহিত্য প্রতিভার যে স্বাক্ষর রেখেছিলেন তা আঙ্গিক এবং বিষয়বস্তুর দিক থেকে অসামান্য। তখন আলাওল, দৌলত কাজী এবং মাগন ঠাকুরের আবির্ভাব না হলে বাঙলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের আবির্ভাব হতো কি না সন্দেহ। দেবভূমি থেকে বাংলা সাহিত্যকে মাটির পৃথিবীতে নামিয়ে এনেছিলেন তারা। সাহিত্যে মানবতার আমদানিও তারা করেছিলেন।

যে জন বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সে জন কাহার জন্ম নির্ণয় ন' জানি।

আবদুল হাকিমের এই চরণ দুটিতে বাংলা ভাষা বিরোধীদের প্রতি কবির যে ক্ষোভ ফুটে উঠেছে তা লক্ষণীয়। এদের তিনি বেজন্মা বলতে দ্বিধাবোধ করেননি।

কিংবা

নানা বরণ গাভীরে ভাই
একই বরণ দুধ
জগত ভ্রমিয়া দেখি
একই মায়ের পুত।

মানবতার জয়গানে ভরপুর এই কবিতাটি চন্ডীদাসের 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'-এর সমসাময়িককালে লেখা।

পুঁথি, গাঁথা, পালা, গীতি-নকশা পড়লে অনায়াসে বুঝা যায় এতে হিন্দু কি মুসলমানের পৃথক কোনো ছাপ ছিল না। পঞ্চদশ শতাব্দীতে পরাগল খাঁর আশ্রিত কবীন্দ্র পরমেশ্বর এবং ছুটি খাঁর প্রিয় কবি শ্রীকরণ নন্দীও এই ভাষাকে হিন্দু মুসলমানের নিজ ভাষা নাম দিয়েছিলেন। ড. দীনেশ চন্দ্র সেনের ভাষায় "সেকালে গোড়া মোল্লা ও টুলো

পণ্ডিত একদিকে আরবি ফারসি ও অপরদিকে সংস্কৃত শব্দের মাল-মসলা ঢুকাইয়া বাঙ্গালা ভাষার কেলা দখল করিতে প্রয়াস পান নাই। পূর্ববঙ্গ গীতিকার (দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা) 'মানিকতারা' নামক পালায় জামাইৎ উল্লা যে অপূর্ব কবিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তাহার সমকক্ষতা দাবি করিতে পারে, এই রুপ হিন্দু কবির সংখ্যা অতি অল্প। এই পুস্ত কে লেখকদ্বয় (আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ও ড. মুহম্মদ এনামুল হক) কবি দৌলত কাজীর (১৬২২-১৬৩৮ খ্রিঃ আবির্ভাবকাল) 'সতী ময়না' নামক কাব্যের যে অপূর্ব কবিত্ব-সম্পদের কথা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া বাঙালি মাত্রেই বুঝিবেন যে, বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধির কৃতিত্ব ও গৌরব যতটা হিন্দুর ততটা মুসলমানের। ইহাদের এক সম্প্রদায় যদি তাহাদের স্বীয় সৃষ্ট কীর্তি হইতে কোনো অজুহাতে সরিয়া দাঁড়ান, তবে তাঁহারা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত তাহাদের পূর্ব পুরুষের অমূল্য সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইবেন মাত্র।

হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হয় ইংরেজ আগমনের পরে। প্রথমদিকে ইংরেজরা সদ্য রাজ্যহারা মুসলমানদের বিশ্বাস করত না। সমস্ত উচ্চপদ দেওয়ানি, খাজাঞ্চি, দালাল, ফড়িয়া জাতীয় পেশায় নিযুক্ত হয় হিন্দুরা। এই পেশায় নিয়োজিত থেকে তারা প্রচুর পরিমাণ অর্থের অধিকারী হয়। এই অর্থ দিয়ে তারা প্রথমে জমিদারি কেনে এবং মহাজন হয়ে গ্রামে সুদে উচ্চহারে টাকা লগ্নি করে। এতে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে উভয় সম্প্রদায়ের গরিব চাষী প্রজারা শোষিত হতে থাকে। যেহেতু দরিদ্র কৃষক, প্রজা এবং ক্ষেত মজুরদের অধিকাংশই ছিল মুসলমান সেহেতু হিন্দুদের প্রতি মুসলমান সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ গড়ে ওঠে।"

ইংরেজরা এ দেশে যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলন করে, মোল্লা মৌলভীদের প্ররোচনায় এবং মুসলিম আশরাফ শ্রেণীর নির্দেশক্রমে মুসলমানরা সেই শিক্ষা গ্রহণ করেনি। ফলে শিক্ষা-দীক্ষা, পেশায় ব্যবসায় বাণিজ্যে তারা প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের চেয়ে অনেক পিছিয়ে পড়ে। এই পাশ্চাত্য শিক্ষাকে অনেকে কেরানি তৈরির শিক্ষা বললেও এই শিক্ষাব্যবস্থা ছিল আধুনিক ইউরোপের রেনেসাসেঁর ফসল। আমাদের অতীত শিক্ষাব্যবস্থার চেয়ে অনেক উন্নত। যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক এবং উদার মানবিক চিন্তায় সমৃদ্ধ। এই শিক্ষা প্রচলনের প্রায় অর্ধশতাব্দী পর নবাব আবদুল লতিফ, স্যার সৈয়দ আমীর আলী, স্যার সৈয়দ আহমদ, এ কে গজনবী এবং এ কে ফজলুল হকের প্রেরণায় এবং চেষ্টায় মুসলমানরা ধীরে ধীরে এই শিক্ষা গ্রহণ করার দিকে অগ্রসর হয়। বিকাশ হয় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। শিক্ষা শেষে তারা দেখে সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, আধা সরকারি এবং অন্য কোনো জায়গায় তাদের চাকরি বরাদ্দ নেই। অগ্রগামী হিন্দু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তারা পেরে উঠছে না। ফলে হিন্দু শিক্ষিত শ্রেণীর প্রতি তারা বিরুপ হয়ে ওঠে। আর এই বিরুপ প্রতিক্রিয়ায় ইন্ধন যোগায় ইংরেজরা। কারণ তখন হিন্দুরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে।

সাহিত্য ক্ষেত্রে যে বিতর্কের সূচনা হয়, তাতে বাংলা সাহিত্য দুই সম্প্রদায়ের শিক্ষিত শ্রেণীর উস্কানিতে ফরাসি শব্দসমৃদ্ধ ইসলামি এবং সংস্কৃত শব্দসমৃদ্ধ হিন্দু সাহিত্য অভিধায় পরিণত হয়। এই বিতর্ক চলে দীর্ঘদিন। এরই এক পর্যায়ে পাকিস্তানের তমসায় আচ্ছন্ন মুসলমানরা বাংলা সংস্কৃতিকে হিন্দু সংস্কৃতি এবং রবীন্দ্রনাথকে হিন্দু কবি বলে

আখ্যায়িত করে। পঞ্চ প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করাকে তারা কুফরি আখ্যা দেয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ধর্মীয় উন্মাদনায় আমাদের সংস্কৃতির যা কিছু ভালো যা কিছু মঙ্গলময় এবং যা কিছু প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলনমূলক তা জোর করে বন্ধ করে দেয়ার প্রচেষ্টা চলে। কিন্তু তাদের সমস্ত বাধা নির্যাতন উপেক্ষা করে আমরা বহু বছর ধরে এসব উৎসব পালনের চেষ্টা করে আসছি।

পাকিস্তান আমলে পহেলা বৈশাখের মতো একটি ধর্মনিরপেক্ষ উৎসবকেও তারা হিন্দুদের উৎসব বলে চিহ্নিত করেছিল। পহেলা বৈশাখ বাঙালির একটি সার্বজনীন লোকজন উৎসব। এদিন আনন্দঘন পরিবেশে বরণ করে নেয়া হয় নতুন বছরকে। কল্যাণ ও নতুন জীবনের প্রতীক হলো নববর্ষ। এক সময় নববর্ষ পালিত হতো ঋতুধর্মী উৎসব হিসেবে। তখন এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল কৃষির। কারণ কৃষিকাজ ছিল বিশেষ ঋতুনির্ভর। এই কৃষিকাজের সুবিধার্থে মোগল সম্রাট আকবর ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ১০-১১ মার্চ বাংলা সন প্রবর্তন করেন। এবং তা কার্যকর করেন তার সিংহাসন আরোহনের সময় থেকে। অতীতে বাংলা নববর্ষের মূল উৎসব ছিল হালখাতা। এটি পুরোপুরি একটি অর্থনৈতিক ব্যাপার। গ্রামে-গঞ্জে নগরে ব্যবসায়ীরা পহেলা বৈশাখে তাদের পুরনো হিসাব নিকাশ সম্পন্ন করে হিসাবের নতুন খাতা খুলতেন। এ উপলক্ষে তারা খরিদ্দারদের আমন্ত্রণ জানিয়ে মিষ্টি বিতরণ করতেন। এই অনুষ্ঠানটি এখনো পালিত হয়।

গ্রামের সাধারণ মানুষের কাঁপছে দিনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই দিন তারা বাড়িঘর পরিষ্কার রাখেন। পবিত্রতার প্রতীক হিসেবে আমপাতার মালা গেঁথে তা দিয়ে বাড়ি সাজায়। ব্যবহার্য সামগ্রী ধোয়ামোছা করে এবং ভোরে স্নান সেরে পূত পবিত্র হয়। এ দিনটিতে ভালো খাওয়া, ভালো থাকা এবং ভালো কাপড় পরাকে মঙ্গলজনক বলে বাঙালিরা মনে করে। প্রত্যেক বাড়িতে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের আগমন ঘটে। মিষ্টি, মিঠা, পায়েসসহ নানা রকম লোকজ খাবার তৈরির ধুম পড়ে যায়। একে অপরের সঙ্গে নববর্ষেরে শুভেচ্ছা বিনিময় চলে।

বাংলাদেশে বড় আকারে পহেলা বৈশাখ শুরু হয় ছায়ানটের উদ্যোগে ১৯৬৫ সালে। বাঙালি সংস্কৃতির হারানো উৎসবগুলোকে ফিরিয়ে আনার এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার এই উদ্যোগ বর্তমানে একটি মহাউৎসবে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে নগর জীবনে অত্যন্ত জাকজমকপূর্ণভাবে নববর্ষ পালিত হয়। বর্ষবরণের চমকপ্রদ জমজমাট আয়োজন ঘটে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায়। এখানে বৈশাখী উৎসবের অনুষ্ঠানমালা এক মিলনমেলার সৃষ্টি করে। নববর্ষের প্রথম প্রভাতে রমনা উদ্যান এবং এর চারপাশের এলাকায় প্রবল জনস্রোত সৃষ্টি হয় জাতীয় বন্ধন। ছায়ানটের উদ্যোগে জনাকীর্ণ রমনার বটমূলে রবীন্দ্রনাথের আগমনী গান 'এসো হে বৈশাখ, এসো এসো'– এর মাধ্যমে নতুন বর্ষকে বরণ করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে সবার হৃদয়ের উৎসব হতে জাতীয় সঙ্গীতের বিস্ফোরণ ঘটে। তাতে বাঙালি মাত্রই কণ্ঠমিলায়– আমার সোনার/ আমি তোমায় ভালোবাসি। এখন বাংলাদেশে পহেলা বৈশাখ ছাড়াও পালন করা হয় ঈদ, মহররম, পূজা ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠান। বসন্ত উৎসব, চৈত্র সংক্রান্তি, নবান্ন উৎসব, পৌষমেলা, রাসলীলা, দেওয়ালি, ভাইফোঁটা, রাখী বন্ধন, রথযাত্রা প্রভৃতি উৎসবও প্রচলিত। এসব উৎসবকে

হিন্দুয়ানি বলে আখ্যা দেয়ার লোক যে এখনো নেই তা নয়, তবে বেশিরভাগ মানুষ একে জাতীয় উৎসব হিসেবে মেনে নিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথকে আমরা সংগ্রাম করে অর্জন করেছি এবং এই উৎসবগুলোকেও প্রতিষ্ঠিত করেছি বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। তাই আমাদের দেশের এই উৎসবগুলো সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ, সৌভ্রাতৃত্বমূলক। এর সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক থাকে না। সকল ধর্মের, সকল বর্ণের, সকল শ্রেণীর মানুষ এতে সাড়া দেয়। তাই দিন দিন এই উৎসবগুলো হয়ে উঠছে আমাদের প্রাণের উৎসব, আমাদের আত্মপরিচয়ের উৎসব, বাঙালির উৎসব এবং দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হওয়ার উৎসব।

('সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্তি')

সংস্কৃতি : জাতীয় মুখশ্রী : উত্তাল পঞ্চাশ

'সংস্কৃতি মানে সুন্দরভাবে, বিচিত্রভাবে বাঁচা। প্রকৃতি সংসার ও মানব সংসারে মধ্যে অসংখ্য অনুভূতির শিকড় চালিয়ে দিয়ে বিচিত্র রস টেনে নিয়ে বাঁচা। নর-নারীর বিচিত্র সুখ–দুঃখে বাঁচা। বিশ্বের বুক মিলিয়ে বাঁচা।'

সংস্কৃতি সম্পর্কে উপরে উদ্ধৃত অসাধারণ বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন মরহুম মোতাহের হোসেন চৌধুরী– তাঁর 'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধে প্রায় ষাট বছর আগে। এরও আগে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে বাংলা ভাষায় সংস্কৃতি একটি আলোচিত বিষয়। ইংরেজি 'কালচার' শব্দের পরিভাষা হিসেবে আমরা সংস্কৃতি শব্দটি গ্রহণ করেছি। এর পরিভাষা অনুশীলন, কৃষ্টি না সংস্কৃতি হবে এই নিয়ে একটি বিতর্কের সূচনা হয়েছিল। যারা এর সরাসরি অর্থের দিকে ঝুঁকেছিলেন তারা বেছে নিয়েছিলেন অনুশীলন আর কৃষ্টিকে। যারা ঝুঁকেছিলেন একে ইতিহাসের ধারার সঙ্গে সংযুক্ত করে এর আভ্যন্তরীণ মর্মবাণীকে উদ্ধার করতে, তারা বেছে নিয়েছিলেন সংস্কৃতিকে। রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল উপস্থিতি এবং কালচারকে সংস্কৃতিরূপে শনাক্তকরণের মধ্যদিয়ে সংস্কৃতি বলতে আমরা মানুষের প্রায় সমুদয় বাস্তব ও মানসিক কীর্তি এবং কর্ম, তার জীবনযাত্রার আর্থিক সামাজিকরূপ অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান; তার মানসিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তা-ভাবনা, নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, নানা ধরনের শিল্প সৃষ্টি, সমস্ত কারুকলা ও চারুকলাকে ঐতিহ্যের সঙ্গে সমন্বিত করে বুঝতে শিখেছি এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করতে শিখেছি।

এই বিচার-বিশ্লেষণের মূল কথা হলো– মানুষের সংস্কৃতি আছে, অন্য কোনো প্রাণীর সংস্কৃতি নেই। এই মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভৌগোলিক আবহাওয়া, গণ্ডি, পরিবেশ, ভাষা, সাহিত্য এবং ইতিহাসের অন্তর্গত হয়ে বিকাশ লাভ করেছে এবং নিজস্ব ঐতিহ্যের অনুসারী হয়ে কালান্তরের মধ্য দিয়ে আধুনিক জগতে প্রবেশ করেছে। তাই সংস্কৃতির শরীরে আমরা কালগত স্থানগত নানা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি এবং একে কালগত ও স্থানগতভাবে বিশ্লেষণ করাও চেষ্টা করি। এভাবে সংস্কৃতি ইউরোপীয় সংস্কৃতি, ভারতীয় সংস্কৃতি, বাঙালি সংস্কৃতি, চীনা সংস্কৃতিরূপে চিহ্নিত হয়। আবার কালগতভাবে হতে পারে প্রাচীন যুগের সংস্কৃতি, মধ্যযুগের সংস্কৃতি এবং আধুনিক যুগের সংস্কৃতি। যে

কোনো দেশের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই একই ভৌগোলিক অঞ্চলে বাস করেও শ্রেণীগত, বর্ণগত, ভাষাগত এবং ধর্মীয় কারণে সংস্কৃতি নানা উপাধারায়ও প্রাবহিত হতে পারে। যেমন হিন্দু সংস্কৃতি, মুসলিম সংস্কৃতি, বৌদ্ধ সংস্কৃতি কিংবা অভিজাত সংস্কৃতি, চাষা-মজুরের সংস্কৃতি ইত্যাদি। এছাড়া সামন্ততান্ত্রিক, বুর্জোয়া এবং সমাজতান্ত্রিক অভিধায়ও সংস্কৃতিকে উল্লেখ করা হয়। আবার আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, গণমাধ্যম ও টেলিভিশনের দ্রুত উন্নয়নের ফলে সংস্কৃতি আজ রাষ্ট্রগত ও স্থানগত দূরুত্ব অতিক্রম করে বিশ্ব সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। ফলে এক দেশের সংস্কৃতিতে অন্য দেশের সংস্কৃতির প্রভাব এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আধিপত্য এবং অপসংস্কৃতি হিসেবে প্রবেশ করার বিষয় ইদানীং নানাভাবে আলোচিত হচ্ছে।

যে কোনো একটি বিষয়কে অবগতির এলাকায় আনার জন্য আমরা এক নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পারি এবং বিশ্লেষণও করতে পারি। একে উপর থেকে দেখতে পারি, নিচের থেকে দেখতে পারি এবং পাশে থেকে দেখতে পারি। নানা অবস্থান থেকে দেখতে পারি। একেক দৃষ্টিকোণ থেকে এর একেক পরিচয়, একেক ধরনের বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও বিষয়টির অখণ্ডতা ব্যুৎপত্তিগত ঐক্য কোনো ক্ষেত্রে বর্জনীয় নয়। সংস্কৃতিতে আমরা যেভাবেই বিশ্লেষণ করি না কেন তার প্রাণশক্তি মানুষ এবং মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। আদি উৎস থেকে তার উৎক্রমণ এবং নতুন ধারার সৃষ্টি। লেনিনের ভাষায়– মানুষের পরম সম্পদ হলো তার জীবন। এই বাঁচার সুযোগ বারবার আসে না। সুতরাং এমনভাবে বাঁচতে হবে যেন কাপুরুষতার ধিক্কার নিয়ে তিলে তিলে অনুশোচনায় মরতে না হয়। এমনভাবে বাঁচতে হবে, যেন বছরের পর বছর উদ্দেশ্যবিহীন বিভ্রান্তিতে দগ্ধ হয়ে না মরতে হয়। বাঁচেত হবে এমনভাবে যাতে সে বলতে পারে আমার সমস্ত জীবনের সব শক্তি নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছি পৃথিবীর মহত্ত্বর আদর্শের পেছনে। সে আদর্শ আর কিছুই নয়, মানব জাতির মুক্তি।

একজন কালচার্ড লোক বলতে আমরা যেমন বুঝি লোকটির জীবনবোধ, খাদ্যাভ্যাস, সামাজিক চেতনা, দক্ষতা, পোশাক-পরিচ্ছেদ, আচার-ব্যবহার, রুচি এবং মূল্যবোধ উন্নতমানের। একটি জাতির সংস্কৃতি কোন মানের তা পরিমাপ করি তার সামগ্রিক সৃষ্টিশীলতা, ঐতিহ্য, জীবনবোধ, সামাজিক চেতনা, উৎপাদন পদ্ধতি, রুচি এবং মূল্যবোধ দিয়ে। কোন জাতি কালের কোন স্তরে তথা ইতিহাসের কোন স্তরে বিরাজ করছে তা নির্ণয় করার জন্য আমরা প্রথমত দেখি ঐ জাতির উৎপাদন পদ্ধতি, বণ্টন ব্যবস্থা, শ্রেণী বিন্যাস এবং উন্নততর সংস্কৃতি নির্মাণে জনগণের ব্যাপক অংশের উদ্যম, উদ্যোগ ও অংশগ্রহণকে। দীর্ঘদিন ইতিহাসে সামন্তবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের উপস্থিতি, পৃথিবীর গুটিকয়েক দেশের বিশ্বব্যাপী লুণ্ঠন, শোষণ এবং নির্যাতনের ফলে বিশ্বের অধিকাংশ দেশ এবং জনপদ ইতিহাসের সমান পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি। বহু দেশ এখনো সামন্ততন্ত্র ও মধ্যযুগে বিরাজ করছে। ফলে ঐসব দেশ আধুনিক জীবনের নানাধরনের উন্নতমানের সুযোগ-সুবিধা, বৈষয়িক উন্নতি, সাংস্কৃতিক অগ্রগতি এবং চিন্তা-চেতনা থেকে বঞ্চিত।

এখন দেখা যাক, সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান কোথায়।

রাষ্ট্র আমাদের নতুন। দেশ আমাদের নতুন নয়। এই দেশবাসীর একটি সুপ্রাচীন ইতিহাস এবং সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা আছে। আছে এই ধারাবাহিকতার বিচিত্র বিকাশ। এই বিকাশের সবটাই যে সুখের তা বলা যাবে না। বলা বাহুল্য, ইতিহাসের স্রোত কোনো সময় সরলরেখায় প্রবাহিত হয় না। প্রবাহিত হয় না বলেই বহু জটিল আবর্ত, বাঁক অতিক্রম করে বহু দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের উৎপত্তি।

আগেই বলেছি আমাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিকাশের সবটাই সুখের ছিল না। এরমধ্যে দুই প্রধান সম্প্রদায়ের অসম উন্নতিতে আহত বৃটিশ আমলে নতুন বিকশিত প্রতিযোগী মুসলিম মধ্যবিত্তের বিক্ষুব্ধ হওয়ার ছিল যথেষ্ট উপকরণ। ফলে এই বিক্ষোভ সংস্কৃতি সাধনার সমন্বয়ের পথে না গিয়ে, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে সম্পৃক্ত না হয়ে মাঝে মাঝে ভিন্ন পথ ধরেছিল। অথচ যে কোনো পরাধীন দেশের সংস্কৃতি সাধনার মূল প্রেরণা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রেরণা। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতাকে কেন্দ্র করে বিকাশ লাভ করে সংস্কৃতির মানবিক বেগবান মূলধারা। বিভিন্ন শ্রেণী এবং সম্প্রদায়ের ঐক্য সম্প্রসারিত করে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে শুরু হয় এর সংগ্রামী অগ্রযাত্রা। কুসংস্কারের পিছুটান, বিভেদের হাতছানি, সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচন করে মুক্তবুদ্ধির সম্প্রসারণ ঘটিয়ে জাতীয় মুখশ্রী ফুটিয়ে তোলে ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতি। কিন্তু উক্ত ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমরা মুসলমান না বাঙালি এই সংশয়ের আবর্তে আমাদের দীর্ঘদিন কেটেছে এবং শেষ পর্যায়ে দ্বিজাতিতত্ত্বের চোরাবালিতে পা দিয়ে আমরা প্রাণপণে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি 'বাঙালি সংস্কৃতি বাংলার মুসলমানের সংস্কৃতি নয়। এ সংস্কৃতি বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র যুগের সংস্কৃতি। এটা খুবই উন্নত সংস্কৃতি হতে পারে তবে এটা বাংলার মুসলমানের সংস্কৃতি নয়। ত্যাগের আদর্শ, বৈরাগ্যের আদর্শ, ভক্তিবাদের আদর্শ, প্রেমের আদর্শ, সমস্তই উঁচুদরে আদর্শ। এই আদর্শকে বুনিয়াদ করে নারী প্রেমকে কেন্দ্র করে, হিন্দু শিল্প-সংস্কৃতি মনীষীরা যে সাহিত্য রচনা করেছেন সে সবই হয়েছে খুবই উচ্চাঙ্গের সাহিত্য এবং তা পড়ে অপর সকলের মতো, মুসলমান রস পিপাসুরাও পিপাসা নিবারণ করে। কিন্তু সত্য কথা এই যে, এ সংস্কৃতিতে মুসলমানরা জাতীয় সংস্কৃতি মনে করে না। কারণ,ত্যাগ-বৈরাগ্য-ভক্তি প্রেম যতোই উঁচুদরের আদর্শ হোক, মুসলমানের তা জীবনাদর্শ নয়।' (আবুল মনসুর আহমেদ, পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁস সম্মেলন, ১ ও ২ জুলাই ১৯৪৪, মূল সভাপতির ভাষণ)। এই স্বাতন্ত্র্যের দাবি জানিয়ে তিনি নিজেই আবার প্রশ্ন তুলেছেন, তবে কি বাংলার মুসলমানের কোনো সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নেই? তাকে কি তবে সাহিত্য সাধানায় ক খ থেকে শুরু করতে হবে? তিনি নিজেই উত্তর দিচ্ছেন, না। অবস্থা অতোটা নৈরাশ্যজনক নয়। বাঙলার বর্তমান সাহিত্যে মুসলমানের কোনো দান নেই এ কথা ঠিক নয়। বস্তুত মুসলমানের যেমন এক নিজস্ব সংস্কৃতি আছে। তেমনি তাদের একটি নিজস্ব সাহিত্যও আছে। যে সাহিত্যের নাম মুসলমানী বাংলা সাহিত্য বা পুঁথি সাহিত্য। মাদ্রাসা-মক্তবে লাখ লাখ মুসলমান পাঠক যার থেকে জীবনের প্রেরণা পাচ্ছে। ঐ সম্মেলনে তিনি দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যসমৃদ্ধ বাঙালি সংস্কৃতিকে শুধু অস্বীকার করেছিলেন তা নয়। তিনি বর্তমান ভাষার ইসলামী রূপান্তর এবং বর্ণমালা সংস্কারের কথাও তুলেছিলেন। বলা বাহুল্য, এই মতামত তাঁর একার ছিল না। ঐ সম্মেলনে পঠিত সমুদয় ভাষণের মূল সুর

ছিল একটি। বাঙালি মুসলমানরা আলাদা জাতি এবং তার সংস্কৃতি (তমদ্দুন) বাঙালি সংস্কৃতির ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র ধারার অধিকারী। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাঁর ভাবশিষ্য খোন্দকার আবদুল হামিদ ঐ আদর্শের ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদ এবং সংস্কৃতির প্রসঙ্গ পুনঃউত্থাপন করে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও তামদ্দুনিক ভাবনা-চিন্তা সম্প্রসারণের চেষ্টা করেন।

এই বিশ্বাসের ভিত্তি ভূমিতে দাঁড়িয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার প্রথম যুগে একদল কবি-সাহিত্যিক ভাবলেন, আমদের সাহিত্য সংস্কৃতি হবে ইসলামী এবং তা মুসলমানকে নিয়েই, মুসলমানের জন্য। আর সেই সাহিত্য সংস্কতি পরিপুষ্ট হবে ইসলামী ভাবাদর্শে ইসলামের ধর্মীয় প্রবণতা নিয়েই। শুধু ভাষা নয়, এই সংস্কৃতি সাধনার ব্যাপারে নিজেদের ঐতিহ্য কি হবে, তা সুনির্দিষ্ট করতে গিয়ে তাঁরা বলেন, আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মধ্যে যেখানে বিন্দুমাত্র হিন্দুয়ানি গন্ধ আছে তা বর্জনীয়। এমনকি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত। ভাষার রূপান্তর ঘটাতে গিয়ে তারা বললেন, বাংলা ভাষার বর্তমান রূপ অবিকৃত রাখা যাবে না, এই ভাষাকে পরিশোধন করতে হবে। বর্তমান অবস্থায় যে ভাষা আছে তাকে রাষ্ট্রভাষাও করা যাবে না। আরবি অক্ষরে বাংলা লিখতে হবে ইত্যাদি। আর এই ছিন্নমূল সংস্কৃতির নাম দিলেন তারা: তমদ্দুন। এসব কবি-সাহিত্যিকের কবিতায়, প্রবন্ধে এমনকি গল্প ও নাট্য সাহিত্যে প্রচুর আরবি, ফারসি, , উর্দু শব্দের যথেচ্ছ ব্যবহারের মাধ্যমে এমন এক উদ্ভট ভাষা সৃষ্টির কাছে তৎপর হয়ে উঠলেন– যার সঙ্গে বাংলা ভাষার মূলত বিচ্ছেদ আনার চেষ্টা শুরু করলেন বলা যায়। এই বিচ্ছেদের হাত থেকে বাংলার লোকজ সংস্কতিও বাদ গেল না। এই মতাদর্শের হাতের মুঠোর মধ্যে তখন যাবতীয় পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা, প্রচার মাধ্যম এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, এতো সুযোগ-সুবিধা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে থেকে সত্যিকার প্রতিভার দীপ্তি নিয়ে কেউ বেরিয়ে এলেন না। তাদের হাত দিয়ে এমন কোনো উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি হলো না, যা সাহিত্যকর্ম হিসেবে উজ্জ্বল এবং ইসলামের প্রকৃত ভাবধারায় মহিমান্বিত। তাদের দ্বারা এমন কোনো তামদ্দুনিক ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠিত হলো না, যা রুচির দিক থেকে সুন্দর। যা চিন্তার দিক থেকে অগ্রসর, মূল্যবোধের দিক থেকে গ্রাহ্য, যুক্তবাদী এবং মাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত। কেবলমাত্র বিরোধধর্মী, অনগ্রসর পুঁথি সাহিত্যভিত্তিক, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি, প্রণোদিত বিভেদ ও বিদ্বেষকে সম্বল করে উন্নতমানের কোনো মহৎ সাহিত্য সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারে না। তারা দীর্ঘদিন তারই প্রমাণ দিয়েছেন। সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে ইসলামাইজেশন করতে গিয়ে অমৃতের বদলে গরলই তুললেন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। দেশজ পালা-পর্ব, উৎসব, মেলা এমনকি পহেলা বৈশাখ পর্যন্ত বিবেচিত হলো হিন্দু-সংস্কৃতিরূপে।

শাসকশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় যে তথাকথিত তমদ্দুনের যাত্রা ১৯৪৪ সালের রেনেসাঁস সম্মেলনের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হওয়ার দীর্ঘদিনের মধ্যেও তা দেশের মাটিতে শিকড় গাড়তে পারল না। কারণ এর সামাজিক এবং রাজনৈতিক ভিত্তি ছিল ভ্রান্ত। দৃষ্টি ছিল সংকীর্ণ, অনুদার, দেশের সাংস্কৃতিক মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন। তাহলে কি বলা যায়, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার তেইশ বছরের দীর্ঘ বিস্তৃতির মধ্যে এই

অপসংস্কৃতির পাশাপাশি জাতীয় সংস্কৃতির মূলধারার সঙ্গে সম্পর্কিত উদার মানবিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে কোনো গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি। এই সময় শিল্পে সাহিত্যে, সঙ্গীতে, রাজনীতির বিস্তৃত অঙ্গনে, মেহনতি মানুষের আন্দোলনে, নাটকে, কবিতায়, উপন্যাসে, ছোটগল্পে, চলচ্চিত্রে এমন কিছুই কি আমরা পাইনি যা আমাদের আনন্দ দিয়েছে, তৃপ্তি দিয়েছে, অনুভূতিকে নাড়া দিয়েছে, মূল্যবোধকে সমৃদ্ধ করেছে, বাঁচার সংগ্রামকে দিয়েছে প্রেরণা আর চেতনাকে করেছে উন্মোচিত।

এই খতিয়ে দেখার বেলায় কোনো কোনো কবির বিশেষ কোনো কবিতা প্রেমের কিংবা সংগ্রামের আমাদের মনে দোলা দেবে। কারো মনে ভাসবে কোনো গল্পের উজ্জ্বল পটভূমি, বিশেষ কোনো চরিত্র কিংবা এক টুকরো চমকপ্রদ কাহিনী। কোনো কোনো নাটকের জীবনমুখী সংলাপ কারো মধ্যে উত্তেজনার ঢেউ তুলবে, কারো মনে দুই একটি উপন্যাসের পটভূমি বিস্তার লাভ করবে। কিংবা কারো মনে ঝিলিক দিয়ে উঠবে কোনো বিশেষ নায়ক-নায়িকা, নানা চরিত্র, ঘটনা বা মহৎ পরিণতি। কোথাও বিষয় বস্তুর মহত্ত্বে সুস্পষ্ট কিংবা কোথাও পরীক্ষা-নিরীক্ষার চেষ্টায় চটকদার।

এভাবে ঐতিহ্যের সরসতায়, কঠিন প্রতিকূলতার মাটি ভেদ করে, জীবন বিরুদ্ধ শক্তির সংকীর্ণ স্বার্থগত পাদপীঠ রচনার ঘৃণ্য প্রয়াসের বিরুদ্ধে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির অংকুর উদগত হতে থাকল নতুন এবং পুরোনো বেশ কয়েকজন কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক এবং সংস্কৃতিকর্মীর নিরলস প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে। “সবার উপরে মানুষ সত্য” এই আদর্শ প্রেরণার আলোকে যাদের মানসলোকের অন্ধকার ছিল অপসারিত, তারা সবাই এসে যোগ দিয়েছে এই নতুন কর্মোদ্যমে। প্রচণ্ড প্রতিকূলতার মধ্যে, বিভ্রান্তির মধ্যে সুস্থ জীবনবোধ নিয়ে সাহিত্য-সংস্কৃতির কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁরা। এরা বাঙালির সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে নতুন করে সকলের সামনে হাজির করেছিলেন। তেমনি এই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী সাধারণ মানুষকেও সম্প্রদায় নির্বিশেষে শিল্পে সাহিত্যে এনে হাজির করতে শুরু করলেন। এদের তুলি ও কলমের আঁচড়ে, গল্পে-কবিতায়, নাটকে এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ফুটিয়ে তুলেছিলেন মধ্যবিত্ত জীবনের দৈনন্দিনতা, সুখ-দুঃখের দোলা, ঘর বাঁধার আকুল প্রয়াস। সামাজিক কুসংস্কার, পিছুটান আর অনুশাসনের বেড়া ভেঙে উদগত প্রেম-প্রীতির বর্ণাঢ্য সুষমা ফুটিয়ে তুলেছেন অনেকে গানে, গল্পে, কবিতায়। বাংলার আকাশ মাটি প্রকৃতি এবং সংগ্রামী চেতনা নতুন করে ছন্দিত হয়েছে কোনো কোনো কাব্যে। ছোট-বড় সুখ-দুঃখের জীবনের অসংখ্য টানাপোড়েনের মধ্যে দেশপ্রেমিকের আত্মত্যাগ, মাটির মমতা, দেশপ্রীতি ও নির্মম নির্যাতনের বিরুদ্ধে দুরন্ত সংগ্রামের কাহিনী কখনো মঞ্চে, কখনো ময়দানে, কখনোবা সরাসরি দুঃসাহসিক সাহিত্যায়নের মাধ্যমে জীবন্ত করে তোলার চেষ্টা করেছেন কেউ কেউ। এভাবে অতীতের বিভ্রান্তি এবং বিচ্যুতি কাটিয়ে আমরা ক্রমে ক্রমে জীবনঘনিষ্ঠ জাতীয় সংস্কৃতির মূল প্রবাহের সঙ্গে সংযুক্ত হতে শুরু করলাম। উপলব্ধি করতে শুরু করলাম সংস্কৃতি বিভেদের চামুণ্ডা নয়, ঐক্যের সোপান। বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যে বিভিন্ন ধর্মের উপাদান আছে সত্য। কোথাও কোথাও বিভেদও আছে, এটাও সত্য। এই বিভেদকে প্রাধান্য দিয়ে মূলধারা থেকে বিচ্যুত হওয়ার অর্থ কূপমণ্ডুকতা। এই বিভেদ বাঙালি সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের লক্ষণ।

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের জাল বোনা সংস্কৃতির কাজ। এই উপলব্ধি থেকে কোথাও ব্যক্তিগত চেষ্টায় কোথাও সমষ্টিগত উদ্যোগে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, খুলনায় এবং অন্যান্য বহু জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে পঞ্চাশ দশকে শুরু হয় এই নতুন সংস্কৃতি চেতনার দুর্বার জয়যাত্রা। বাঙালি মুসলমানের স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের পথে সাধারণ মানুষের দৃপ্ত আবির্ভাবের সোনালী সূচনার সেই এক গৌরবময় অধ্যায়। কোথাও প্রতিকূলতার মুখে সাময়িকভাবে স্তিমিত, কোথাও সাংগঠনিক ঐক্যে দৃপ্ত পদচারণায় উদ্দীপিত। বলা বাহুল্য, এই অগ্রগতির পুরোভাগে ছিলেন পূর্ব বাংলা বিভিন্ন অঞ্চলের মার্কস্‌বাদে দীক্ষিত একদল তরুণ সাংস্কৃতিক কর্মী। চল্লিশ দশকে এদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন মার্কস্‌বাদ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। যার ফলে জন্ম নিয়েছিল ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘ, প্রগতি লেখক শিল্পীসংঘ এবং ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তীব্র নির্যাতনের মুখে এই সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু বিলুপ্ত হয় না এই চেতনার আলোকে যে গণসংস্কৃতি সৃষ্টি হয়েছিল তার জীবনবাহী ধারা। এই ধারায় অবগাহন করে এদেশের তরুণরা খুঁজে পেয়েছিলেন নব্য শাসকদের বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, শ্রেণী শোষণের বিরুদ্ধে নবীন বিদ্রোহের সুর এবং আদর্শ প্রেরণার ব্যাকুলতা। একটি প্রবল আদর্শগত বিশ্বাসের প্রেরণায় জীবনের সঙ্গে সংস্কৃতির গভীর অন্তরঙ্গতার সন্ধানে সেদিন সংস্কৃতির বিভিন্ন অঙ্গনে এরা প্রবল সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তারা ছিলেন গণসংস্কৃতির মূর্তপ্রতীক, নবীন এবং প্রবীণ লেখকদের আদর্শস্থল। তারা শুধু এই প্রবাহের জীবননীতিতে আস্থাবান ছিলেন না, সবার ওপর কোন মানুষ সত্য তাকে শ্রেণীগত দৃষ্টিতে বিচার করে নিতে চেয়েছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সংস্কৃতিকে রাজনীতি এবং বিপবের হাতিয়ার হতে হবে এ রকম দাবিও তুলেছিলেন। শিল্প-সাহিত্য এবং সংস্কৃতিকে রাজনৈতিক নির্দেশের অধীন করে এর কাছ থেকে মতবাদের অন্ধ আনুগত্য দাবি করা ক্ষতিকর মনে করে অনেক উদারনৈতিক সাহিত্যিক এ দাবি মেনে নিতে পারেননি। তবে এই অভিযাত্রীদের বুকে অন্যায় শোষণ, নির্যাতন এবং জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে যে আগন জ্বলছিল এবং বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্যে যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল তার উত্তাপও কেউ উপেক্ষা করতে পারেননি। আমাদের সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার প্রাথমিক অথচ বিস্ময়কর উদ্যোগে এই বিদ্রোহীদের অবদান কখনো কখানো উচ্চকণ্ঠের তীব্রতায় বিধৃত হলেও সংস্কৃতির নতুন দিগন্ত আবিষ্কারে, সংস্কৃতিকে মানবিক এবং একই সঙ্গে গণমুখী করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় এরাই হলেন নতুন গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির পথিকৃৎ। এরা অনতিকালের মধ্যে বিভিন্ন এলাকার সংস্কৃতিকর্মীদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে একটি ঐক্যবদ্ধ সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট গড়ে তোলার ন্য তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। সম্মিলিন ঘটিয়েছিলেন নবীন এবং প্রবীণ লেখক শিল্পীদের ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে। যার ফলে ১৯৫১ সালের ১৬, ১৭, ১৮ এবং ১৯ মার্চ চট্টগ্রামে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়েছিল জাতীয় সংস্কৃতি সম্মেলন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ইতিহাসে শিল্পী-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের এ ধরনের সম্মেলন এই প্রথম। নানা প্রতিকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে এই সম্মেলন ব্যাপক সাফল্য লাভ করেছিল বলা যায়। চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ঢাকা, রাজশাহী, সিলেট,

খুলনা, পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য স্থানের শিল্প-সাহিত্যিকরা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সম্মেলনের মূল সভাপতি ছিলেন আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ। কবি সুফিয়া কামাল সম্মেলনের উদ্বোধন করেছিলেন। কোলকাতা থেকে প্রখ্যাত সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার এসেছিলেন প্রধান অতিথি হিসেবে। ঢাকা থেকে আলাউদ্দিন আল আজাদ, মুস্তাফা নূরউল ইসলামসহ আরো অনেক নবীন ও প্রবীণ সাহিত্যিক যোগ দিয়েছিলেন। ঢাকা থেকে আরো অনেক শিল্পী সাহিত্যিকের যোগ দেয়ার কথা থাকলেও সরকারি নিষেধাজ্ঞার ফলে যোগ দিতে পারেননি। কোলকাতা থেকে সলিল চৌধুরীর নেতৃত্বে গণনাট্য সংঘের একটি স্কোয়াড তিনদিন ধরে গণসঙ্গীত পরিবেশন করেছিলে। রমেশ শীলের যুদ্ধ ও শান্তি বিষয়ক কবিগান নতুনমাত্রা যোগ করেছিল। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে ঢাকা আর্ট গ্রুপ এই প্রথম শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করেন সম্মেলনে। সম্মেলনে রাষ্ট্রভাষা, বিশ্বশান্তি, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ও বন্দী মুক্তির ওপর আঠারটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল এবং তার ভিত্তিতে একটি জাতীয় সংস্কৃতি সংগঠন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়েছিল। এই সম্মেলনেই পূর্ব বাংলার ভবিষ্যৎ সংস্কৃতির রূপরেখা নির্দেশিত হয়।

১৯৫২ সালের ঢাকায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে ২১ ফেব্রুয়ারিতে যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হলো তা আকস্মিক মনে হলেও তার পেছনে ছিল দীর্ঘদিনের ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় উদঘাটনের প্রস্তুতি। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ভাষা আন্দোলন এবং ২১-এর মহান আত্মত্যাগের মহিমায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলার সাংস্কৃতিক–কর্মীরা ক্রমে ক্রমে আরো সুসংগঠিত হয়ে ওঠে। ১৯৫২ সালের ২২, ২৩ ও ২৪ আগস্ট অনুষ্ঠিত কুমিল্লায় পূর্ব পাকিস্তান সংস্কৃতি সম্মেলন। সম্মেলন উদ্বোধন করেছিলেন অধ্যক্ষ আখতার হামিদ খান। সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন চট্টগ্রাম থেকে প্রান্তিক নব নাট্যসংঘ, রেলওয়ে শিল্পীসংঘ। সিলেট থেকে মুসলিম সাহিত্য সংসদ, ঢাকা থেকে আর্ট গ্রুপ ও অগ্রণী সংসদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদ। ঢাকা ও পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্পী-সাহিত্যিকদের ব্যাপক উপস্থিতি এক গভীর অন্তরঙ্গ পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে গড়ে ওঠে এক সৌহার্দ্যপূর্ণ আদর্শগত ঐক্য। যার ফলে ১৯৫৪ সালেল সাধারণ নির্বাচনে সাংস্কৃতিক কর্মীরা ব্যাপকভাবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে যুক্তফ্রন্টকে জয়যুক্ত করার কাজে সহায়তা করে। ২১ দফা জাতীয় মেগনাকার্টা হিসেবে গৃহীত হয় এবং যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করে। ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ঢাকায় কার্জন হলে অনুষ্ঠিত হয় সপ্তাহব্যাপী সাহিত্য সম্মেলন। মূল সভাপতি ছিলেন ড. আবদুল গফুর সিদ্দিকী। উদ্বোধক ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। ঐ সম্মেলন উদ্বোধন করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় সরকারি উদ্যোগে যে সাহিত্য সম্মিলনীর অধিবেশন হয়েছিল তাতে বড় আশাতেই বুক বেঁধে আমি অভিভাষণ দিয়েছিলুম। কিন্তু তারপর যে প্রতিক্রিয়া হয়, তাতে হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলুম, স্বাধীনতার নতুন নেশায় আমাদের মতিচ্ছন্ন করে দিয়েছে। আরবি হরফে বাংলা লেখা, বাংলা ভাষায় অপ্রচলিত আরবি ফারসি শব্দের অবাধ আমদানি, প্রচলিত বাংলা ভাষাকে গঙ্গাতীরের ভাষা বলে তার পরিবর্তে পদ্মাতীরের ভাষা

প্রচলনের খেয়াল প্রভৃতি ব্যাকুলতা আমাদের একদল সাহিত্যিককে পেয়ে বসল। তারা এইসব মাতলামিতে এমনভাবে মেতে গেলেন যে, প্রকৃত সাহিত্যসেবা যাতে দেশের ও দশের মঙ্গল হতে পারে, তার পথে আবর্জনার স্তূপ দিয়ে সাহিত্যের উন্নতির পথ কেবল রুদ্ধ করেই খুশিতে ভূষিত হলেন না বরং খাঁটি সাহিত্যসেবীদের নানা প্রকারে বিড়ম্বিত ও বিপদগ্রস্ত করতে আদাজল খেয়ে কোমর বেঁধে লেগে গেলেন। তাতে কতক উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী উসকানি দিতে কসুর করলেন না। ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং অন্যান্য পশ্চিমবঙ্গের কবি ও সাহিত্যিকগণের কাব্য ও গ্রন্থ আলোচনা, এমনকি বাঙালি নামটি পর্যন্ত যেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলে কেউ কেউ মনে করতে লাগলেন। কেউ এতে ভূতের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে আবোল-তাবোল বকতে শুরু করে দিলেন এবং বেজায় হাত পা ছুঁড়তে লাগলেন। করাচির তাঁবেদার লীগ গভর্নমেন্ট বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্যে কিছু করা দূরে থাক, বাঙালি বালকের কচি মাথায় উর্দুর বোঝা চাপিয়ে দিলেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আরবি হরফে বাংলা ভাষা লেখার এবং উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার অপচেষ্টায় সহযোগিতা করেছেন।

১৯৫৭ সালের ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি কাগমারীতে অনুষ্ঠিত হয় মওলানা ভাসানীর আহ্বানে পঞ্চাশ দশকের শেষ সংস্কৃতিক সম্মেলন। এই সম্মেলনে ঢাকা ও চট্টগ্রাম থেকে গণসঙ্গীত এবং কবিগান পরিবেশন করার জন্য এসেছিলেন বহু শিল্পী। কোলকাতা থেকে অতিথি সাহিত্যিকরাও এসেছিলেন। এই অধিবেশনেই মওলানা ভাসানী পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি তার ঐতিহাসিক 'আসসালামু আলাইকুম' উচ্চারণ করেন এবং তীব্র সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নীতি অনুসরণ করেন। ফলে সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও তার প্রতিক্রিয়া সূচিত হয়। সাম্রাজ্যবাদ ঘেঁষা এবং পাকিস্তানের অখণ্ডতায় বিশ্বাসী সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবীরা মওলানার এই বলিষ্ঠ নীতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন পত্রিকায় ব্যাপক প্রচারাভিযান শুরু করে– একে ভারতীয় ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করেন। বলা যেতে পারে পঞ্চাশ দশক ছিল আমাদের সাংস্কৃতিক ভিত রচনার সুবর্ণ যুগ। এই দশকেই নিখিল পাকিস্তানভিত্তিক সর্বস্তরের জনগণের ঐক্যের ভিত্তিতে গণতন্ত্রকামী, সাম্রাজ্যবাদ, সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী, সমাজতন্ত্রে আগ্রহী, পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার শোষণমুক্ত সমাজে বিশ্বাসী ন্যাপের জন্ম হয়। এই দশকে প্রথম চারটি মূলধারার সংস্কৃতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ঢাকা এবং কাগমারীতে যার মূল বক্তব্য ছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, সাম্প্রদায়িকতার অবসান, স্বায়ত্তশাসনের দাবি এবং সবার উপরে মানুষ সত্য – এই মানবিক উদারতার বাণীকে শিল্প সাহিত্যে অঙ্গীভূত করা।

চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত মাসিক 'সীমান্ত', মাসিক 'উদয়ন', ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'অগত্যা', 'মুক্তি' এবং 'সমকাল' এই মূলধারা মর্মবাণীকে প্রবল বাধা-বিপত্তির মুখে দেশব্যাপী প্রচারে এবং প্রসারে সাহসী ভূমিকা পালন করে। এই সাময়িকী ক'টি জাতীয়তাবোধ এবং মানবতাবোধ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শুধু সংগ্রামই করেননি, এদেশে বামপন্থী চিন্তাধারা প্রসারেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

এই দশকে আমরা রাষ্ট্রভাষা বাংলার স্বপক্ষে চরম ত্যাগের গৌরবে উজ্জীবিত হই এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে গোটা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে সমর্থ হই। এই

দশকে আওয়ামী মুসলিম লীগের গর্ভ থেকে আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবন ঘটে। ছাত্রলীগ সংগ্রামী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়; জন্ম হয় গণতন্ত্রী দলের মতো প্রগতিশীল একটি রাজনৈতিক দল। যুবলীগ এবং ছাত্র ইউনিয়নের মতো সংগ্রামী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণসংগঠন।

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের মধ্যে দিয়ে এই অঞ্চলের ভাষাভাষীদের দীর্ঘকালের একটি স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়। কিন্তু এই দীর্ঘ অগ্রযাত্রা কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না, পদে পদে ছিল বাধা, বিভেদ এবং প্রলোভনের হাতছানি। শাসকশ্রেণীর ষড়যন্ত্রের শিকার বহু সুপরিকল্পিত প্ররোচণায় পূর্ণ। তাই জিতেও আমাদের পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল। তথাপি এই শতকেই হাজার হাজার প্রমিথিউস জীবনের বিনিময়ে স্বর্গ থেকে স্বাধীনতার আগুন ছিনিয়ে এনে প্রত্যেকটি বাঙালির হৃদয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিল। এই দশকেই স্বাধীনতার বীজ তার কচি পাতাকে সূর্যমুখী করে তুলেছিল। যা একাত্তরে এসে পরিণতি লাভ করে। স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা এই চারটি অক্ষরের তীব্র যাদুমন্ত্রে জন্ম হয় একটি রাষ্ট্রভিত্তিক ও ভাষাভিত্তিক জাতি, একটি নতুন পতাকা।

যতোদিন পর্যন্ত সমাজে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অসমতা থাকবে এবং শোষক শোষিতের মধ্যে শ্রেণী বিভাগের অবসান ঘটবে না, তাতোদিন পর্যন্ত সমাজে দুঃখ দারিদ্র্য, অন্যায় অবিচার লেগে থাকবে। ক্ষুধায় অন্ন নেই, পরিধানে বস্ত্র নেই, শীতাতপে আশ্রয় নেই, রোগে চিকিৎসা নেই, জীবনে আনন্দের অবকাশ নেই– এ সংবাদ পৃথিবীর প্রাচীনতম সংবাদ। যে সংবাদ নতুন, যে সংবাদ সমাজবাদী দর্শন নিয়ে এসেছে, তাহলো এই অর্থনৈতিক অসমতা, ভাগ্য বিধাতার অমোঘ নির্দেশ নয়। মানুষের হাতে গড়া ব্যবস্থার অনিবার্য ফল। আর জনগণের হিতার্থে অর্থনৈতিক ক্ষমতার পথ রচনা মানুষেরই প্রয়াস-সাধ্য। কঠিন বিপ্লবের ভেতর দিয়ে এই অসাম্যের অবসান ঘটাতে হবে। এই প্রয়াসে রাজনৈতিক কর্মীর চেয়ে সাংস্কৃতিক কর্মীর দায়িত্ব কোনো অংশে কম নয়।

পঞ্চাশ দশকে উপরোক্ত সমাজতান্ত্রিক বিশ্বাসের আলোকে আমাদের প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী এবং সাংস্কৃতিক কর্মীদের পশ্চাৎভূমি ছিল উজ্জ্বল। তারা বিশ্বব্যাপী শোষণের পরিসমাপ্তি ঘটানোর উদ্দেশ্যে সমাজতন্ত্রকে লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাই সংস্কৃতির মূলধারায় শ্রেণী চেতনার প্রসার ঘটানোকে আবশ্যিক কর্তব্য বলে মনে করতেন। তাদের গান, কবিতা, নাটক, চিত্র, প্রত্যেকাটি শিল্পকর্ম, অনুষ্ঠান, সম্মেলন প্রভৃতি মূল প্রেরণা ছিল সমাজ পরিবর্তন। আর তাদের সৃষ্টিশীল উদ্যোগকে জনগণের নিকটবর্তী করা। এই পরিবর্তনে তারা শ্রেণী সংগ্রামে বিশ্বাসী ছিলেন এবং শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন। আমাদের সংস্কৃতিতে তারা এক নতুন সমাজ চেতনা এনেছিলেন এবং মানবিক চেতনাকে গণমানুষের চেতনায় পরিণত করার কাজে আত্মনিবেদিত ছিলেন। একদা তারা বিশ্বাস করতেন সাম্রাজ্যবাদ নির্ভর বুর্জোয়া গণতন্ত্রে মানুষের মুক্তি নেই। এই গণতন্ত্র এক ধরনের ভাঁওতা। যুগ যুগ ধরে শোষক শ্রেণী কিছু ভাড়াটিয়া শিল্পী-সাহিত্যিকের মাধ্যমে শোষকের গণতন্ত্রের জয়গান প্রচার করে গণমানুষকে শোষণ করে আসছে। এই শোষণ থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হয়ে কাজ করা এবং সৃষ্টিশীল কার্য্যাদ্যমের মাধ্যমে গণবিরোধী শক্তির মোকাবেলা করা।

কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের পতনের পর আমদের শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী, যাদের বলা হতো নতুন সংস্কৃতির রূপকার, তাদের অনেকেই সমাজতন্ত্রের ওপর আস্থা হারিয়েছেন। আস্থা হারিয়েছেন সেই আদর্শের ওপর, যে আদর্শ তাদের স্বপ্নলোকে একটি মঙ্গলময় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহন করত। অতীতের আদর্শগত নিষ্ঠা এবং অঙ্গীকার আজ প্রায় স্মৃতিতে বিলীয়মান। পুরাতন আদর্শকে অনেকেই নানা সংশয় ও দ্বিধায় পরিত্যাগ করেছেন। অন্য কোনো নতুনতর আদর্শ এবং বিশ্বাসের ব্যাকুলতা তাদের সৃষ্টিকে বিস্তৃত করতে পারছে না। একটি সংকীর্ণ জাতীয় বৈশিষ্ট্যবাদ তাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে তুলেছে। এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যবাদের নামে শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্ব এবং জাতীয় গণসংস্কৃতির সুবিশাল ঐতিহ্যকে বিসর্জন দিয়ে জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে চটকদার অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে অনেকেই প্রতিক্রিয়ার উদ্দেশ্য পূরণের হাতিয়ারে পরিণত হচ্ছেন। সমাজের উপরতলার সংস্কৃতি শোভনতা বর্ধনের ভার নিয়েছেন অনেকেই। আবার কেউ কেউ হতাশার শিকার হয়ে বিদেশী অপসংস্কৃতির প্রভাবে নানা ধরনের নিম্নরুচি এবং বিকৃতিকে অনিবার্য করে তুলেছেন। ফলে সাম্প্রদায়িকতা মৌলবাদ আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। আমাদের সংস্কৃতির জন্য এই অবস্থা অত্যন্ত শংকাজনক। এই সংকট কাটিয়ে তুলতে হলে নিপীড়িত এবং বঞ্চিত মানুষের সংগ্রামী চেতনা সম্প্রসারণের কাজে আমাদের আত্মনিয়োগ করতে হবে। বৃহৎ জনসমষ্টির আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে আশ্রয় না করে যতোই উচ্চমাপের কিংবা উচ্চমানের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি আয়োজনে আমরা তৎপর হই না কেন তাতে মধ্যবিত্তের সুখ স্বর্গ রচনার স্বপ্ন অচিরেই ধূলিস্মাৎ হয়ে যাবে।

('সংস্কৃতি: জাতীয় মুখশ্রী')

তথ্যনির্দেশ

১. মুহম্মদ মজিরউদ্দীন মিয়া, তসিকুল ইসলাম (সম্পা.), আবদুল হক চৌধুরী স্মারকগ্রন্থ, 'চট্টগ্রামের স্থাননাম পরিচিতি'। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬, পৃ. ২৪৩
২. মাহবুব উল আলম চৌধুরী, স্মৃতির সন্ধানে। ঢাকা: পালক পাবলিশার্স, ২০০৮, পৃ. ৬২
৩. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৬২
৪. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৬৫
৫. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৭১-৭৪
৬. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৬৭-৭০
৭. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ১৮
৮. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৩৩
৯. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৩৩
১০. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৩৬
১১. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৩৭-৩৮
১২. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৪৪
১৩. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৪৫
১৪. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ২৯১
১৫. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৪৯৩

১৬. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ১৯
১৭. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ১৯
১৮. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ১৯
১৯. মাহবুব উল আলম চৌধুরী, সূর্যাস্তের রক্তরাগ। ঢাকা: পালক পাবলিশার্স, ২০০৪, পৃ. ৪৭
২০. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৪৫
২১. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৭০
২২. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৬৮-৬৯
২৩. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ১৪৯
২৪. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ২৪
২৫. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ২৬
২৬. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৫২
২৭. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ২০
২৮. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৬৭
২৯. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৫৯
৩০. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৪৬
৩১. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৮৬-৮৭
৩২. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৭৬
৩৩. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৮০
৩৪. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৭৮
৩৫. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৪০
৩৬. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৫৮
৩৭. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ২৯
৩৮. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৬৩
৩৯. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৬১
৪০. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৬১
৪১. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ১৫৩
৪২. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ১৭৪
৪৩. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ১৪৯
৪৪. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ১৭৭
৪৫. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ১৮০
৪৬. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৩৬৫
৪৭. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৩৬৪
৪৮. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৪৩৩
৪৯. জওশন আরা রহমান, স্মৃতিকথা একটি অজানা মেয়ে। ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী, ২০১০, পৃ, ৬০
৫০. স্মৃতিকথা একটি অজানা মেয়ে, পৃ. ২২
৫১. স্মৃতিকথা একটি অজানা মেয়ে, পৃ. ৫১
৫২. স্মৃতিকথা একটি অজানা মেয়ে পৃ. ৪৯
৫৩. স্মৃতিকথা একটি অজানা মেয়ে, পৃ. ৭৮

৫৪. স্মৃতিকথা একটি অজানা মেয়ে পৃ. ৬১
৫৫. স্মৃতিকথা একটি অজানা মেয়ে, পৃ. ৬২
৫৬. স্মৃতিকথা একটি অজানা মেয়ে, পৃ. ৮০
৫৭. স্মৃতিকথা একটি অজানা মেয়ে, পৃ. ৮৬
৫৮. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ২৪
৫৯. জওশন আরা রহমান, 'পরিবারের পক্ষে', রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য (সম্পা.), মাহবুব উল আলম চৌধুরী: এক অবিস্মরণীয় কবিতার জনক। ঢাকা: পালক পাবলিশার্স, ২০০৬, পৃ. ৪১২, এরপর থেকে শুধু 'অবিস্মরণীয় কবিতার জনক' উল্লিখিত হবে।
৬০. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ১৭৬
৬১. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ১৭৬
৬২. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৮১
৬৩. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ১৯৫
৬৪. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ২৮৫
৬৫. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৫৭
৬৬. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ১২২
৬৭. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ১২২
৬৮. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ১০৬
৬৯. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ২০৩
৭০. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ২১৩
৭১. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ২১৩-২১৪
৭২. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ২১৯-২২০
৭৩. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ১৪১
৭৪. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ১৪২-১৪৩
৭৫. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ২১০
৭৬. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ২১০
৭৭. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৪৭২
৭৮. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৩৬৯
৭৯. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৩৯৯
৮০. ইসরাইল খান, জওশন আরা রহমান (সম্পা.) সীমান্ত সংগ্রহ। ঢাকা: পালক পাবলিশার্স, ২০০৫, পৃ. ৩৩৬
৮১. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৩৯৭-৩৯৮
৮২. বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, দ্বিতীয় খণ্ড। ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৬, পৃ. ২৩৬
৮৩. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৪০২
৮৪. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ২০৬
৮৫. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৩২৩
৮৬. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ২২৯
৮৭. এ কে এম এমদাদুল ইসলাম, 'যুব সম্মেলন ও উৎসব '৫৭ কিছু স্মৃতি কিছু কথা', মাহবুব হাসান (সম্পা.), চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রগতিশীল ধারা। চট্টগ্রাম: ১৯৯১, পৃ. ২৪, এরপর থেকে শুধু 'প্রগতিশীল ধারা' উল্লিখিত হবে।

৮৮. গোপাল বিশ্বাস, 'পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রেক্ষাপট চট্টগ্রাম', প্রগতিশীল ধারা, পৃ. ২৬, ২৭
৮৯. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৪৬৭-৪৬৮
৯০. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৪৬৯
৯১. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৪৬৯
৯২. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৫১৮
৯৩. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৩৮৫-৩৮৬
৯৪. বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, প্রথম খণ্ড। ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৫, পৃ. ৩০
৯৫. পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, দ্বিতীয় খণ্ড। ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৬, পৃ. ১৪৫
৯৬. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ১৮
৯৭. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৪৩০
৯৮. মোহাম্মদ আলী চৌধুরী, 'চট্টগ্রাম' অংশ, আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০০, পৃ. ৯১
৯৯. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৪২৬
১০০. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৪৩৯
১০১. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৪৩৯-৪৪১
১০২. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৪২৭
১০৩. ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস, পৃ. ৯৩
১০৪. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৫৩
১০৫. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৯২
১০৬. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৯৫
১০৭. মাহবুব উল আলম চৌধুরী, সংস্কৃতি: জাতীয় মুখশ্রী। ঢাকা: পালক পাবলিশার্স, ২০০৬, পৃ. ৩৯৭
১০৮. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৪০৯
১০৯. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৩৫৫
১১০. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৪৪১
১১১. সংস্কৃতি: জাতীয় মুখশ্রী, পৃ. ৩৯৬
১১২. সংস্কৃতি: জাতীয় মুখশ্রী, 'আমার কথা' ভূমিকাংশ
১১৩. মীর মঞ্জুরা বেগম, 'আমার স্মৃতিতে একুশের কবিতা', সেলিনা হোসেন, জওশন আরা রহমান (সম্পা.), মাহবুব উল আলম চৌধুরী স্মরণে বরণে। ঢাকা: পালক পাবলিশার্স, ২০১১, পৃ. ৭০-৭১, এরপর থেকে শুধু 'স্মরণে বরণে' উল্লিখিত হবে।
১১৪. মাহবুবুল হক, আশুতোষ চৌধুরী। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪, পৃ. ৪৮
১১৫. মাহবুব উল আলম চৌধুরী, 'সাংস্কৃতিক আন্দোলনে চট্টগ্রাম', প্রগতিশীল ধারা, পৃ. ১-২
১১৬. সীমান্ত সংগ্রহ, 'ভূমিকাংশ'
১১৭. সীমান্ত সংগ্রহ, পৃ. ২৮
১১৮. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৩৩১-৩৩৩
১১৯. অরুণ দাশগুপ্ত, 'মাহবুব ভাই', অবিস্মরণীয় কবিতার জনক, পৃ. ৭৪
১২০. আবুল মোমেন, 'মাহবুব ভাই শতায়ু হন', অবিস্মরণীয় কবিতার জনক, পৃ. ১০০

১২১. আবুল মোমেন, 'অকালে নয় কিন্তু অসময়ে যাওয়া', আনিসুজ্জামান, জওশন আরা রহমান (সম্পা.), তুমি রবে নীরবে– মাহবুব উল আলম চৌধুরী স্মারকগ্রন্থ। ঢাকা: পালক পাবলিশার্স, ২০০৮, পৃ. ৯৬, এরপর থেকে শুধু 'তুমি রবে নীরবে' উল্লিখিত হবে।
১২২. আশুতোষ চৌধুরী, পৃ. ৩৫
১২৩. বিমল গুহ, ওহীদুল আলম। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯১, পৃ. ২৩
১২৪. সিদ্দিকা মাহমুদা, সা'দত আলী আখন্দ। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯০, পৃ. ৩৮
১২৫. মাহবুব আজাদ, সুচরিত চৌধুরী। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭, পৃ. ১১৯
১২৬. ওহীদুল আলম, পৃ. ২৩
১২৭. আশুতোষ চৌধুরী, পৃ. ৩৫, ৫২
১২৮. ইসরাইল খান, 'সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন', নির্বাচিত প্রবন্ধ। ঢাকা: কাশবন প্রকাশন, ২০০৮, পৃ. ১২৫
১২৯.'উত্তাল পঞ্চাশ', সংস্কৃতি: জাতীয় মুখশ্রী, পৃ. ২২
১৩০. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ১৭০, ১৭৩
১৩১. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ২৫১
১৩২. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ২৬৫
১৩৩. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ২৫২
১৩৪. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ১৭-১৮
১৩৫. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৩১৪-৩১৫
১৩৬. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৪৭৮-৪৭৯
১৩৭. এবনে গোলাম নবী, 'সাংস্কৃতিক বৈঠক', প্রগতিশীল ধারা, পৃ. ৭২
১৩৮. মাহবুব উল আলম চৌধুরী, সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্তি। ঢাকা: পালক পাবলিশার্স, ২০০৮, পৃ. ৩০
১৩৯. সায়ীদুল হাসান, 'সংস্কৃতি সংবাদ', সীমান্ত সংগ্রহ, পৃ. ৩৩৪-৩৩৫
১৪০. শওকত ওসমান, 'স্মৃতিখণ্ড : চট্টগ্রাম', প্রগতিশীল ধারা, পৃ. ৪৯
১৪১. ননী দত্ত, 'আমাদের প্রিয় মাহবুবদা', অবিস্মরণীয় কবিতার জনক, পৃ. ২০৬
১৪২. কলিম শরাফী, 'সাংস্কৃতিক আন্দোলনে চট্টগ্রাম', প্রগতিশীল ধারা, পৃ. ৬৪
১৪৩. ননী দত্ত, 'আমাদের প্রিয় মাহবুবদা', অবিস্মরণীয় কবিতার জনক, পৃ. ২০৬
১৪৪. আজিজ মিছির, 'পঞ্চাশের দশকের শুরু : প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলন', প্রগতিশীল ধারা, পৃ. ৪০
১৪৫. মাহবুব হাসান (সম্পা.), চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রগতিশীল ধারা। চট্টগ্রাম: ১৯৯১
১৪৬. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৮৬-৮৯
১৪৭. আবুল ফজল, 'কৃষ্টিকেন্দ্র প্রসঙ্গে', প্রগতিশীল ধারা, পৃ. ১৬-১৭
১৪৮. মাহবুব উল আলম চৌধুরী, 'সাংস্কৃতিক আন্দোলনে চট্টগ্রাম', প্রগতিশীল ধারা, পৃ. ১৩
১৪৯. স্মৃতিকথা একটি অজানা মেয়ে, পৃ. ৮১-৮২
১৫০. স্মৃতিকথা একটি অজানা মেয়ে, পৃ. ১৫৩-১৫৭
১৫১. স্মৃতিকথা একটি অজানা মেয়ে, পৃ. ৮৭-৮৮
১৫২. আনিসুজ্জামান, 'মাহবুব উল আলম চৌধুরী', অবিস্মরণীয় কবিতার জনক, পৃ. ৮৪

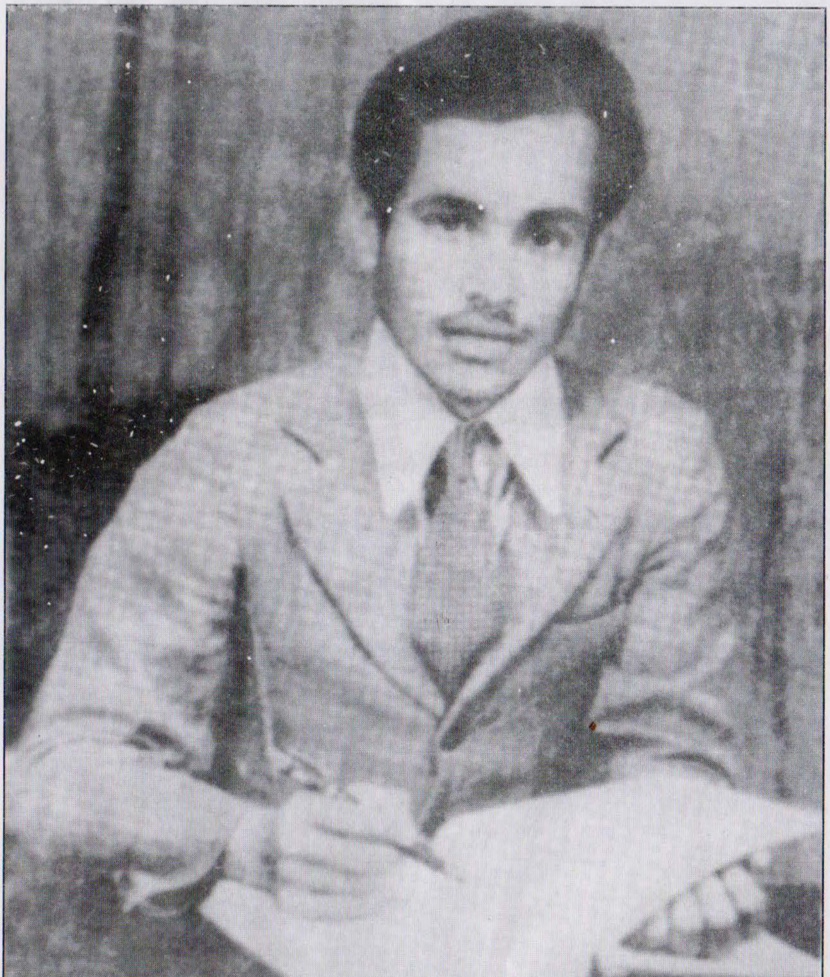
১৫৩. মামুন সিদ্দিকী, মোতাহের হোসেন চৌধুরীর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মপ্রয়াস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, যুক্ত সংখ্যা, ৮৩-৮৪, ফেব্রুয়ারি ২০০৬
১৫৪. বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, তৃতীয় খণ্ড। ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৫, পৃ. ৭০
১৫৫. সাঈদ-উর রহমান, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন। ঢাকা: অনন্যা, ২০০১, পৃ. ২৬
১৫৬. শায়ফুল মুলক, 'সংস্কৃতি-সংবাদ', মফিজউল হক (সম্পা.), পরিচিতি, প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, প্রগতিশীল ধারা, পৃ. ৯
১৫৭. রেজোয়ান সিদ্দিকী, পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬, পৃ. ১৮১-১৮৯
১৫৮. পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, তৃতীয় খণ্ড, পৃ, ৭০
১৫৯. শায়ফুল মুলক, প্রগতিশীল ধারা, পৃ. ১২
১৬০. ইসরাইল খান (সম্পা.) আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের অভিভাষণ সমগ্র। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০১০
১৬১. মাহবুব উল আলম চৌধুরী, 'সাংস্কৃতিক আন্দোলনে চট্টগ্রাম', প্রগতিশীল ধারা, পৃ. ১২
১৬২. শায়ফুল মুলক, প্রগতিশীল ধারা, পৃ. ৮-১৫
১৬৩. সীমান্ত সংগ্রহ, পৃ. ৫৪৮
১৬৪. পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, তৃতীয় খণ্ড, পৃ, ৭৭
১৬৫. মাহবুব উল আলম চৌধুরী, 'সাংস্কৃতিক আন্দোলনে চট্টগ্রাম', প্রগতিশীল ধারা, পৃ. ৯-১০
১৬৬. এ অংশের জন্যে দ্রষ্টব্য: সাঈদ-উর রহমান, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন, রেজোয়ান সিদ্দিকী, পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং মামুন সিদ্দিকী, কুমিল্লায় ভাষা আন্দোলন (কুমিল্লা: ২০০৪)
১৬৭. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৪৪৪
১৬৮. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৪৪৪
১৬৯. মাহবুব উল আলম চৌধুরী, 'সাংস্কৃতিক আন্দোলনে চট্টগ্রাম', প্রগতিশীল ধারা, পৃ. ১৩
১৭০. চিরঞ্জীব দাশশর্মা, 'সংস্কৃতি চর্চা চট্টগ্রামে', প্রগতিশীল ধারা, পৃ. ৫৯
১৭১. মাহবুব উল আলম, সঙ্কট কেটে যাচ্ছে। চট্টগ্রাম: এম আলম, ১৯৫৩, পৃ. ১৩৭
১৭২. সঙ্কট কেটে যাচ্ছে, পৃ. ১৩৯-১৪১
১৭৩. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৪৭৯
১৭৪. পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন, পৃ. ২০৯, এ পরিচ্ছেদের অন্যান্য তথ্য এখান থেকে গৃহীত
১৭৫. পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, প্রথম খণ্ড, পৃ, ১৪৯
১৭৬. কলিম শরাফী, 'মাহবুব আমার বন্ধু ও সহযোদ্ধা', অবিস্মরণীয় কবিতার জনক, পৃ. ১৫৪
১৭৭. মাহবুব উল আলম চৌধুরী, 'সাংস্কৃতিক আন্দোলনে চট্টগ্রাম', প্রগতিশীল ধারা, পৃ. ১১
১৭৮. সাপ্তাহিক আমোদ, ২৭ অক্টোবর ১৯৫৫, কুমিল্লা
১৭৯. ফয়েজউল্লাহ, কুমিল্লার সমাজ ও সংস্কৃতি। (সম্পা. মামুন সিদ্দিকী), ঢাকা: কাশবন প্রকাশন, ২০১১, পৃ. ৭৫
১৮০. সাপ্তাহিক আমোদ, প্রাগুক্ত

১৮১. তিতাশ চৌধুরী, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ইতিহাস। ঢাকা: গতিধারা, ২০০৮, পৃ. ১৫৫
১৮২. সাপ্তাহিক আমোদ, প্রাগুক্ত
১৮৩. কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ইতিহাস, পৃ. ১৫৫
১৮৪. এ কে এম এমদাদুল ইসলাম, 'মাহবুব উল আলম চৌধুরী একটি নাম একটি ইতিহাস, অবিস্মরণীয় কবিতার জনক, পৃ. ১৪২
১৮৫. পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন, পৃ. ২২৬, এ পরিচ্ছেদের অন্যান্য তথ্য এখান থেকে গৃহীত
১৮৬. মাহবুব উল আলম চৌধুরী, 'সাংস্কৃতিক আন্দোলনে চট্টগ্রাম', প্রগতিশীল ধারা, পৃ. ১৪৩
১৮৭. সংস্কৃতি: জাতীয় মুখশ্রী, পৃ. ৪১৪
১৮৮. হাসনাত আবদুল হাই, 'মাহবুব ভাইয়ের জীবন', তুমি রবে নীরবে, পৃ. ৩৩১
১৮৯. আনিসুজ্জামান, 'একের মধ্যে অনেক', তুমি রবে নীরবে, পৃ. ৮৩
১৯০. হাসনাত আবদুল হাই, 'মাহবুব ভাই', অবিস্মরণীয় কবিতার জনক, পৃ. ৩৯৩
১৯১. রফিকুল ইসলাম, 'মাহবুব উল আলম চৌধুরীর স্মরণে', স্মরণে বরণে, পৃ. ১৫৭
১৯২. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, 'শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা', স্মরণে বরণে, পৃ. ১৬
১৯৩. আবুল হাসনাত, 'মাহবুব উল আলম চৌধুরী', তুমি রবে নীরবে, পৃ. ১০০
১৯৪. হাসনাত আবদুল হাই, 'মাহবুব ভাই', অবিস্মরণীয় কবিতার জনক, পৃ. ৩৯৩
১৯৫. সেলিনা হোসেন, 'কবি ও কর্মীকে শুভেচ্ছা', অবিস্মরণীয় কবিতার জনক, পৃ. ৩৬৯
১৯৬. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ১১১
১৯৭. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৯৯
১৯৮. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ১০৯
১৯৯. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ২৩২
২০০. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৩৯
২০১. আবুল মোমেন, 'কবি ও কর্মী মাহবুব উল আলম চৌধুরী', স্মরণে বরণে, পৃ. ১৮২
২০২. আবুল মোমেন, 'অকালে নয় কিন্তু অসময়ে যাওয়া', তুমি রবে নীরবে, পৃ. ৯৬
২০৩. হাসনাত আবদুল হাই, 'মাহবুব ভাইয়ের জীবন', তুমি রবে নীরবে, পৃ. ৩৩১
২০৪. মুহাম্মদ সামাদ, 'কবি মাহবুব উল আলম চৌধুরীকে রক্তিম অভিবাদন ও ভালোবাসা', অবিস্মরণীয় কবিতার জনক, পৃ. ২৯৮
২০৫. রামেন্দু মজুমদার, 'মানবতাবাদী এক পুরুষ', অবিস্মরণীয় কবিতার জনক, পৃ. ৩১৫
২০৬. শফি আহমেদ, 'মাহবুব উল আলম চৌধুরীর প্রতি শ্রদ্ধাবচন লভিনু সঙ্গ তব', অবিস্মরণীয় কবিতার জনক, পৃ. ৩৩৬
২০৭. কবীর চৌধুরী, 'মাহবুব উল আলম চৌধুরীর জন্য প্রীতি ও ভালোবাসা', অবিস্মরণীয় কবিতার জনক, পৃ. ১৫৩
২০৮. মাহবুব উল আলম চৌধুরী, এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে। ঢাকা পালক পাবলিশার্স, ২০০৮, ভূমিকাংশ
২০৯. এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে, পৃ. ৯
২১০. জওশন আরা রহমান, ভূমিকাংশ, স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৬-৮
২১১. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ২৯২-২৯৫
২১২. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৪৫৭

২১৩. স্বাগত ভাষণ, ত্রিদিব দস্তিদার (সম্পা.), অভিনন্দন– মাহবুব উল আলম চৌধুরী সংবর্ধন-স্মারক। চট্টগ্রাম: অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, ১৯৯৭, এরপর থেকে শুধু 'অভিনন্দন' উল্লিখিত হবে।
২১৪. সুফিয়া কামাল, 'আশীর্বাণী', অভিনন্দন, পৃ. ১৭
২১৫. শওকত ওসমান, 'অনুজ সতীর্থ', অভিনন্দন, পৃ. ১৯
২১৬. ওহীদুল আলম, 'আমার চোখে মাহবুব উল আলম চৌধুরী', অভিনন্দন, পৃ. ২৭
২১৭. কলিম শরাফী, 'মাহবুব আমার বন্ধু ও সহযোদ্ধা', অভিনন্দন, পৃ. ২৬
২১৮. মাহবুব উল আলম চৌধুরী, ভাষণ, অভিনন্দন, পৃ. ৫৪
২১৯. 'জীবনপঞ্জি', স্মরণে বরণে
২২০. 'আমাদের কথা' ভূমিকাংশ, অবিস্মরণীয় কবিতার জনক
২২১. বিনোদ বিহারী চৌধুরী, 'মাহবুব উল আলম চৌধুরীর জন্মদিনে শুভেচ্ছা', অবিস্মরণীয় কবিতার জনক, পৃ. ২৪০
২২২. অনুপম সেন, 'প্রগতির স্বাপ্নিক কবি মাহবুব উল আলম চৌধুরী', অবিস্মরণীয় কবিতার জনক, পৃ. ৬৯
২২৩. আতিকুল হক চৌধুরী, 'বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের এক দুঃসাহসী সাম্পানওয়ালা', অবিস্মরণীয় কবিতার জনক, পৃ. ৮৩
২২৪. বেলাল চৌধুরী, 'আশিতে এসেও সদাসতর্ক এবং অক্লান্ত', অবিস্মরণীয় কবিতার জনক, পৃ. ২৪৭
২২৫. সূর্যাস্তের রক্তরাগ, পৃ. ১১৭
২২৬. বেগম মুশতারী শফী, অসীম শ্রদ্ধায় তাঁকে স্মরণ করি', স্মরণে বরণে, পৃ. ২২
২২৭. কাজী আবু জাফর সিদ্দিকী, 'কবি মাহবুব উল আলম চৌধুরী স্মরণে কিছু কথা', তুমি রবে নীরবে, পৃ. ১২৩
২২৮. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ১২৬
২২৯. সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্তি, পৃ. ৫৭
২৩০. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ১২১
২৩১. হাসনাত আবদুল হাই, 'মাহবুব ভাই', অবিস্মরণীয় কবিতার জনক, পৃ. ৩৯৪
২৩২. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, 'ইতিহাস হারিয়ে যায় না', তুমি রবে নীরবে, পৃ. ১৯৯
২৩৩. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, 'তার দিকে যখন তাকাই', অবিস্মরণীয় কবিতার জনক, পৃ. ২৪৭
২৩৪. আতিকুল হক চৌধুরী, 'বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের এক দুঃসাহসী সাম্পানওয়ালা', অবিস্মরণীয় কবিতার জনক, পৃ. ৮১
২৩৫. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, 'ইতিহাস হারিয়ে যায় না', তুমি রবে নীরবে, পৃ. ১৯৯
২৩৬. আবুল মোমেন, 'মাহবুব ভাই শতায়ু হন', অবিস্মরণীয় কবিতার জনক, পৃ. ৯৯
২৩৭. আতিকুল হক চৌধুরী, 'বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের এক দুঃসাহসী সাম্পানওয়ালা', অবিস্মরণীয় কবিতার জনক, পৃ. ৮২
২৩৮. মফিদুল হক, চট্টলচিত্তভূমিজ মাহবুব উল আলম চৌধুরী: বাঙালি সত্তার অনিন্দ্য প্রতিভূ', স্মরণে বরণে, পৃ. ১৭০
২৩৯. সনৎকুমার সাহা, 'অশেষ বেলার তাজা রোদদুর', অবিস্মরণীয় কবিতার জনক, পৃ.

২৪০. রফিকুল ইসলাম, 'শতকের দেশকাল ও কবি মাহবুব উল আলম চৌধুরী', অবিস্মরণীয় কবিতার জনক, পৃ. ৩১১
২৪১. রফিকুল ইসলাম, 'শতকের দেশকাল ও কবি মাহবুব উল আলম চৌধুরী', অবিস্মরণীয় কবিতার জনক, পৃ. ৩১১
২৪২. রাশেদ রউফ, 'মাহবুব উল আলম চৌধুরীর ছড়া ছোটদের সচেতন করে তোলার অনন্য প্রয়াস', স্মরণে বরণে, পৃ. ১২৮
২৪৩. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ১১৯
২৪৪. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৫৫৮
২৪৫. আবুল হাসনাত, 'মাহবুব উল আলম চৌধুরী', তুমি রবে নীরবে, পৃ. ১০০
২৪৬. 'একুশের চেতনা', সংস্কৃতি: জাতীয় মুখশ্রী, পৃ. ১৫৯
২৪৭. 'রবীন্দ্রনাথ আমাদের ঠিকানা', সংস্কৃতি: জাতীয় মুখশ্রী, পৃ. ৪৬
২৪৮. 'সব ধর্মের সেরা পথ– মানব-ধর্ম', সংস্কৃতি: জাতীয় মুখশ্রী, পৃ. ৮৫
২৪৯. সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্তি, পৃ. ১১৬, স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ১১৯
২৫০. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ৪২৪
২৫১. স্মৃতির সন্ধানে, পৃ. ২১৮

আলোকচিত্র



তরুণ বয়সে মাহবুব উল আলম চৌধুরী



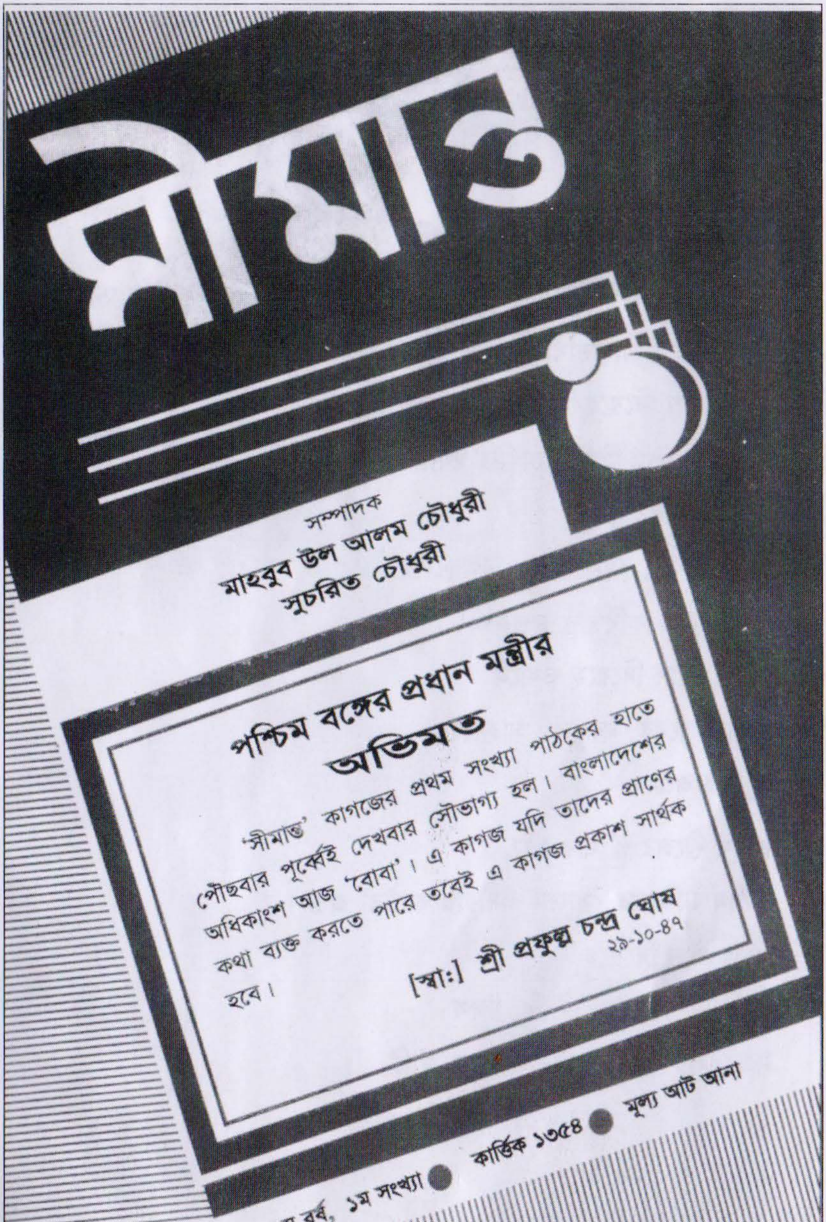
কথাশিল্পী মাহবুব উল আলম প্রণীত 'সঙ্কট কেটে যাচ্ছে' (১৯৫৩) গ্রন্থে মুদ্রিত মাহবুব উল আলম চৌধুরীর ছবি



বিয়ে উপলক্ষে প্রকাশিত স্যুভিনিয়র 'শুভেচ্ছা'র প্রচ্ছদপট, ১৯৫২



মাহবুব উল আলম চৌধুরী ও পত্নী জওশন আরা রহমান



সীমান্ত

সম্পাদক
মাহবুব উল আলম চৌধুরী
সুচরিত চৌধুরী

পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রীর
অভিমত

'সীমান্ত' কাগজের প্রথম সংখ্যা পাঠকের হাতে পৌছবার পূর্ব্বেই দেখবার সৌভাগ্য হল। বাংলাদেশের অধিকাংশ আজ 'বোবা'। এ কাগজ যদি তাদের প্রাণের কথা ব্যক্ত করতে পারে তবেই এ কাগজ প্রকাশ সার্থক হবে।

[স্বা:] শ্রী প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ
২৯-১০-৪৭

১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা ● কার্ত্তিক ১৩৫৪ ● মূল্য আট আনা

মাহবুব উল আলম চৌধুরী সম্পাদিত 'সীমান্ত' পত্রিকার প্রচ্ছদ

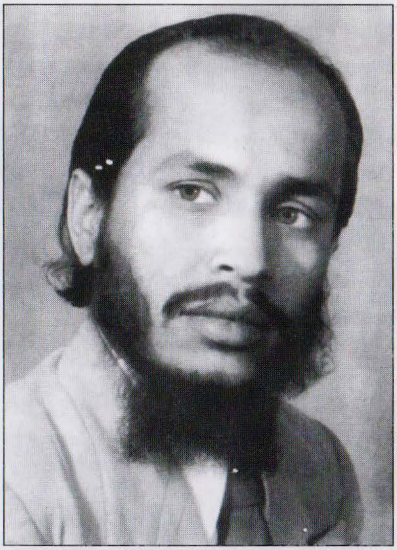
কাঁদতে আসিনি—
ফাঁসীর দাবী নিয়ে এসেছি

ওরা চল্লিশজন কিংবা আরো বেশী
যারা প্রাণ দিয়েছে ওখানে—রমনার রৌদ্রদগ্ধ কৃষ্ণচূড়ার গাছের তলায়
ভাষার জন্য, মাতৃভাষার জন্য—বাংলার জন্য।
যারা প্রাণ দিয়েছে ওখানে
একটি দেশের মহান সংস্কৃতির মর্য্যাদার জন্য
আলাওলের ঐতিহ্য
কায়কোবাদ, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের
সাহিত্য ও কবিতার জন্য—
যারা প্রাণ দিয়েছে ওখানে
পলাশ পুরের মকবুল আহমদের
পুঁথির জন্য—
রমেশ শীলের গাঁথার জন্য,
জসীম উদ্দিনের 'সোজন বাদীয়ার ঘাটের' জন্য।
যারা প্রাণ দিয়েছে
ভাটীয়ালি, বাউল, কীর্ত্তন, গজল
নজরুলের "খাঁটী সোনার চেয়ে খাঁটি
আমার দেশের মাটি।
এ দুটি লাইনের জন্য
দেশের মাটির জন্য,

'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি'র মূল কবিতার প্রতিলিপি



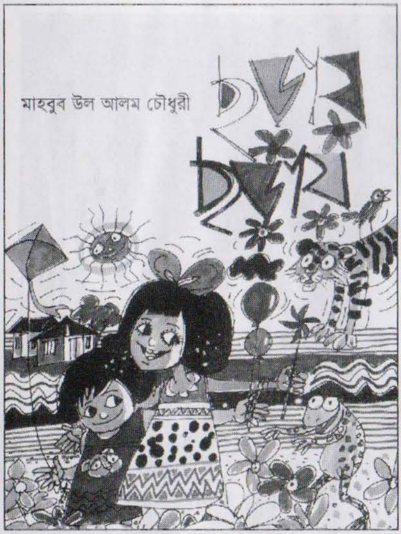
১৯৫৩ সালে চট্টগ্রামের লালদিঘির ময়দানে অনুষ্ঠিত একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে
চট্টগ্রাম জেলা রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক হিসেবে বক্তৃতারত

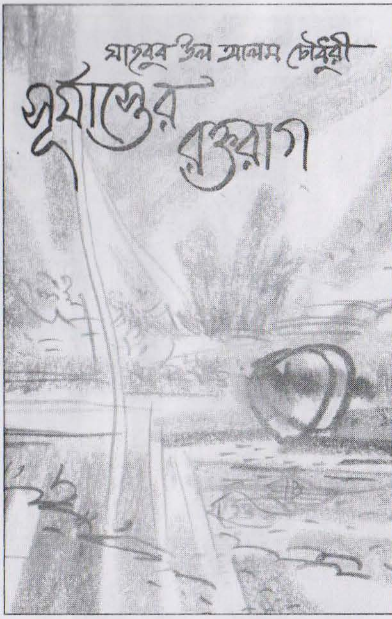


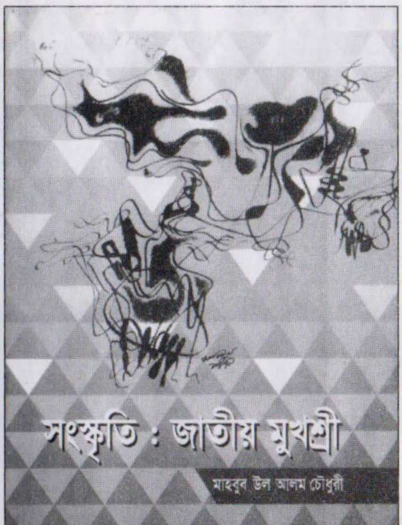
১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের পর ৯২ (ক) ধারা
জারি হলে মাহবুব উল আলম চৌধুরী আত্মগোপনে চলে যান।
১৯৫৫ সালে আত্মগোপন থেকে ফেরার পর

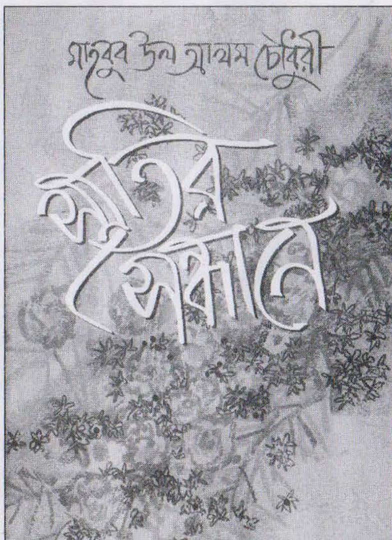


কবি পরিবার– সামনে কবি ও কবিপত্নী, পেছনে (বাম থেকে) নাতি ইখতিসাদ
ইবতিসাম, কন্যা সাফিনা আহমেদ মুন্নী, জামাতা ইশতিয়াক আহমেদ









গ্রন্থের প্রচ্ছদ– ছড়ায় ছড়ায়, সূর্যাস্তের রক্তরাগ, সংস্কৃতি : জাতীয় মুখশ্রী, স্মৃতির সন্ধানে



হতাশ প্রাণে আশার আলো
শ্বাস-শংকর
শ্বাস-কাস, ব্রংকাইটিস ও ফ্যারেঞ্জাইটিসে মহৌষধ

দৈনিক স্বাধীনতা

রেজিঃ নং—ডি-এ ১৯১ : ১১শ বর্ষ : ১৬৬ তম সংখ্যা : শনিবার, ২২শে আগষ্ট, : ১৯৮১ ইংরেজী : ৫ই ভাদ্র, ১৩৮৮ বাংলা : ২১শে শাওয়াল ১৪০১ হিজরী : মূল্য : ৭০ পয়সা

জুম'আর পর প্রার্থনা

ইসলামী সংহতি দিবস পালিত

ঢাকা, ২১শে আগষ্ট :— ফিলিস্তিনী জনগণের সঙ্গে ভ্রাতৃসুলভ একাত্মতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য স্থানের ন্যায় আজ সারাদেশে ইসলামী সংহতি দিবস পালিত হয়।

ফিলিস্তিনী ভাইদের স্বাধা সংগ্রামে সাফল্যের জন্যে জুম্মার নামাজের সব জামাতে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

ঢাকায় ইসলামী কাউন্সেল বায়তুল মোকাররম মসজিদে জুমা'র নামাজের পর এক মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করেন। মিলাদ শেষে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

ঈদ পুনর্মিলনী সভায় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাত্তার

মুসলিম বিশ্ব এখন সংকটময় ক্রান্তিকালের মধ্যে রয়েছে

ঢাকা, ২১শে আগষ্ট :- অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তার বলেছেন, মুসলিম বিশ্ব কেবলমাত্র ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে ঐক্য ও সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের মাধ্যমেই তার লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারে।

আজ সন্ধ্যায় ঢাকায় বিশ্ব ইসলামী পরিষদ ও ইসলামী সংহতির আয়োজিত ঈদ পুনর্মিলনী সভায় ভাষণদানকালে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বলেন মুসলিম বিশ্ব এখন এক সংকটময় ক্রান্তিকালের মধ্য দিয়ে চলছে।

ফিলিস্তিনী জনগণের নিজস্ব আবাসভূমি গঠনের অবিচ্ছেদ্য জাতীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে এবং আফগান জনগণ বিদেশী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে। এ ছাড়াও ইরাক ও ইরানের মধ্যে ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ অবসানের এখনও কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছেনা।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বলেন, মুসলিম জাহান এবং সামগ্রিভাবে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার যে কোন স্থায়ী পদক্ষেপের প্রতি বাংলাদেশ সমর্থন দিয়ে যাবে।

মুসলিম দেশের সঙ্গে একযোগে কাজ করে চলেছে।

তিনি বলেন, সকল বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি, অপর দেশের আভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা এবং সার্বভৌম সমতার ভিত্তিতে কেবল বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

এ প্রসঙ্গে বিচারপতি সাত্তার মুসলিম বিশ্বের সংহতি ও ভ্রাতৃত্ব জোরদারে মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের অবদানেরকথা উল্লেখকরে বলেন, তাঁর

শেষ পৃঃ ৬এর কঃ দ্রঃ

দক্ষিণ আফ্রিকায় ছাত্র বিক্ষোভ

মানিক মিয়া স্মৃতি সংসদের সভায় বক্তাদের অভিমত

ঢাকায় কার পেট্রিক

ঢাকা, ২১শে আগষ্ট :- জাতিসংঘে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী প্রতিনিধি মিসেস জিন কার পেট্রিক বাংলাদেশে ৩দিনের সফরে আজ ঢাকা এসেছেন।

ঢাকায় অবস্থানকালে তিনি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে আসন্ন অধিবেশনে আলোচ্য সূচী ও দ্বিপক্ষীয় বিষয় নিয়ে বাংলাদেশ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করবেন।

বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের সংগে আলাপকালে মিসেস কার পেট্রিক বলেন, বাংলাদেশের বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচী বাস্তবায়নে সহযোগিতার ব্যাপারে নতুন মার্কিন প্রশাসনের ইচ্ছের কথা তিনি বাংলা

শেষ পৃঃ ৮এর কঃ দ্রঃ

ইরান ইসরাইলের কাছ থে

খোমেনীকে উৎখাত করার ইরানে গোপন সংস্থা গ

প্যারিস, ২১শে আগষ্ট : ইরানের ক্ষমতাচ্যুত রাষ্ট্রপতি বনিসদর পুনরায় বলেছেন যে, তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য আয়াতুল্লাহ খোমেনিকে উৎখাত করা এ একাজের জন্যে তিনি ইরা এক গোপন সংস্থা গ করেছেন।

মিঃ বনিসদর আমেরিকা প্রচারিত এক টেলিভিশ সাক্ষাতকারে বলেন, আয়া তুল্লাহর মৃত্যুর আগে তাঁ ক্ষমতাচ্যুত করা না হলে ইরা অসন্তোষ এবং গৃহযুদ্ধের স্থ হবে। তিনি এখন ফ্রা নির্বাসনে আছেন।

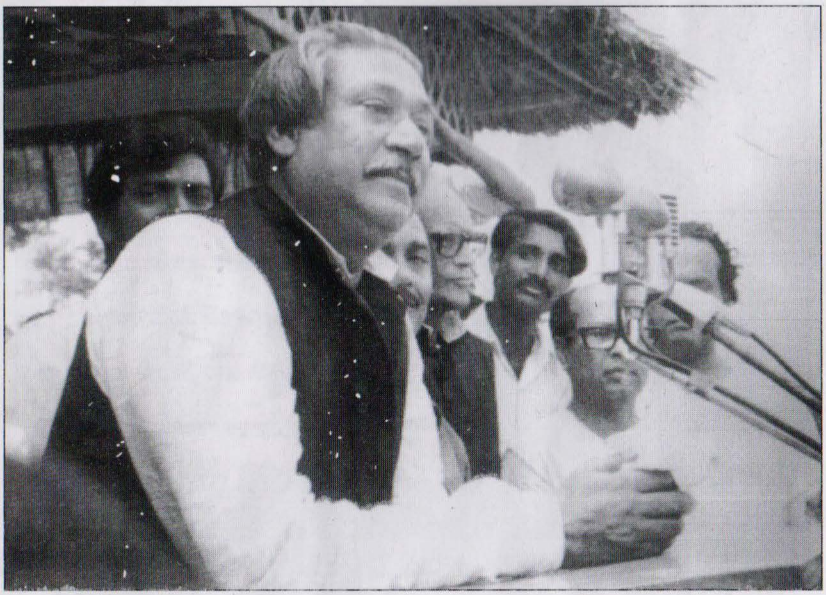
মিঃ বনিসদর অন্যান্য যে নির্বাসিত ইরানী বিগত শাহে ছেলেকে ক্ষমতায় বসা চাইছে তিনি তাঁদের সা

আজ রাউজান আওয়ামী লীগের কর্মীসভা

(বার্তা পরিবেশক)

আওয়ামী লীগ ঘোষিত কর্মসূচীসমূহ বাস্তবায়নকল্পে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য রাউজান থানা আওয়ামী লীগ এর উদ্যোগে আজ সকাল

মাহবুব উল আলম চৌধুরী সম্পাদিত 'দৈনিক স্বাধীনতা'



গহিরা হাই স্কুল ময়দানে বঙ্গবন্ধুর জনসভা, পাশে মাহবুব উল আলম চৌধুরী
ও আবদুল্লাহ আল হারুন চৌধুরী, ১৯৭৫



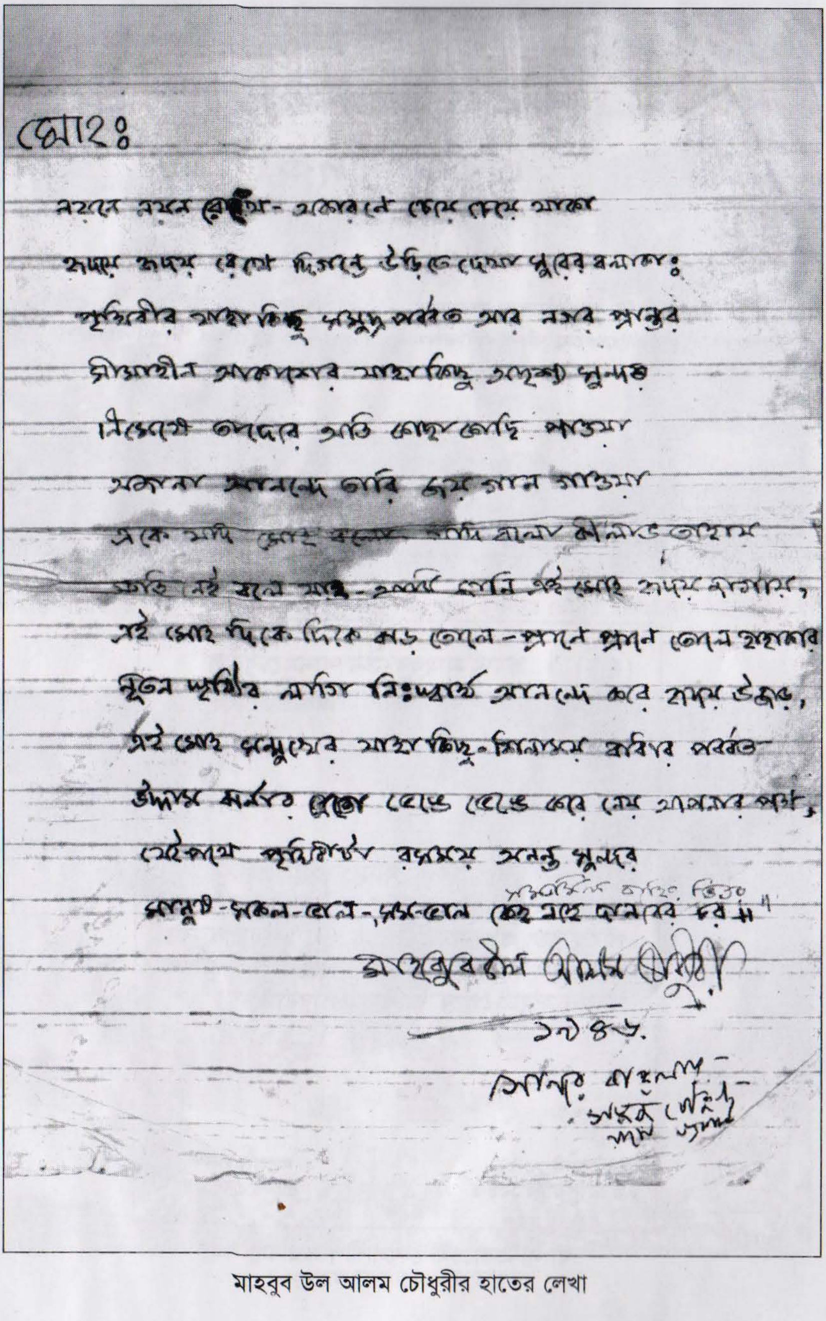
প্রথম জাতীয় গণসঙ্গীত উৎসবে মাহবুব উল আলম চৌধুরী
ফয়েজ আহমদ, কামাল লোহানী ও আবুবকর সিদ্দিক



কবি সুফিয়া কামালের হাত থেকে বাংলা একাডেমী ফেলোশীপ সম্মাননাপত্র গ্রহণ
পাশে বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক মনজুরে মওলা, ১৯৮৪



কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের ভাষাসংগ্রামী সংবর্ধনায়


মোহঃ
নয়নে নয়নে রোমান্স- অন্তরে চেয়ে চেয়ে থাকা
হৃদয়ে হৃদয়ে রেখে দিগন্তে উড়িয়ে দেওয়া সুরের বলাকা;
পৃথিবীর যাহা কিছু সমুদ্র পর্বত আর নগর প্রান্তর
সীমাহীন আকাশের যাহা কিছু অপূর্ব সুন্দর
নিঃশেষে তাদের প্রতি কোটি কোটি পাওয়া
অজানা আনন্দে তারি জয় গান গাওয়া
একে যদি মোহ বলো- যদি বলো নীলাভ আবেশ
ক্ষতি নেই বলে যাও- তবুও জানি এই মোহ হৃদয় বাগায়,
এই মোহ দিকে দিকে ঝড় তোলে- প্রাণে প্রাণে তোলে হাহাকার
নূতন পৃথিবীর লাগি নিঃস্বার্থে আনন্দে করে হৃদয় উজাড়,
এই মোহ মানুষের যাহা কিছু- শিলাময় কঠিন পর্বত-
উদ্দাম নির্ঝর স্রোতে ভেঙে ভেঙে করে নেয় আপনার পথ,
সেইপথে পৃথিবীর রক্তময় অনন্ত সুন্দর
মানুষ-সকল-কালে-সকল-দেশে জেগে রহে মানবের ঘর॥"
মাহবুবুল আলম চৌধুরী
১৩৪৬.

মাহবুব উল আলম চৌধুরীর হাতের লেখা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

একুশে পদক

সম্মাননা-পত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মাহবুব উল আলম চৌধুরী কে ভাষা আন্দোলন (মরণোত্তর) ক্ষেত্রে তাঁর গৌরবময় অবদান ও কীর্তির স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০৯ সালের একুশে পদক পুরস্কারে ভূষিত করছে।

৮ ফাল্গুন ১৪১৫
২০ ফেব্রুয়ারি ২০০৯

প্রধানমন্ত্রী

একুশে পদকের সম্মাননা পত্র

জনাব মাহবুব-উল আলম চৌধুরীকে
বাংলা একাডেমীর ফেলোশিপ প্রদান

সুধী

আপনি দেশের প্রবীন সাহিত্য-সংগঠক ও সংস্কৃতি-কর্মী। অমর ভাষা আন্দোলনের শহীদদের পবিত্র রক্ত আপনার কবিতায় প্রথম শব্দরূপ লাভ করেছিল। আপনাকে বাংলা একাডেমীর ফেলোশিপ প্রদান করতে পেরে আমরা গৌরবান্বিত।

১৯ পৌষ ১৩৯২
৪ জানুয়ারি ১৯৮৬

মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী

বাংলা একাডেমী ফেলোশীপ সম্মাননা পত্র



'সীমান্ত সংগ্রহ' প্রকাশনা উৎসবে কবীর চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও আবদুল মান্নান সৈয়দ



৭৮-তম জন্মদিনে বক্তৃতারত

মাহবুব্ উল্ আলম চৌধুরী

বাড়ী ৪৮ সড়ক ২০ সেক্টর-৩ উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা
ফোন ঃ ৮৯১৪২ (বা) ~~২৩২৩২~~ (অ)

21/12/2006

প্রীতি ভাজনেষু
জনাব মামুন সিদ্দিকী,

আপনার 20/5/2006 সালের চিঠি যথাসময়ে পেয়েছিলাম, কিন্তু যথাসময়ে উত্তর দিতে পারিনি আমার অসুস্থতার কারণে। আপনি আমার সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন এবং আমার সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করেছেন জেনে আনন্দিত হয়েছি। কুমিল্লার সাথে আমার একসময়ে নিবিড় যোগাযোগ ছিল। কুমিল্লায় প্রগতি মজলিশ এবং এর চালক জালাল উদ্দীন, আলাউদ্দীন, প্রফেসর আব্দুল খায়ের, মফিজুল ইসলাম, এবং অধ্যাপক আহমেদউদ্দীন ছিলেন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁদের মধ্যে অনেকেই আর ইহলোকে নেই। তাঁদের জন্য স্মৃতির পীড়নে ভুগি। কুমিল্লায় সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এদের উদ্যোগে আর চট্টগ্রাম থেকে সম্মেলনের সিংহভাগ অর্থ আমরা যুগিয়েছিলাম। সম্মেলনে আমি নজরুল সঙ্গীতের আসর উদ্বোধন করেছিলাম এবং সাহিত্য অধিবেশনে 'সমাজ ও সাহিত্য' বিষয়ে প্রবন্ধ

মামুন সিদ্দিকীকে লিখিত মাহবুর উল আলম চৌধুরীর চিঠি



কবির ৮০তম জন্মদিনে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা
(বাম থেকে) গোলাম কুদ্দুছ, সেলিনা হোসেন, কবীর চৌধুরী,
আনিসুজ্জামান, নাসিরউদ্দীন ইউসুফ, মফিদুল হক



কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে একুশের অনুষ্ঠানে বক্তৃতারত মাহবুব উল আলম চৌধুরী



কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে স্মরণসভা: সভাপতি কবীর চৌধুরী
এ টি এম শামসুদ্দীন, জওশন আরা রহমান, কর্নেল শওকত আলী
আবদুর রাজ্জাক, নাসিরউদ্দীন ইউসুফ, আসাদুজ্জামান নূর



চট্টগ্রামে নাগরিক স্মরণসভা: আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন, রফিকুল ইসলাম
কামাল লোহানী, আসাদ চৌধুরী, মফিদুল হক